প্রথম প্রকাশ :
নভেম্বর, ১৯৬০

প্রকাশক :
দেবী চট্টোপাধ্যায়
৯২, পি. কে. গুহ রোড
কলি - ৭০০০২৮

মুদ্রাকর :
পার্থ চট্টোপাধ্যায়
জুপিটার প্রিণ্টার্স
কলি - ৭০০০০৯

ভূমিকা

বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ রচনার কতকগুলি ধারা আছে। এক ধারার প্রবন্ধে কেবলমাত্র সাহিত্যেরই আলোচনা করা হয় এবং সেখানেও যতদূর সম্ভব সাহিত্যকে বিশুদ্ধভাবে অর্থাৎ অন্য বিষয় নিরপেক্ষভাবে বিচার করার চেষ্টা করা হয়। অপর একটি ধারায় সাহিত্য শুধু সাহিত্যরূপেই বিচার্য নয়, তার প্রসঙ্গে অনিবার্যরূপে এসে পড়ে নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, ধর্ম, অর্থনীতি, এমনকি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা। তৃতীয় একটি ধারার বেলায় দেখতে পাই, এই শ্রেণীর প্রবন্ধে সাহিত্যকে শুধুমাত্র সমাজতত্ত্ব ইতিহাস রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থিত করেই লেখক ক্ষান্ত হন না, আলোচনার মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীরও আরোপ করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী আধুনিক, কেন না এই মনোভাবের রেওয়াজ উনিশ শতকের বাংলা প্রবন্ধে বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না, তখনকার প্রবন্ধ সাহিত্যে প্রথম যে দুটি ধারার উল্লেখ করেছি তদন্তর্গত রচনারীতিরই সবিশেষ প্রচলন দেখা যায়। বিশেষ, দ্বিতীয় ধারার প্রবন্ধ-রীতিতে বঙ্কিমচন্দ্র ও তৎসম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার লেখককুল একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এক হিসাবে তাঁদেরকেই তৃতীয় ধারার প্রবন্ধ-সাহিত্যের জনক বলা যায়। সাহিত্যের সঙ্গে সমাজতত্ত্বের মেলবন্ধন ঘটিয়ে যুগ্ম-দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যালোচনা করার অভ্যাসের জন্মদাতা বলতে মূলতঃ বঙ্কিমচন্দ্রকেই বোঝায়। যদিও তাঁর প্রচারিত সমাজতত্ত্ব আর একালীন সমাজতত্ত্বে আকাশ-পাতাল তফাৎ।

'সংস্কৃতির সপক্ষে' গ্রন্থের লেখক শ্রীমনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়কে পূর্বোক্ত তৃতীয় ধারার প্রবন্ধরীতির একজন বিশিষ্ট অনুগামী বলা যায়। তিনি আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রগতিশীল দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যবিচারের পক্ষপাতী এবং তাঁর লেখা সকল গদ্য রচনাতেই তাঁর এই দৃষ্টিকোণের কমবেশী প্রতিফলন চোখে পড়ে। যদিও শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় বয়সে অপেক্ষাকৃত কম প্রবীণ—তাঁকে নবীন প্রজন্মের কোঠাতেই বরং ফেলা যায়—তাহলেও বেশ কিছুকাল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে সমাজ-ইতিহাস আশ্রিত সাহিত্য প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় নিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে চলেছেন। তাঁর আলোচনার বিষয় প্রায় সর্বত্র

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি কেন্দ্রিক (এই গ্রন্থে সংকলিত রচনাগুলিই সে কথার প্রমাণ এবং এগুলিকে তাঁর রচনার একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সংগ্রহ অনায়াসে বলা যেতে পারে) তবে সে সব বিষয়ের আলোচনা মোটেই ব্যক্তিসাক্ষিক (সাবজেক-টিভ) মনন প্রসূত নয়, পুরোপুরি সমাজমুখী মনোভাবের দ্বারা জারিত। লেখকের মানসিকতা একান্তভাবে বস্তুনিষ্ঠ (অবজেকটিভ) মনোভাবের দ্বারা অধিকৃত—ওই বস্তুনিষ্ঠার ধারণার মধ্যে ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের নিবিষ্ট চর্চার সুফল জড়িয়ে মিশিয়ে আছে বেশ অনুমান করা যায়। অর্থাৎ, লেখক আর যাই হোন, সমাজ-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রিক চেতনাহীন তথাকথিত বিশুদ্ধ সাহিত্যের উপাসক নন, এই পরিচয় তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে সুপরিব্যক্ত।

শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রগতিশীল ভাবনা-চিন্তাকে যদি সংজ্ঞা বা পরিভাষা দিয়ে বোঝাতে হয় তো বলতেই হয় তিনি মার্কসীয় চিন্তাদর্শের অনুসারী। কিন্তু এই পরিভাষা তাঁকে আরও বেশী বুঝতে সাহায্য করে, তাঁর চিন্তার গতি ও ঝোঁক অনুধাবনে দিক্-শলাকার মত কাজ করে। তিনি নিজেই এই বিশেষ চিন্তাদর্শনের ফ্রেমের মধ্যে এঁটে তাঁর বক্তব্য ও প্রতিপাদ্যগুলিকে সজ্ঞানে সাজিয়ে দিয়েছেন, ফলে পাঠকের কাছে তাঁর ভাবনা স্বচ্ছতর হয়ে ওঠে, দ্ব্যর্থ-ব্যঞ্জকতার কুয়াশায় কোথাও ঝাপসা ঠেকে না। পাঠক একবার লেখকের প্রারম্ভিক যাত্রা-বিন্দু সম্বন্ধে গোড়াতেই যদি নিঃসংশয় হয়ে নিতে পারেন তো আর ল্যাঠা থাকে না, লেখকের প্রতিটি কথার অর্থ তাঁর নিকট তখন দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এই বইয়ের প্রথম ছয়টি প্রবন্ধ সাধারণ (জেনারেল) প্রকৃতির, পরের চারটি প্রবন্ধ ব্যক্তিভিত্তিক। এই শেষের চার প্রবন্ধে যথাক্রমে প্রখ্যাত হিন্দী সাহিত্যিক মুন্সী প্রেমচন্দ, গণকবি রমেশ শীল, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ও ফ্যাসিবিরোধী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের আলোচনা স্থান পেয়েছে। প্রথম পর্বের প্রবন্ধগুলিতে যে সকল ভাবাদর্শের ব্যাখ্যান, বিস্তার ও সমর্থন করা হয়েছে সেগুলিরই আংশিক অনুপূরক দৃষ্টান্তরূপে পরের রচনাচতুষ্টয়ের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। অর্থাৎ প্রথম ছ'টি প্রবন্ধ সূত্রনির্ধারক; পরের চারটি প্রবন্ধ উদাহরণমূলক। খতিয়ে দেখতে গেলে প্রথম ভাগের লেখাগুলিই সমধিক মূল্যবান। কেননা এগুলিতে লেখকের চিন্তা নানামুখী প্রসঙ্গের উত্থাপন ও বিচিত্র বিশ্লেষণের সহায়তায় একটি নির্ভরযোগ্য দার্শনিক ভিত্তি পেয়েছে, যার মনন ও উপলব্ধিতে পাঠকের চিত্ত অনুপ্রাণিত হয়, বুদ্ধি পরিচ্ছন্নতর হয়।

ব্যক্তিগতভাবে আমি এই অংশের লেখাগুলি পড়ে সবিশেষ উপকৃত হয়েছি। প্রায় সকলের মনেই চিন্তার কিছু কিছু জটিল জট লুকিয়ে থাকে, সহজে সেগুলির গ্রন্থি শিথিল হতে চায় না। যে লেখা পড়ে ওই জাতীয় গিঠ্ কিছু পরিমাণেও আলগা হতে সাহায্য হয় তাকে মূল্যবান মনে না করে পারা যায় না। সুখের বিষয় শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থের একাধিক প্রবন্ধে এমনতর গ্রন্থিমোচনের পথ খুলে দেওয়া হয়েছে নিপুণ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও উপযুক্ত নজীর প্রয়োগের দ্বারা। বক্তব্য বিষয়ের প্রমাণ-প্রতিপাদনের অনুকূলে প্রভূত তথ্যের যোগান ও লাগসই সব উদ্ধৃতির নিয়োগ এই বইয়ের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য তাতে কোনই সন্দেহ নেই। তার উপর প্রবন্ধগুলির গভীর-গম্ভীর রূপ লেখকের seriousness of purpose-এরও ইঙ্গিত দেয়। প্রবন্ধ অনুশীলনের নামে আজকের রম্যরচনাপ্লাবিত হাল্কা-বাংলা গদ্যচর্চার পরিবেশে এর মূল্যও বড় কম নয়।

উৎপাদন-ব্যবস্থার বিবর্তন ও উৎপাদন-ব্যবস্থার মালিকানার রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির চরিত্রেরও পরিবর্তন হয়—এই বইয়ের অনেক-গুলি প্রবন্ধের এটি মূল প্রতিপাদ্য। এই প্রতিপাদ্যেরই সূত্র ধরে এসেছে আরও একটি প্রণিধানযোগ্য বক্তব্য তা হলো, সমাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার যত অগ্রগতি সাধিত হবে তত সংস্কৃতির দেহ থেকে কুসংস্কার, জনবিরোধী উপাদান, রুচিবিকার ইত্যাদির প্রভাব অপসারিত হতে থাকবে। অপসংস্কৃতির একটা মূল হেতুই হলো উৎপাদন-ব্যবস্থার মালিকানায় মুষ্টিমেয়ের আধিপত্য এবং তাদের সংকীর্ণ কায়েমী স্বার্থ। অর্থনীতিই সমাজ প্রবাহের মূল চালিকা শক্তি, শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতি তার উপরি-থাক মাত্র। অর্থনীতির কাঠামোর রূপান্তর ঘটলে শিল্প-সাহিত্যের চেহারারও বদল ঘটতে বাধ্য—এর আর চারা নেই। আজকের ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ কবলিত ও বুর্জোয়া মূল্যবোধ শাসিত অসম সমাজ-ব্যবস্থার আওতায় আমরা সংস্কৃতির যে-রূপ প্রত্যক্ষ করছি, ভবিষ্যতের জনসমাজে তার মৌলিক রূপবদল অনিবার্য। এখনকার অলস বিলাসী ভোগী শ্রেণীর মানুষদের মনোরঞ্জনের আধার না হয়ে অনাগত যুগের সংস্কৃতি হবে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের ভোগ্য, শ্রমিক-কৃষকের শিক্ষা ও আনন্দের অধিকারভুক্ত বিষয়। সুতরাং এখনকার সংস্কৃতি আর ভবিষ্যতের সংস্কৃতির মধ্যে সাদৃশ্যের কোন কথাই উঠতে পারে না।

গ্রন্থকার এই দৃষ্টিকোণ থেকে একে একে শিল্প-সংস্কৃতির আদিম উৎস, প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের অসারতার পিঠে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির উৎকর্ষ, প্রগতির পথে বাধা ও

তার উত্তরণের সমস্যা, সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতির প্রশ্ন ও সর্বশেষে বাংলার নবজাগরণের আলোকে এদেশের শিল্প-সংস্কৃতির ঐতিহ্যের বিচার—এ সকল বিষয়ের আলোচনা করেছেন। তুলনামূলক মাপে নবজাগরণ সংক্রান্ত প্রবন্ধটি সর্বোত্তম বলে মনে হলো। এই প্রবন্ধে লেখক উনিশ শতকের বাঙালী মনীষার অতুলনীয় সম্পদের অত্যন্ত সশ্রদ্ধ আলোচনা করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে তার অপূর্ণতা ও নেতিবাদের দিকটিও তুলে ধরতে ভোলেন নি। অগ্রসর বৈজ্ঞানিক চিন্তাব পরিপ্রেক্ষিতে রামমোহন, ডিরোজিও, অক্ষয়কুমার, হেয়ার, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ দিক্‌পালদের অগ্রসর ভূমিকার মূল্যায়নের পাশে পাশে ইতিহাসের মানদণ্ডে উনিশ শতকের দৃষ্টিভঙ্গীগত বিচ্যুতিগুলিও তাঁর চোখ এড়ায়নি। এক কথায় লেখক এখানে দক্ষ সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ, এই পর্বের রচনায় ক্ষুরধার তাঁর বিশ্লেষণ।

পরিশেষে একটি কথা। লেখক তাঁর বক্তব্যের প্রতিষ্ঠায় প্রচুর মাল-মসলা এই বইতে উপস্থিত করেছেন। তাঁর উপাদান-উপকরণের কোন অভাব নেই, বরং এ ক্ষেত্রে তাঁর সংগ্রহ বিস্ময়কর, অনেক প্রবীণের তথ্যসমৃদ্ধিকেও হার মানায়। তবে এই সমস্ত বিপুল পরিমাণ উপকরণ-উপাদান-তথ্য-পরিসংখ্যানকে মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে পরিবেশনার ক্ষেত্রে তাঁকে আরও একটু মনোযোগী হতে বলি। তথ্য সঞ্চয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত বললেও অত্যুক্তি হয় না তবে সেগুলির সজ্জিতকরণ আরও একটু চারুতার অপেক্ষা রাখে। বিষয়গৌরব ও তথ্যৈশ্বর্যের সঙ্গে যদি লেখক ভাষার কান্তিকে এনে মেলাতে পারেন তো তাঁর লেখার আর মার নেই।

নারায়ণ চৌধুরী

শিল্প সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে

মানুষের সভ্যতার ইতিহাস মানেই গোলামির বিরুদ্ধে স্তরে স্তরে মুক্তির ইতিহাস। একদিন সে প্রকৃতির গোলাম ছিল; অসহায় ছিল, ভয় পেয়েছিল। কিন্তু নিজের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ ক্রমে সেই প্রকৃতির শক্তিকে, সুদীর্ঘ কালের বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ভুল ও সংশোধনের আঁকাবাঁকা পথে, বুঝতে শিখল, লড়াই করল এবং অবশেষে কেবল দখলই করল না, সেই শক্তিকে নিজের অগ্রগামী জীবন-পদ্ধতির কাজেও লাগাল। কাজেই যে-প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে ও তার শক্তিকে বাড়িয়ে মানুষ সভ্যতা-সংস্কৃতির বিজয়ের যুগে এসেছে, একদিন সেই প্রকৃতিই ছিল তার একমাত্র ও প্রধানতম শত্রু বা প্রতিকুল শক্তি। এই প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামই মানবসভ্যতার জন্ম দিয়েছে। এই ভাবেই সে প্রাচীন উপজাতীয় গোষ্ঠীর যৌথ কৃষি অর্থনীতি এবং উৎপাদন ও ভোগের প্রয়োজনভিত্তিক সমাজ সৃষ্টি করেছে। এই কাজে তারা গান গেয়েছিল প্রথমেই। তা ছিল যৌথ ও মুক্ত চরিত্রের। হাতে ছিল ব্যবহারিক হাতিয়ার; আর বিরুদ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে সাংস্কৃতিক হাতিয়ার ছিল এই যৌথ সঙ্গীত। প্রাচীন উপজাতীয় পুরাণের আচার ও প্রথাগুলির মধ্যে এই সঙ্গীত একটি মূল্যবান ও মৌলিক সাংস্কৃতিক ভূমিকা নিয়েছিল। সেই সংস্কৃতির মধ্যে ভূমিদাস বা কৃষক ও ভূমিরাজ এবং দাস ও মালিকের শ্রেণী-শোষণের উপাদান ছিল না, গোষ্ঠীসমাজের সকল মানুষই তাদের উৎপাদন ও বাঁচার সংগ্রামে সহযোগী ছিল; সে সংগ্রাম ছিল পাথর ভেঙে অস্ত্র ও ঘর বানাবার, সে সংগ্রাম ছিল পারস্পরিক আদান-প্রদান (ইঙ্গিত) চালানোর জন্যে কণ্ঠনালী সঞ্চালনের কায়িক অভিজ্ঞতার, তথা শব্দ ও ভাষা সৃষ্টির সংগ্রাম। এই পর্বেই ক্রমে সে প্রকৃতিকে বশ করে অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়েছে এবং তার শক্তিকে নিজেদের উৎপাদনের কাজে লাগিয়েছে। বলাবাহুল্য, এই ক্রমবিকাশ অনায়াসে ও অল্পদিনে হয়নি; নানা বৈপরীত্যের সমাবেশে ও ঘাত-প্রতিঘাতে সামিল হয়ে মানুষ ক্রমে সচেতন হয়েছে, কল্পনা করেছে এবং যৌথ নৃত্য-গীতের মাধ্যমে প্রতিকূল প্রকৃতির ও ভয়ংকর জানোয়ারের (শিকারের প্রয়োজনে) মোকাবিলায় সাহস ও উদ্যোগ অর্জন করেছে।

আদিম গোষ্ঠীসমাজে নকল-নৃত্য (mimetic dance)-এর ঐতিহাসিক ও উপযোগী ভূমিকা রয়েছে এইজন্য যে, প্রধানতঃ শ্রম ও সংগ্রাম থেকে তার জন্ম। জর্জ টমসন তাঁর 'Marxism and Poetry' বইতে বলেছেন : 'যন্ত্র পেয়ে সে কেবল নিজের ব্যবহারেই লাগাল না ; তা দিয়ে সে গোষ্ঠীজীবনের বাঁচার উপায়ও বার করতে থাকল; প্রকৃতি যা দিয়েছে তাকেই সার করল না, তাকে বাগে আনতে গিয়ে কঠিন সংগ্রামের মধ্যে সে জানতে পারল তার কতকগুলি নিয়ম রয়েছে। যতই সে প্রকৃতির বাস্তব প্রয়োজনীয়তা বুঝল, ততোই সে নিজের জীবন সংগ্রামের প্রয়োজনে সেই নিয়মগুলি কাজে লাগানোর তাগিদ বোধ করল এবং ক্রমে তা শিখলও। এইভাবে সে **প্রকৃতির গোলাম হয়ে থাকা থেকে ক্রমে তার প্রভু হয়ে উঠতে লাগল।**

প্রথমে বুঝেছে ঝড়-ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত ও দাবদাহ তার ধ্বংসকারী শক্তি ; সে ভয় পেয়েছে, কষ্ট পেয়েছে এবং অবশেষে বুঝেছে এই প্রতিকূলতা, এই ধ্বংসকারী শক্তি প্রতিহত করতে না পারলে বাঁচার কোন পথ নেই। তখন সে শ্রমের গান গেয়েছে এবং গানের মধ্য দিয়ে যৌথ ও আপোসহীন সংগ্রামের ডাক দিয়ে বিজয়ের সংকল্প ঘোষণা করেছে ; 'জোরূসে মারো হেইও/আরো জোরে—হেইও' ইত্যাদি।

মানুষের ভাষা, যন্ত্র ও বিরুদ্ধ পরিবেশ এই ভাবেই তার সামাজিক ক্রম-বিকাশের সঙ্গে সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে একাকার করেছে এবং এরই মধ্যে দ্বন্দ্ব ও উত্তরণের প্রতিফলন ঘটেছে। জর্জ টমসন তাঁর 'Human Eseence' বইতে বলেছেন : "উৎপাদন পদ্ধতিতে যন্ত্র যেমন শ্রমিক ও উপকরণের মধ্যে সমন্বয় ঘটায় ও পরিচালিত করে, ভাষা তেমনি শ্রমিকদের মধ্যে পরস্পর বোঝাপড়া ঘটিয়ে তাদের কাজকর্মকেও সমন্বিত করে।' দেখা যাচ্ছে, শ্রমকে সজীব করার কাজে ভাষার সঙ্গে শ্রমসঙ্গীতও মূল্যবান ভূমিকা নিয়েছে এবং মানুষের সংস্কৃতির আদিমতম পরিচয় এই শ্রম সঙ্গীতেই। শ্রমের নিজস্ব ভাষা যেমন আর্তনাদ ও বেদনা, তেমনি সঙ্গীতেরও জন্ম হয়েছে বেদনা ও উত্তরণের আর্তি থেকে।

পরের স্তর শ্রমবিচ্ছিন্নতা ও এ্যালিয়েনেশনের স্তর। তার মানে সমগ্র শ্রম-প্রক্রিয়া থেকে মানুষ ক্রমশই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ; অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত 'সভ্য' সমাজের পূর্ণ বিকশিত সঙ্গীতের সঙ্গে শ্রম-সঙ্গীতের তফাৎ হয়ে গেল। আসলে উৎপাদনের উপায় ও শক্তি বেড়ে গিয়ে সমাজে উদ্বৃত্ত উৎপাদনের ও সেই উৎপাদিত সামগ্রীর বাজারমুখী হওয়ার পরিণতিতেই এই শ্রমবিচ্ছিন্নতা বা

শ্রমপ্রক্রিয়ার সঙ্গে শ্রমিকের মানসিক বিচ্ছিন্নতা বানিয়ে তোলা হয়েছে। এই স্তরে তদারককারী রাজা ও যাজক-পুরোহিত শ্রেণী গজিয়ে উঠেছে এবং সমাজে নানা থাকের ভাগ শুরু হয়েছে। এই সময়কার সঙ্গীতে শ্রমের যৌথ চরিত্রে নতুন উপাদান যোগ হয়েছে; শ্রমের উপর, উৎপাদনের বণ্টন ও ভোগের উপর অধিকারগত প্রশ্নে একটা বিচ্ছেদের অভিমান ফুটে উঠেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার পাথর ভাঙার একটি গানে: 'ওরা তাড়া করে—আ-হাঃ/ওরা বড় নিঠুর—আ-হাঃ/ওরা খায় কফি—আ-হাঃ/মোদের ফাটে ছাতি—আ-হাঃ।'

যেদিন থেকে মানুষ হাতিয়ার বানিয়েছে এবং উৎপাদনের কাজে প্রাথমিক যন্ত্র আবিষ্কার করেছে তখন থেকেই সে **বিজ্ঞানী**; আর তা ব্যবহার করতে গিয়ে শরীর সঞ্চালনের জোর ও কাজের উৎসাহ বাড়াতে যখন থেকে কণ্ঠ থেকে স্বর ও অঙ্গের নানা ভঙ্গিমায় ছন্দ ফুটেছে তখন থেকে সে **শিল্পী**। এরা উভয়েই দুনিয়াকে বদলানোর কাজে নিযুক্ত থাকে। বিজ্ঞানী প্রধানতঃ প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বস্তুগত সম্পর্কে বাইরের জগতকে, আর শিল্পী প্রতিবেশী জনগণের সঙ্গে আত্মগত সম্পর্কে ভিতরের বা অন্তর্জগতকে বদলাতে চান। বিজ্ঞানী আমাদের প্রকৃতির উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ও সে সম্পর্কে জ্ঞান বাড়ান; আর শিল্পী আমাদের সমাজ চেতনার ও শ্রেণীসংগ্রামের শক্তি যোগান দেন। তার মানে অবশ্য এটা নয় যে, এরা যে যার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন। এরা একই সমাজ-পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য উপাদান; একই মাটিতে এদের বাস ও বাঁচা।

বিজ্ঞানীর বেশী ঝোঁক বস্তুর পরিমাণগত উপাদানের দিকে; এক স্তরের বিমূর্ততা থেকে অন্য উন্নত স্তরে এগিয়ে যান এবং অবশেষে বিশুদ্ধ গণিতে পৌছান। অপর পক্ষে শিল্পী বস্তুর গুণগত উপাদানের গভীরে গিয়ে ভাষা থেকে কবিতা ও সঙ্গীতের দিকে এগিয়ে যান, এগিয়ে যান বিশুদ্ধ সুরের দিকে। কিন্তু বিজ্ঞানীকে বাইরের জ্ঞানের জন্য চিন্তা-চেতনার অন্তরঙ্গীকরণ করতে হয়, যার ফলে তার কাজের মধ্যে একটা আত্মগত প্রক্রিয়াও থেকে যায়; আবার শিল্পী তাঁর রচনাকে জনগণের উপভোগ্যতায় রূপান্তরিত করতে গিয়ে আত্মস্থ বিষয়, বক্তব্য ও অনুভূতিগুলিকে সাধারণের গ্রহণযোগ্য আঙ্গিকের আশ্রয় নিয়ে থাকেন।

এ থেকে দুটি সত্য বেরিয়ে এল: প্রথমতঃ, সমাজ ও ইতিহাসের বিকাশধারায় বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ, বস্তুগত ও আত্মগত, পরিমাণগত ও গুণগত এবং শিল্প ও বিজ্ঞানের মধ্যে অবিরাম বৈপরীত্যের সম্পর্ক কাজ করে চলেছে; দ্বিতীয়তঃ, যুগে যুগে যে কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সময়ে পুরোন ধারার সঙ্গে পরস্পর দ্বান্দ্বিক

সম্পর্কে চালু বিষয় ও আঙ্গিকের রূপান্তর ঘটে এবং নতুন ধরণের ঠোকাঠুকি ও ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে সমাজ ও শিল্প-সাহিত্যের বিকাশ হয়।

প্রাচীন উপজাতীয় গোষ্ঠীসমাজের ম্যাজিক ও ধর্মাচার থেকে শ্রেণী-সমাজের সচেতন শিল্পী সমকালের সামাজিক মানুষের কাছে চেনা-জানা প্রথাগত আঙ্গিকের মধ্যেই নতুন বিষয় ও ভাব মিশিয়ে দিয়েছেন ; পরে এই নতুন বিষয়-ভাবের প্রয়োজনেই ক্রমে আঙ্গিকেরও বদল হয়েছে। এরই নাম **শিল্প-সাহিত্যের দ্বান্দ্বিকতা,** যা না ঘটলে শিল্প-সাহিত্য অর্থহীন। সমাজ যেমন উৎপাদনগত কাঠামো ও উপরিতলের দ্বন্দ্ব ও নতুন ধরণের ঐক্যের মধ্যে এগিয়ে চলে, শিল্প-সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিকের বিকাশও সেই আদিম কাল থেকে এইভাবেই ঘটে চলেছে।

পুরাণ ও ইন্দ্রজাল বা ম্যাজিক কোন শিল্পীর সচেতন সৃষ্টি ছিল না। তখন সে বিস্মিত হয়ে কেবলই কল্পনা করেছে, বিশ্বাস করেছে, বিরাট পাখীর উড়ে যাওয়াকে সে শিশুর উড়ো-জাহাজ যাওয়ার মত পুষ্পকরথ কল্পনা করেছে। তখনকার সব পুরাণ ও ইন্দ্রজালই প্রকৃতিকে শান্ত করেছে, নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং ভয় ও বিস্ময় মেশা কল্পনা দিয়ে রূপ দিয়েছ। এরই মধ্যে নানা পরিবর্তনের ঘটনা মানুষকে এইজন্যই আনন্দ দিয়েছে যে, সেগুলিতে কল্পনার মাধ্যমে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের বিজয় দেখানো হয়েছে।

এই পুরাণ ও ইন্দ্রজাল কোন সচেতন শিল্পী-মানসিকতার ঘটনা না হলেও, এই পর্বেই দীর্ঘকালের সমাজ-বিবর্তনের ঘটনা প্রতিফলিত হয়েছে। আমাদের বৈদিক পুরাণে যে সব দৈত্য নিধন হয়েছে, সেই সম্বর, পিপ্রু, সুশ্নু ও নামুচি সকলেই অনার্য ; বৃত্রের নিধনের ঘটনা হল এক পর্যায়ের প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতার অবসান ; কারণ বৃত্রের ভাষাতাত্ত্বিক অর্থ 'প্রতিবন্ধক'। এই কারণেই কোশাম্বি মন্তব্য করেছেন : It is always difficult to seperate Vedic myth from possible historical reality" (Culture and Civilisation of ancient India, P-79)। নিশ্চয়ই এই পর্বে সিন্ধু উপত্যাকার কৃষি-অর্থনীতি বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল ও উন্নততর আর্য উৎপাদন পদ্ধতির কাছে পশ্চাৎপদ ক্ষয়িষ্ণু ব্যবস্থাকে হার মানতে হয়েছিল ; তাই সেই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পর্বটি দৈত্যের বিনাশ ও দেবতাদের বিজয়ের পুরাণ-কথায় প্রতিফলিত হয়েছে।

এইসব পুরাণ-কথা ও ইন্দ্রজাল যখন সামাজিক বিবর্তনের ধারা বেয়ে রূপকথা, ব্যালাড, মহাকাব্য ; এমনকি আদি পর্বের গ্রীক নাটকেও রূপান্তরিত হয়েছে

তখনও তাদের মায়াময় কল্পনা, ঐন্দ্রজালিক বা অতি-লৌকিক ঘটনার অনেক আচার ও প্রথা একেবারে উবে যায়নি ; প্রথম প্রথম আঙ্গিকগত কারণে অচেতন ভাবেই থেকে গেছে, পরে উৎপাদনের উপায়, পদ্ধতি ও সম্পর্ক বদলের ফলে নতুন নতুন বিষয়ভাবের দ্বন্দ্ব ও উত্তরণের নিয়মে আঙ্গিকেরও পরিশুদ্ধি ও পরিবর্তন ঘটেছে এবং ক্রমে তা ঘটেছে অনেকটা সচেতনভাবেই। শিল্পী, কবি বা নাট্যকার যদি এই বিষয় ও আঙ্গিকগত দ্বন্দ্ব ও উত্তরণের নিয়ম ও চাহিদাকে বুঝতে এবং প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হন, তবে হয় তিনি যান্ত্রিক ভঙ্গি-সর্বস্বতায় (formalism), নয়ত প্রকৃতিবাদের (naturalism) একপেশেমিতে আটকা পড়ে যান।

এ ব্যাপারটা শুধু শিল্প-সাহিত্যেই নয়, ধর্ম-দর্শনের ক্ষেত্রেও সত্য। প্রাচীন গ্রীসে লোহার ব্যবহার ও মুদ্রা আবিষ্কারের ফলে দ্রুত দ্রব্য উৎপাদন সম্ভব হয়েছিল ; স্বভাবতই উৎপাদনে উদ্বৃত্ত ঘটেছিল এবং তা বাজারের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিল। তখন গ্রীসের শ্রেণী-সমাজে উপনিবেশ বিস্তারে ও সেইসঙ্গে দাস-ব্যবসায়ে সাড়া জেগেছিল, এই পর্বে কারিগরও কৃষকদের দলে নিয়ে বণিকশ্রেণী ভূমি-মালিক অভিজাতদের উচ্ছেদ করে এবং ক্রীতদাসদের বাদ রেখে গ্রাসিয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু গণতন্ত্রের এ চেহারা বেশীদিন থাকেনি, থাকতে পারে না। কারণ তখন ক্রীতদাসরাই ছিল কায়িক শ্রমের মাধ্যমে উৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত, আর বণিকশ্রেণী ছিল মানসিক শ্রমের তদারককারী সংগঠক মাত্র। **শ্রেণী শোষণ থাকবে, অথচ শ্রেণী সংঘাত তৈরী হবে না, এটা অবাস্তব।** গ্রীসের গণতন্ত্র সম্পর্কে জর্জ টমসন তাঁর 'Capitalism and after' বইতে বলেছেন : But this was an illusion. The form of the new society was contradicted by its content. The new tribal units were based on locality and private property, not common ownership. কাজেই সংকটের মুখে পড়ে ঐ বণিকশ্রেণী আবার ভূমিমালিকদের সঙ্গে আঁতাত করে একই সঙ্গে দাস-মালিক শ্রেণীতে পরিণত হয়। এই ধরণের বিপরীত উপাদানে সচল ও সংঘাতময় আর্থ-সামাজিক সম্পর্ক থেকেই গ্রীসিয় ধর্মদর্শন গড়ে উঠেছে।

প্রথম পর্বে গ্রীক গণতন্ত্রের অর্থাৎ বণিকশ্রেণীর প্রতিনিধি ছিলেন পিথাগোরাস। তাঁর জোড়বিজোড় এবং সীমা-অসীমের ঘাত-প্রতিঘাত ও নতুন বিস্ফোরণের সংখ্যাতত্ত্ব (যা গণিতে, সঙ্গীতে, জ্যোতিষে ও রাজনীতিতেও প্রযুক্ত) ভূমি-মালিকদের বিরুদ্ধে বণিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত 'গণতান্ত্রিক' আন্দোলনের

স্তরে প্রচণ্ড প্রগতিশীল ভূমিকা নিয়েছিল; কিন্তু পরে শ্রেণীশোষণ ও সংঘাত তীব্র হলে বণিকশ্রেণীর এই আংশিক ও কাম্য গণতন্ত্র রক্ষার প্রয়োজনে যখন এই পিথাগোরাসের দর্শনকেই অন্য ব্যাখ্যা দিয়ে শাসকশ্রেণী শ্রেণী-সমন্বয়ের আদর্শ প্রচার করতে থাকল, তখন এই স্তরের পরবর্তী বিপ্লবী দার্শনিক হেরাক্লিটাস বণিক-শ্রেণীর গণতন্ত্র বাতিল করে দীর্ঘদিন ধরে চেপে রাখা দাস-মালিক ও দাসেদের শ্রেণী-সংগ্রামকেই সে যুগের মূল ও প্রধানতম দ্বন্দ্ব বলে প্রচার করলেন। তিনি বললেন: বিস্ফোরণের পর স্থিতি বলে কিছু নেই, অবিরাম দ্বন্দ্ব, গতি ও পরিবর্তনের চাপ বা 'টেনসন'ই সত্য; এর মধ্যে একটা শক্তিই কাজ করছে, তা হল আগুন যা অন্যান্য বস্তুর মধ্যে সেইভাবেই মিশছে ও বদলাচ্ছে, যেমন করে অর্থ বা স্বর্ণমুদ্রা অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে মিশছে ও বদলাচ্ছে। হেরাক্লিটাসের এই বৈপ্লবিক দর্শনকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের চমৎকার প্রকাশ বলে লেনিন অভিনন্দিত করেছেন। তাঁর 'চিরজীবন্ত' আগুনের ধারণা সম্পর্কে লেনিন মন্তব্য করেছেন: 'A very good exposition of the principles of the Dialectical Materialism'.

পরে, এই গ্রীক যুগ থেকে রেনেসাঁসের পর্ব পর্যন্ত মধ্যযুগে সমস্ত রকম প্রাচীন সভ্যতা, ঐতিহ্য ও দর্শন–সংস্কৃতি লোপাট করে একেবারে কাঁচা থেকে সুরু হয়েছিল বলা যায়। অষ্টাদশ শতকে যুক্তি (Reason) যেমন ছিল সমাজ–অর্থনীতি ও রাজনীতির নিরিখ, সেই মধ্য যুগে সবকিছুই বাঁধা হয়েছিল গীর্জা ও যাজকদের শাস্ত্রীয় ও আনুষ্ঠানিক ডগমা দিয়ে। সামন্তযুগের শাসকশ্রেণী আদিম পুরাণ–প্রথা থেকে পার্থক্য করার স্তরে ধর্মকে বিশ্বাস করেছিল। পরে শোষিত জনগণের বিদ্রোহের মুখে পড়ে এই বিশুদ্ধ ধর্মকেই সরকারী ডগ্‌মায় বেঁধে শোষণ–পীড়নের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে থাকে। তখন 'শ্রমবিচ্ছিন্ন' কায়িক শ্রমকারী ক্রীতদাসদেরও অমরত্বের দাওয়াই দেওয়া হয়েছে এই বলে: কাজ করে যাও, মা ফলেষু কদাচন; এ জন্মে প্রভুর প্রতি ভক্তি ও আনুগত্য রেখে খেটে যাও, পরজন্মে স্বর্গ পাবে; এ জন্মে কাজ, পরজন্মে 'অমৃত'—এটাই তোমার অমরত্ব, তুমি অমৃতের পুত্র ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য যে, এই ধর্মশাস্ত্র কিন্তু দাস–শ্রমিক বা শূদ্রদের পাঠ করা তো দূরের কথা, চোখে দেখার কিংবা কানে শোনার অধিকারও ছিল না। এই প্রসঙ্গে ক্রীস্টোফার কডওয়েল বলেছেন: "Thus the increasing misery of the exploited class is reflected in the increasing loveliness of its after life, provided it leads the good life—i. e., one obedient to its employees" (illusion and Rea-

lity, p—50); দেখা যায়, যে মানুষ এক সময়ে প্রকৃতির সঙ্গে, বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে উন্নততর সভ্যতার ভিৎ গড়েছিল, দাস-মালিক ও সামন্ত প্রভুদের আমলে সেই শ্রমকারী মানুষই ক্রমে নিজেই একটা শ্রেণী-স্বার্থ সাধনের উপায়ে বা বিষয়ে পরিণত হয়েছে এবং তারই আদর্শগত সরকারী হাতিয়ার হল আত্মার তত্ত্ব বা ধর্ম। এই শাসকশ্রেণীর গান শ্রীমদ্ভাগবতের গান; তাতে শ্রীকৃষ্ণ বলে: জন্মসূত্রে পাপী হলেও নারী, বৈশ্য ও শূদ্ররা আমার নাম নিলে পরজন্মে উদ্ধার পাবে; চারি বর্ণের শ্রেণীভেদ আমারই সৃষ্টি ইত্যাদি।

কিন্তু শাসকশ্রেণীর এইসব পরিকল্পিত ভাববাদী ধর্ম-দর্শন যখন দুর্দশাগ্রস্ত নিপীড়িত সাধারণ জনজীবনে চালান করা হয়, তখন ক্রমে **বাস্তব অবস্থার সঙ্গে এই সমস্ত বিমূর্ত ও বানানো ভাবগুলির বিরোধ** ঘটতে থাকে এবং সেই থেকে লৌকিক ধর্মেরও (popular religion) বিকাশ হয়। এগুলি মূলতঃ ভাববাদের মোড়কে থাকলেও, শোষিত মানুষ যখন কেঁদে প্রার্থনা করে, তখন সেই ধর্মীয় আর্তির মধ্যে প্রকৃত দুঃখ-দুর্দশা, অভিমান-অনুযোগ ও কখনো বিদ্রোহের সুরও ফুটে ওঠে। এই কারণেই ফ্রেডারিক এঙ্গেলস তাঁর 'জার্মান ইডিওলজি'তে বলেছেন: 'একেবারে গোড়ার দিককার সমস্ত কৃষকবিদ্রোহ এক ধরণের ধর্ম-বিদ্রোহ ছিল।' এ কথা তো ঠিক যিশুখ্রীষ্টকে রাজার ঘাতকরাই ক্রুশবিদ্ধ করেছিল। কেন? কারণ তিনি এ কথাও প্রচার করেছিলেন—Oh God! Give us this day our daily bread'. অবশ্য পরবর্তীকালে এই খ্রীষ্টধর্মকেই চার্চ ও রাজা শ্রেণীশাসনের অস্ত্রে শানিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু আদিতে তা লোকধর্ম ছিল এবং তাতে বুকও ফাটে, মুখও ফোটে। কডওয়েল এ প্রসঙ্গে বলেছেন: "Beneath the official religion, which can no more be changed than the system of productive relations which has generated it, lurks a whole undergrowth of 'Superstition and legend'—the mythology of the people playing its old collective role, but now regarded as something vulgar and ungentlemanly by the ruling class". আমাদের মুকুন্দরাম যখন চণ্ডীর কাছে অভিমান করেন: 'তৈল বিনা কৈলুঁ স্নান/করিলুঁ উদক পান/শিশু কান্দে ওদনের তরে', রামপ্রসাদ যখন কান্নায় অভিমানে মুখ ফুটে বললেন: 'মা আমায় ঘুরাবি কত/কলুর চোখ বাঁধা বলদের মত', কিংবা ভারতচন্দ্রের (অন্নদামঙ্গল-এ) ঈশ্বরী পাটনি যখন দেবীর কাছে প্রার্থনা

করে: 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে', তখন সেইসব ধর্মনির্ভর কাব্য-সঙ্গীতের মধ্যেও সমাজের শ্রেণীসম্পর্ক ও বিরোধের প্রতিফলন ঘটে যায়। এক কথায়, এগুলিই শিল্প-সংস্কৃতির মানবিক উপাদান; এ ছাড়া যে সব 'কল্পিত স্বপ্নমায়ার জগত' তৈরীর প্রয়াস ধর্ম-দর্শনের মাধ্যমে ঘটেছে সেগুলি অ-মানবিক। প্রাচীন মিশর, গ্রীস, রোম, মধ্যযুগীয় রাশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য অথবা গথিক শিল্প-এর বিভিন্ন চিত্রকল্পে যে মানবিক উপাদান রয়ে গেছে তা রেনেসাঁ'র মানবিকতা থেকে আলাদা হলেও মানব সভ্যতার একটা বিশেষ ঐতিহাসিক স্তরে মূল্যবান অবদান রেখেছে।

মানুষের সমাজ-সংস্কৃতির কথা মানেই মানুষের শ্রম ও তার সৃজনশীলতার জয়ধ্বনি। কবিতায়, সঙ্গীতে ও শিল্পকলায় যখন শ্রমশীল মানুষের স্বপ্ন জাগে তখনও তার মধ্যে একটা বাস্তব জিয়ন রসের উপাদান থাকে, যার মধ্যে স্থিতাবস্থা থেকে মুক্তির বা উত্তরণের বেগ ফুটে ওঠে। ভ্লাদিসলাভ জিমেনকভ তাঁর 'দি হিউম্যানিজম অব আর্ট' বইতে বলেছেন: The art of various epoches examined different aspects of man but always, provided it was genuine art, had as its object not an isolated, self-engrossed individual but man as a soical being." মোট কথা, জীবনের সঙ্গে সমাজের **গতিশীল ও দ্বান্দ্বিক সহ সম্পর্কের** কথাই মানব-সংস্কৃতির কথা। জীবন মানে কেবলই শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করাই নয়, তারই মধ্যে সক্রিয় রয়েছে সভ্যতার থাকে থাকে পা ফেলে এগিয়ে যাওয়ার সংগ্রাম—তার সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অধিকার ও মর্যাদালাভের, তার নিজের দুর্বলতা ও অক্ষমতা কাটিয়ে ওঠার, প্রাকৃতিক শক্তিকে দখল করার প্রচণ্ড সংগ্রাম; অর্থাৎ তার বিকাশের পথে যা কিছু বাধা তা থেকে মুক্তির আকাঙ্খাই তার জীবনের লক্ষণ, তার শিল্প-সংস্কৃতির মৌলিক চালিকা শক্তি।

শয়তানের পুণর্জন্ম ও প্রাসঙ্গিক কথা

লোকটা জমিতে কাজ করতে করতে হাঁপাচ্ছিল ; কিছু দূরে পাহাড়ের পাথর কাটতে কাটতে আর একটি লোক ঘাম মুছছিল ; ওদের দুজনেরই মুখ যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে উঠছিল। ওরা ক্ষুধার্ত। পাশেই জানোয়ারের চামড়ায় তৈরী চাবুক হাতে বিকট চেহারার পেয়াদারা টহল দিচ্ছিল ; এমন সময় এক সাধু মোহান্ত এসে ক্ষুধার্তদের জানাল : ভুলো না যে তোমাদের জন্য স্বর্গে স্থায়ী শান্তিসুখ অপেক্ষা করছে। মনে সন্তোষ রাখ। মা হিংসী।

নগরে রাজার সামনে, আর গীর্জায়, মন্দিরে তখন কিছু লোক শপথ নিচ্ছে, প্রার্থনা করছে : হে ঈশ্বর! রাজার প্রতি ভক্তি রেখে, আইনের প্রতি অনুগত থেকে এবং পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃভাব রেখে আমরা যেন তোমার সেবা করতে পারি।

লোকালয় থেকে দূরে পাহাড়ী জঙ্গলে আগুন জেলে কিছু মানুষ তখন শীত তাড়াচ্ছে ; ওরা বলছে : খ্রীষ্টের রূপেই যদি ঈশ্বর আমাদের গড়েছেন, তবে আমাদের সঙ্গে এই রকম পশুর মত ব্যবহার করা হচ্ছে কেন ?

কার্ল মার্কস যে ধর্মকে 'জীবনের আফিম' বলেছেন, এই বক্তব্যকে কেবলই নেতি অর্থে বা যান্ত্রিক ভাবে নিলে ভুল হবে ; কারণ তিনি লোকধর্মের প্রশ্নে 'প্রকৃত দুঃখকষ্টের প্রকাশ,' 'বাস্তব দুঃখের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ,' 'অত্যাচারিত মানুষের দীর্ঘশ্বাস' প্রভৃতি মূল্যায়নও রেখেছেন। একেবারে গোড়ার যুগে, রোমে সিজারের আমলে খ্রীষ্ট ধর্ম যদিও দাসপ্রথা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তোলেনি, তবু যেহেতু ক্রীতদাস ও স্বাধীন দুই রকম মানুষই এ ধর্ম নিতে পেরেছিল, সম্রাটকে পূজা করতে অস্বীকার করেছিল এবং তার ঐহিক কর্তৃত্বে অনাস্থা প্রকাশ করেছিল ; তাই ক্রমে খ্রীষ্ট হয়ে উঠলেন দুঃখ বেদনার (ক্রুশের প্রতীক) প্রতি- মূর্ত, শ্রমজীবী প্রতিবেশীদের প্রতি প্রেমের আদর্শ। এঙ্গেলস বলেছেন : Christanity was originally a movement of oppressed people ; it first appeared as the religion of slaves and emanciated slaves, of poor people deprived of all rights." কিন্তু পরবর্তী স্তরে

প্রায় তিনশ বছর পর সামন্ত যুগে কৃষি-উৎপাদনের অগ্রগতির প্রয়োজনেই স্রোতের টানে ঘোরানো চাকা, হাওয়ার টানে চালিত কল, ঘোড়ার সাজ, হাল প্রভৃতি উন্নততর যান্ত্রিক উপায় বেরোলে শ্রেণীশোষণ ও বিরোধ তীব্রতর হল এবং খ্রীষ্টের নামেই প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণী জনগণের উপর জুলুম চালাতে লাগল। কারণ এই যুগে প্রধান ধর্ম-যাজকরাই ছিল বড় বড় জমির প্রভু।

অতঃপর ধনতন্ত্রের পর্বে শ্রমশক্তিও যখন পণ্যে পরিণত হল, তখন ক্যাথলিক চার্চ বলল : ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা হল প্রকৃতির নিয়ম এবং ঈশ্বরের আইন।

কিন্তু এই পর্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যারও বিকাশ হয়েছে, যন্ত্র ও কারিগরি শিল্পও উন্নততর হয়েছে ; তার মানে অলীক ভাববাদের বিরুদ্ধে বস্তুবাদী চিন্তা–দর্শনের বিজয় ঘটে চলেছে। ধর্ম-শাস্ত্রের বন্ধন থেকে বিজ্ঞানকে মুক্ত করতে শত শত বিজ্ঞানীকে 'পিশাচ' হয়ে পুড়ে মরতে হয়েছে ; এমনকি কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, ব্রুনো ও নিউটনকেও কম দুর্ভোগ সইতে হয়নি। স্মরণ রাখা দরকার, আদিম ইন্দ্রজালের নেতিবাচক দিক, অলীকতা ও অজ্ঞতার দিক থেকে ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছে ; এবং সেই ইন্দ্রজালেরই ইতিবাচক, বস্তুভিত্তিক জ্ঞানের দিক থেকেই বিজ্ঞানের জন্ম ও বিবর্তন হয়েছে। একটি অতিপ্রাকৃত শক্তির জটিলতা ও সূক্ষ্মতার দিকে যাওয়া, অপরটি প্রাকৃত বা বস্তুশক্তির জ্ঞানকে বাড়িয়ে উৎপাদনের অগ্রগতি ঘটানো। এরা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যায়, একে অপরকে অগ্রাহ্য ও খতম করতে চায়।

এই টানাপোড়েনের কারণেই নিউটনকে পর্যন্ত ধর্মীয় ভাববাদের সঙ্গে খানিকটা আপোষ করে অপরিবর্তনীয়তার ধারণা রেখেই তাঁর পদার্থ বিজ্ঞান পরিবেশন করতে হয়েছিল। অত:পর ১৭৫৫ সালে প্রকাশিত কান্টের 'প্রকৃতির ইতিহাস ও নভঃতত্ত্ব' বলল : প্রকৃতির সবকিছু কেবল রয়েছে তা নয়, নতুন করে উদ্ভবও হচ্ছে, বদলাচ্ছেও।

অষ্টাদশ শতকের 'আলোকপ্রাপ্ত' বা র‍্যাশনালিষ্টরা নিউটনের অব্যয়তা বাতিল করে তাঁর পদার্থ বিদ্যার দর্শন নিয়েছিলেন ; চেম্বার্স প্রাণের গতি ধরলেন এবং ১৮৫৯ সালে ডারউইনের 'বিবর্তনবাদ' ধর্মের সব টান ছিঁড়ে ফেলল।

তবু ধর্মের ভূত বা শয়তানকে পুরোপরি তাড়ানো যায়নি; এমনকি ফরাসী বিপ্লব ধর্মের বাইরে জ্ঞান ও কর্মের আলাদা একটা জগৎ সৃষ্টি করলেও, চার্চকে পুরোপুরি আটকাতে পারেনি ; কিংবা বলা যায়, বুর্জোয়া গণতন্ত্র তার সুস্থ-পর্বে ধর্মের অধিকারে হাত দেয়নি। এরই ফলে, বুর্জোয়া সমাজ পচতে সুরু-

করলে, ১৮৪৮ সালে কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেস্টোর সময় থেকে, ধীরে ধীরে ১৮৭৮ সাল নাগাদ ধর্মীয় ভাববাদ **ক্যাথলিক সমাজবাদের** সাইনবোর্ডে আবার মাথা চাড়া দেয়। এটা গজিয়েছিল ১৮৩২-৪৮ সালে ইংলণ্ডে শ্রমিক কর্মচারীদের গণতান্ত্রিক অধিকারের চার্টিস্ট আন্দোলনের পর্বে। এই সময়ে প্রায় সারা ইউরোপেই এই **প্রতিক্রিয়ার শয়তান** তার ছায়া ফেলে মানুষের অর্জিত বিজ্ঞানচেতনা ও গণতান্ত্রিক অধিকারকে থামাতে ও বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিল। লাডলোর 'খ্রীশ্চান সোসাইটি' এই ভাববাদী সমাজতন্ত্রের মুখপত্র হয়ে প্রচার করতে লাগল যিশু গরীব ছিলেন; গরীবদের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন। কাজেই যিশুই স্বাধীনতা দেবেন। যিশু ছাড়া যে সমাজতন্ত্র, তা পাখি ছাড়া ঝরাপালক মাত্র। এমনকি, ১৮৯০-৯১ সালে, যখন প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রস্তুতি ও সারা ইউরোপে শ্রমিক আন্দোলন পুরোদমে চলেছে, তখনও পোপ তাঁর চেলাদের দিয়ে, হৃদয় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সামাজিক ব্যাধি দূর করার কথা প্রচার করতে থাকেন; এর জন্য দেদার টাকা ছড়ায় সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া শাসকরা। ওরা **বিজ্ঞান ও কম্যুনিজমের ভূত** এই সময় থেকেই ভয়ংকরভাবে দেখতে থাকে।

আজ সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া দুনিয়া সমাজতন্ত্র; জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ও প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের সার্বজনীন সামাজিক চরিত্রের চ্যালেঞ্জ সামলাতে, অর্থাৎ ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে বিজ্ঞানের মধ্যেও 'ঈশ্বর' আমদানী করেছে, নতুন নাটক সুরু করেছে। গুরুর মুখের কাছে জলন্ত প্রদীপের আরতি হচ্ছে। চোখে লাগানো মোমের আস্তরণ গলে যাচ্ছে। মধুর কাজল ঝরে পড়ছে। বাবার চোখে 'অমৃত'। ভক্তেরা তা জিভে স্পর্শ করে পরলোকে শান্তির পথ নিশ্চিত করছে— অর্থাৎ বিজ্ঞানকেও অবতার বানানোর কাজে লাগিয়ে মানুষকে বোকা বানানো হচ্ছে। 'সানডে' পাতার পর পাতায় এর মহিমা প্রচার করছে। সুফী লোকধর্মের বিশ্বজনীন মানবতার ঐতিহ্যকে সাঁই অবতারে পরিণত করা হচ্ছে, জাজ ও জুলু লোকসঙ্গীতকে নাইট ক্লাব ও ব্রথেলে যৌন উত্তেজনা ছড়ানোয় কাজে লাগানো হচ্ছে, এশিয়া আফ্রিকার উপজাতীয় নারীদের যৌন ব্যাভিচারের পণ্যে পরিণত করা হচ্ছে উপন্যাসে ও চলচ্চিত্রে; এবং এ সবের দার্শনিক সমর্থনও দেওয়া হচ্ছে সমানে। ১৯৭৫ সালের ১১ ফেব্রুয়ারী 'নিউজ উইক'-এ লরেন্স লেশান লিখেছেন: সপ্তদশ শতকে যে বস্তুবাদী দর্শনের উদ্ভব হয়েছিল তা আজ অর্থহীন। আমরা যে মূল্যবোধের উত্তরাধিকারী হয়েছিলাম তার যখন মানেই নেই, তখন আর কোথায় যাব? নিজের মনের মধ্যে সেঁদিয়ে যাই—যৌন উত্তেজনা, রহস্য-

ময়তা ও স্থূল ইন্দ্রিয়াত্মক রোমাঞ্চে! এইসব সাইকো-আধ্যাত্মিকতার ঘাঁটি এখন আমেরিকা। সেখানকার ইউরি গেলার মন্ত্র-তন্ত্রে নাকি তাবড় বিজ্ঞানীদেরও তাক লাগাচ্ছে। অক্সফোর্ডও কম যায় না। সেখানে এখন **ডারউইনবাদের সঙ্গে ঈশ্বরের** জীবনবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ককটেল-মিক্সচার করে গবেষণা হচ্ছে। এ কাজে সাহায্য করছে ম্যাকডুগ্যাল ও সিরিল বার্ট প্রমুখ বুর্জোয়া পণ্ডিতদের ভেক বিজ্ঞান। পাছে দেশে দেশে জনগণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার উত্তরাধিকার পেয়ে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তাই 'এ্যান্টি ম্যাটার' ও বিজ্ঞানবিমুখতার উদ্ভট দর্শন প্রচারে নেমে পড়েছে। মধ্যযুগে জিন, ডাইনী ও শয়তান তাড়ানোর আধ্যাত্মিক রোজার পেশা চালু ছিল; আজ পশ্চিমী সাইকিয়াট্রিস্টরা সেই পেশা আবার চাগিয়ে তুলেছে।

এইসব ফ্রয়েডীয় গুপী গায়েনদের সঙ্গে বাঘা পোপ বায়েন ধরেছেন; তিনিও ফতোয়া দিয়ে বলেছেন: হ্যাঁ, ঠিকই, আদিম পাপ আগের মতোই শক্তিশালী এবং তার পুনর্জন্ম হয়েছে। মজার কথা, এইসব ফ্রয়েডীয় মুক্তিবাহিনীদের যেমন 'বাজার' করে দেওয়া হচ্ছে, সেই সঙ্গে মুনাফা ও বিজ্ঞানবিমুখতার নেশা ছড়াতে আধ্যাত্মিক ম্যাজিকের প্রতি মোহ ও বিশ্বাস নিয়ে, নিজেদের শক্তিশালী প্রচার-মাধ্যমে সোরগোল তুলেছে। এটা না করলে যে সমাজের গণতান্ত্রিক বিকাশ, **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার 'সামাজিকীকরণ'-এর** শক্তি জনগণের মধ্যে বিনা বাধায় সঞ্চারিত হয়ে যায়! সেটা তো অবশ্যই মনোপলি পুঁজি, ফ্যাসিজিম ও স্বৈরতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক! তাই ব্যবস্থার ভুল হয়নি প্রধানতঃ বিজ্ঞানকে শ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন আলাদা একটি উৎপাদনী শক্তি হিসেবে মুনাফার সেবায় লাগাতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি সাম্রাজ্য-বাদী দেশগুলির শিক্ষাব্যবস্থা নতুন করে ঢেলে সাজান হয়েছে, সেইসব দেশে প্রকৃতি ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানীদের মানুষ ও জাতির ইতিহাস থেকে আলাদা খোপে রেখে তোতা পাখির তত্ত্ব শেখানো হচ্ছে; ইতিহাস এমনভাবে শেখানো হচ্ছে যেন তা বিজ্ঞানের কোন শাখাই নয়। এরই নাম ভেক-বিজ্ঞান বা মনোবিজ্ঞান-ভিত্তিক 'প্যাকেজ ডিল' প্রথা। 'বর্তমান বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থায় যে প্রকৃতিকে জানা ও মানুষকে জানার পাঠক্রম পদ্ধতি আলাদা খোপে রাখা হয়, সেটা হল বিজ্ঞানকে উৎপাদনী শক্তি হিসাবে মহীরুহে পরিণত করার প্রয়োজনীয়তা এবং পুঁজি ও শ্রমের প্রকৃত সম্পর্ককে গোপন করার প্রয়োজনীয়তার মধ্যে বিরোধের প্রতিফলন।" (জর্জ টমসন, হিউম্যান এসেন্স, পৃঃ ১০২)।

এশিয়া আফ্রিকার ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ও তার উপযোগী উপরিথাকে ঘেরা দেশগুলিতে বুর্জোয়া ধনতন্ত্রের বিকাশ অবশ্যই প্রগতিশীল ঘটনা ; কিন্তু লক হবস থেকে সরে আসা মনোপলি পুঁজির চিন্তা ভাবনা যখন এইসব দেশে 'প্রগতিশীল' বলে চালানো হয়, তখন স্বভাবতই সামন্ত অবশেষের পচাগলা মাটিতে ঐ সমস্ত **বিচ্ছিন্নতার অতিলৌকিক ম্যাজিক** গিলে নেওয়া ও গিলিয়ে দেওয়া সহজ হয়। কৃষকের হাতে জমি দেওয়ার মত ফরাসী বিপ্লবের নীতি বা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার কাজ হয়ে যাবার পরও ঐ সব দেশের হাল যদি এই রকম হয়, তবে অসমাপ্ত গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দেশগুলিতে যে একই সঙ্গে সামন্তবাদী স্থুল ও সাম্রাজ্যবাদী সূক্ষ্ম ধর্মের চাষ ভালোই জমেছে, এতে মুমূর্ষু শাসকশ্রেণীকেই 'অক্সিজেন' যোগান হচ্ছে।

আজ সাম্রাজ্যবাদীদের, সেবাদাস বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও শিল্পী-সাহিত্যিকরা বাস্তববাদী চিন্তা-দর্শনের ও সমাজের গণতান্ত্রিক বিকাশ দেখতে পারছে না। আজ যে দুনিয়ার এক-তৃতীয়াংশ মানুষের জীবনে, ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সবচেয়ে প্রগতিশীল জনগণের মধ্যে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শনের বিজয়-বৈজয়ন্তী ঘটে চলেছে, গলায় বগলসের দাগওয়ালা ও চোখে স্বর্গীয় ঠুলি-পরা বুদ্ধিজীবী পণ্ডিতদের পক্ষে দেখতে না পারাই স্বাভাবিক ; কি করে দেখবে নিজেদের পরাজয় ও অধঃপতনের ভয়ংকর দৃশ্যাবলী ! পুরোন বুর্জোয়া কনসেসনে বঞ্চিত এবং এখনকার মনোপলি পুঁজির চাপে অতিষ্ঠ জনগণকে বিজ্ঞান, গণতন্ত্রের বিকাশ ও সমাজতন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা করতে অবক্ষয়ের গুহায় নিয়ে গিয়ে বিষাক্ত সরীসৃপের নেশায় বুঁদ করে রাখা, অতিলৌকিক আধ্যাত্মিক ম্যাজিকে আচ্ছন্ন করে রাখা, নিজেদের পতনের সঙ্গে মানুষকেও অধঃপাতিত করা বরং ভাল ! এইভাবেই স্থিতস্বার্থ টিঁকিয়ে রাখার চেষ্টা চলছে। পচাগলা সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াভূতেরা ক্রমবিকাশশীল প্রযুক্তিবিজ্ঞান ও সমাজতন্ত্রের রোজকে কী নিদারুণ ভয় করছে !

এটা করা ছাড়া উপায় নেই। কারণ **গোটা জাতির শ্রমজীবী জনগণ উৎপাদনের উপায়গুলির মালিক হয়ে উঠলে** প্রকৃত স্বাধীনতার তথা জীবন-বিকাশের সমস্ত কপাট খুলে যায় ; তখনই মানুষ শিক্ষা সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও মৈত্রীবন্ধনে সমৃদ্ধ ও উন্নত হয়ে ওঠে। মনোপলি পুঁজির ও ঔপনিবেশিক বাজারের মালিক-শাসকরা এই রকম ঘটনার সম্ভাবনাকে তো দাঁতে দাঁত দিয়ে আটকাবেই। যে জনগণ দেশে দেশে সম্পদ, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের স্রষ্টা তারা রইল উৎপাদনের উপায়গুলি থেকে বঞ্চিত ; তাদের কাছে বুর্জোয়া ধনপতিরা

যোগ্য বলেই ক্ষমতাবান, এই রকম ধারণা চালু করা হয়। আসলে ওদের যোগ্যতা শোষণ ও পীড়ন করার যোগ্যতা; ওদের ক্ষমতা উৎপাদনের উপায়গুলি দখলে রাখার ক্ষমতা। এই যোগ্যতা ও ক্ষমতা বজায় রাখতেই **অবক্ষয়ী ও অবৈজ্ঞানিক শিক্ষা সংস্কৃতির পাহারা গড়ে তোলে।**

কিন্তু দুনিয়ার মানচিত্র আজ বদলেছে এবং অনিবার্যভাবেই বদলাচ্ছে। অবশ্য সমাজের অর্থ-নৈতিক বনিয়াদ বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গেই যে জনগণের চেতনা ও সংস্কৃতি বদলে যায় তা নয়, এর কাজ বৈপ্লবিক পরিবর্তনের আগে থেকেই সুরু হয় এবং সেটা বুর্জোয়া ধনতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ বিরোধে ও ইতিবাচক অগ্রগামী শক্তির বিকাশের কারণেই ঘটে। বিপ্লবের পরও শিক্ষা-সংস্কৃতির সংগ্রাম অব্যাহত থাকে; অর্থাৎ উৎপাদনের উপায়গুলি জনগণের হাতে এসে ফল দিতে সুরু করলে মানুষের মধ্যে বাস্তব জ্ঞান, সাধারণ প্রয়োজন ও সার্বজনীন সমৃদ্ধি সম্পর্কে সক্রিয় কল্পনার বিকাশ ঘটতে থাকে; তারই মধ্যে প্রকৃত স্বাধীনতা ও সংস্কৃতির শরীর ও বোধ গড়ে উঠতে থাকে। 'স্বাধীনতা' হল প্রয়োজনের স্বীকৃতি'—এ কথা বলে এঙ্গেলস তাঁর 'এ্যান্টি ডুরিং'-এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন : স্বাধীনতা প্রকৃতির নিয়ম সম্পর্কে স্বপ্ন দেখা নয়; তা হল ঐ নিয়মগুলি সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান ও তাকে পরিকল্পিত ভাবে জনগণের প্রয়োজনে রূপ দিতে, কাজের মধ্য দিয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। বুর্জোয়া উন্মেষ যুগে স্বাধীনতা বা প্রকৃত সংস্কৃতি সম্পর্কে রেনেসাঁসের মহান বিজ্ঞানী জিয়ান্দানো ব্রুনো বলেছিলেন : 'স্বাধীনতা ও প্রয়োজন এক এবং প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী কাজ করাই মানুষের স্বাধীন কাজ।' এর সঙ্গে অবশ্য এঙ্গেলসের বক্তব্যের গুণগত পার্থক্য রয়েছে। সেটাই স্বাভাবিক। কারণ এঙ্গেলস বলেছেন, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, অর্থাৎ পুঁজিবাদ তখন পচতে সুরু করেছে; তখনকার অবক্ষয়ী বুর্জোয়া সমাজের গর্ভ থেকে আবির্ভূত বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর ক্রান্তিকালকে সামনে রেখে জ্ঞান ও প্রয়োজনের প্রকৃতিকে রূপান্তরিত ও গোলামে পরিণত করার, জনগণের স্বাধীনতা ও সংস্কৃতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে সংপৃক্ত সামগ্রিক জীবনকর্মের** বা সংস্কৃতির বিকাশ অনিবার্যভাবেই ঐতিহাসিক বিকাশের ফল, এ কথা স্মরণ রেখেই দেশে দেশে শোষিত জনগণের ভূমিকা ঠিক হয়ে যাচ্ছে।

বিজ্ঞানের আলো ও ধর্মের কারসাজি

উনিশ শতকের প্রথমার্ধের সম্ভ্রান্ত বুদ্ধিজীবী পিতার দ্বন্দ্ব ও বেদনা সম্পর্কে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় 'আত্মজীবনী'তে লিখেছেন: "যাঁর মন ও চরিত্র হাফেজ, সাদী এবং ইংরাজী সাহিত্যের মহান সৃষ্টির প্রভাবে গড়েছিল এবং যিনি প্রধান শহরের আলোকপ্রাপ্তদের সঙ্গে মিশেছেন, তিনি এমন মানুষদের সঙ্গে মিলিত হবেন যাঁরা অর্ধ-শতাব্দী পশ্চাৎপদ এটা আশা করা যায় না।" এই পশ্চাৎপদ ও ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদী ধারা আরও সুক্ষ্ম অথচ জোরাল ভাবে শিকড় সঞ্চার করেছে, বিশেষ করে রাজনীতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে **গান্ধীবাদী** চিন্তা-দর্শনে, যা উনিশ শতকের রুশী নারোদনিকদের মত সমাজের গ্রামসর্বস্ব প্রাচীন কৃষি সভ্যতার দিকে টান দিয়েছে। রুশ দেশের নারোদনিক চিন্তাধারার মত গান্ধীবাদও আধুনিক বুর্জোয়া শিল্প-বিজ্ঞান সম্পর্কে অনীহায় এবং মধ্যযুগীয় কৃষি-উৎপাদন ব্যস্থার প্রতি মোহে আচ্ছন্ন; এরা ধনতন্ত্রের আবির্ভাবকে আকস্মিক মনে করে এবং প্রাচীন কৃষি-সভ্যতাকে আঁকড়ে থাকতে চায়। স্বভাবতই এরা পাশ্চাত্য প্রয়োগ-বিজ্ঞান ও বৃহৎ শিল্পায়নে বাধা দিয়ে সমাজের বিকাশ ঠেকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছে। ১৮৮৩ সালে এই **নারোদনিক আদর্শের বিরুদ্ধে মার্কসবাদী** তাত্ত্বিক নেতা প্লেখানভ লড়েছিলেন এবং পরবর্ত্তীকালে সর্বহারা শ্রেণীর মহান নেতা লেনিন এই পশ্চাৎপদতা ও পুনরুজ্জীবনবাদের বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে, প্রথমে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক অধিকারকে প্রসারিত করে দুনিয়ায় প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব (১৯১৭) সম্পন্ন করেন। উল্লেখযোগ্য যে, বেকন-লক-হব্‌স ও ভল্টেয়ার প্রমুখ বস্তুবাদী এনলাইটনারদের সঙ্গে নারোদনিকদের পার্থক্য হল, প্রথম পক্ষ গীর্জার একচেটিয়া আধিপত্য ও ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন; কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ ঐ সব চালু রাখারই পক্ষে; কারণ তারা বর্তমান সমাজের চেহারা ও চরিত্রকে ভয় করে; বুর্জোয়া সমাজে তারা কেবলই হারানোর বেদনায় বিষণ্ন। আবার এনলাইটনারদের সঙ্গে মার্কসবাদীদের পার্থক্য হল, প্রথম পক্ষ সমাজ বিকাশের বর্তমান ধারায় বিশ্বাসী হলেও এর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও

পুনর্বিকাশ মানতে ও বুঝতে অক্ষম। কিন্তু মার্কসবাদীরা মনে করেন, এই বুর্জোয়া সমাজের গর্ভ থেকেই ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিকতার নিয়মেই শ্রমিকশ্রেণীর নতুন দুনিয়া নতুন ভবিষ্যত গড়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ যে সোভিয়েত রাশিয়া যাওয়ার আগে, গান্ধীবাদী পশ্চাৎপদতা, উগ্র–জাতীয়তাবাদ ও পাণ্ডাশাসিত সমাজের বিরুদ্ধে ভাবাদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন, তা এই **পাশ্চাত্য এনলাইটনারদের যুক্তিনির্ভর জীবন-দর্শনে সমৃদ্ধ রামমোহন-বিদ্যাসাগরের** উত্তরসাধনার জোরেই ঘটেছিল। মার্কস কথিত 'প্রাচ্য স্বৈরাচারের' কথা ভুলে গিয়ে কুটির শিল্প ও কৃষি ভিত্তিক প্রাচীন গ্রামসমাজে ফিরে যাওয়া, যত রাজ্যের জাতের বেড়া, আচারের বেড়াকেই 'সনাতন জাতীয় ঐতিহ্য' বলে আঁকড়ে থাকা যে এক ধরনের মারাত্মক বিচ্ছিন্নতা, গ্রাম্য সঙ্কীর্ণতা ও কুপমণ্ডুক আত্মম্ভরিতা, রবীন্দ্রনাথ 'বাতায়নিকের পত্র,' 'কালান্তর,' স্বাধিকারপ্রমত্তঃ রাশিয়ার চিঠি, গোরা ও অচলায়তন প্রভৃতি নানা লেখায় বার বার তা জোরের সঙ্গে বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ যে গ্রাম্য বা মানসিক সঙ্কীর্ণতাকে 'রুগ্ন আত্মদম্ভ' বলেছেন, মার্কস তাঁর ১৮৫৩ সালে লেখা 'ভারতে ইংরাজ শাসন' প্রবন্ধে তাকেই 'বর্বরসুলভ অহমিকা' আখ্যা দিয়েছেন।

বিজ্ঞানের কাজ মানুষকে সকল রকম ব্যবহারিক ও মানসিক বন্ধনদশা থেকে মুক্তি দেওয়া ; জীবন ও সমাজটাকে বদলে দেওয়া। ধর্মের সঙ্গে এখানেই তার বিরোধ। শাস্ত্রধর্ম চায় বেঁধে রাখতে, আচারপ্রথা ও পুরোহিততন্ত্রের আধিপত্যে অনড় রাখতে। বর্ণপ্রথা ও আচারসর্বস্ব ধর্মসংস্কার যে কী পরিমাণে পরিবর্তন-বিরোধী ও ভয়ংকর অভিশাপ সে সম্পর্কে এল, কে, এলমহার্স্টকে লেখা (১৯২৪ পত্রে রবীন্দ্রনাথ বলছেন : এটা শুধু আমাদের পরাজয় ও অবক্ষয়ের ভাবকে বাড়িয়েছে। বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত রাশিয়া থেকে ফিরে এসে ১৯৩৭ সালে তাঁকেই লিখলেন : আমাদের জনগণের পক্ষে অন্য সব কিছুর চেয়ে আগে দরকার প্রকৃত বৈজ্ঞানিক শিক্ষা, যা তাদের পরীক্ষা নিরীক্ষায় উৎসাহিত করবে এবং মানসিক উৎসাহে তাজা করে তুলবে, জাতি হিসাবে যার অভাব রয়েছে দারুণ। উল্লেখযোগ্য, যে ব্রিটিশ শাসক এদেশের মধ্যযুগীয় ধর্মসংস্কার ও সাম্প্রদায়িক ভাগাভাগিকে নানাভাবে বজায় রেখেই কৃষিকলোনির লুঠ চালিয়েছে, অপেক্ষাকৃত উন্নত ধনতান্ত্রিক পর্বে এসে, ১৯৩১ সালে এমনকি 'সাইমন কমিশন'ও এ দেশের নিরক্ষরতা ও পশ্চাৎপদতার প্রশ্নে 'প্রচুর অসুবিধা'র (ধর্ম ও বর্ণাশ্রম ঘটিত) দোহাই পেড়েছে ; অথচ এরাই আবার সোভিয়েত রাশিয়ার সকল জাতির মধ্যেই সমান

ভাবে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার বিপুল সাফল্য ও বৈষয়িক জীবনের আমূল রূপান্তর দেখে, ওরা 'অধার্মিক' বলে প্রচার করেছে; অর্থাৎ সংকটের মুখে পড়ে বুর্জোয়াদের ভণ্ডামী ও প্রতারণা দিনে দিনে বেড়েছে; তারা ক্রমেই গলা চড়িয়ে বলেছে, শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির 'পবিত্র তীর্থে' রাজনীতির কোন স্থান নেই। এ প্রসঙ্গে লেনিন বলেছেন: 'অরাজনৈতিক' বা 'রাজনীতিহীন শিক্ষা-সংস্কৃতি বুর্জোয়া ভণ্ডামির অংশমাত্র; যে জনগণের ৯৯ শতাংশকে গীর্জা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রভৃতির শাসনে অবনমিত ও হেয় করে রাখা হয়েছে সেই জনগণের উপর বাগ্‌বাজি ছাড়া কিছু নয়। আসলে সমস্ত বুর্জোয়া শাসনাধীন দেশে জনগণকে এইভাবে প্রতারণা করা হয়।"

সুদীর্ঘকালের কৃষিকর্মে নানা অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ কৃষক জনগণের দেশে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আর্যভট্ট, রামানুজ, জগদীশচন্দ্র, রমণ, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্র বসু, ও হোমি ভাবা প্রমুখ মনীষীর আবির্ভাবের দেশে, পার্লামেণ্টে জাতীয় বিজ্ঞান-নীতির ঐতিহাসিক প্রস্তাব হওয়া সত্ত্বেও, এবং এরপর থেকে বহিরাঙ্গিক নানা আয়োজন ও বিজ্ঞান গবেষণার বাজেট উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও আজ কেন উন্নততর গমের জন্য মেক্সিকোর কাছে এবং ভাল জাতের ধানের জন্য ম্যানিলার পাঠশালায় যেতে হয়? তাছাড়া আণবিক গবেষণায় বহু আগেই কাজ সুরু করে, কেন প্রতিবেশী চীন ও জাপানের তুলনায় বিজ্ঞান ও কারিগরী যন্ত্রশিল্পে ভারত আজ এত পিছিয়ে? সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার কোন্ দোষের জন্য বিজ্ঞানীদের সৃজনশীলতা, তার প্রয়োগ-সংগঠন ও জনগণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাচেতনার বিকাশ বাধা পাচ্ছে, সেটা অবশ্যই খতিয়ে দেখা দরকার। আসলে অনুসঙ্গী সংস্কৃতি ছাড়া বিজ্ঞান ও কারিগরি শিল্প তার স্বাভাবিক গণচরিত্রে ফলপ্রসূ হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় সামন্ত-সংস্কারবর্জিত উন্নত ধরণের বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রয়োজন। সমাজে বর্ণাশ্রম, হরিজন প্রথা ও ধর্মীয় কু-সংস্কারের পশ্চাৎপদতাও থাকবে, শিক্ষার কেন্দ্রীভবন, প্যাকেজ-ডিল ও কেতাবী তত্ত্বের বিমূর্ততাও থাকবে, আবার বিজ্ঞান তার সার্বজনীন সামাজিক ভূমিকায় সফল হবে তা কখনই হতে পারে না।

যে সময়ে আমাদের দেশে জল-বসন্ত হলে শীতলার ফুল ছোঁয়ান হচ্ছে, সাপে কামড়ালে ওঝার ঝাড়-ফুঁক হচ্ছে, বাবার থানের উপর বা পাশ দিয়ে রেল-লাইন গেলে গাঁ-শুদ্ধ লোক, এমনকি শহরের **'ধর্ম যাজকদের তক্‌মা-আঁটা স্নাতক খানসামা'রাও** মার-মার করে উঠছে, সেই সময়ে জাপান মেজি রেস্টোরেসনের

পর (১৮৬৮) গোটা উনিশ শতক ধরেই শিক্ষা-সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের প্রায়োগিক কর্মকাণ্ডে অতিক্রুত গোটা সমাজকেই নতুন চেহারায় গড়ে নিয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদ কম থাকা সত্ত্বেও মানবিক সম্পদকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে সে গোড়াতেই সার্বজনীন সাধারণ শিক্ষা ও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করে নিয়েছিল। ইউরোপের উন্নত দেশগুলিতে ছাত্র পাঠিয়ে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার তথ্য ও সূত্র আনিয়ে সেই সঙ্গে ঐ সব দেশ থেকে বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার, চিকিৎসক আনিয়ে নিজের দেশে বিরাট শিক্ষক-ফ্রন্ট তৈরী করে নিয়েছিল। এছাড়া ভাষার বাধা কাটানোর জন্য ব্যাপক অনুবাদ-পরিকল্পনা করে দ্রুত পাঠ্য বই রচনা হয়েছিল, ইংরাজী, জার্মানী ও ফরাসী শব্দের পরিভাষা-অভিধান রচনার মাধ্যমে **পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনের নয়াসম্পদ** বিপুল-ভাবে আত্মস্থ হয়েছিল। আজ তাই জাপানে উঁচু সারির শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলির মত বুর্জোয়া ধনতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে।

মহান অক্টোবর বিপ্লবের পর সোভিয়েত রাশিয়ায় শুরু হয়েছিল বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ-বদলের বিরাট কর্মকাণ্ড; ১৯১৯ সালে লেনিন বললেন: আট থেকে পঞ্চাশ বছরের সমস্ত মানুষকে পড়তে-লিখতে জানতে হবে; লাল ফৌজের কর্মীরা বিরাট শিক্ষকবাহিনীতে রূপান্তরিত হবে। অতঃপর জার আমলের প্রাসাদ, হলঘর ও চার্চগুলি ছোট বড় নানা ধরণের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পুনর্গঠিত হয়েছে। গৃহযুদ্ধের সময়ে বিপ্লবীদের একহাতে বন্দুক, আর-একদিকে এমনও দেখা গেছে, ফৌজী মার্চের সময় সামনের লোকের পিঠে বিজ্ঞপ্তি সেঁটে দিয়ে পিছনের জনকে পড়তে শেখানো হয়েছে; কোন কোন সময়ে পেন্সিলের অভাব, লাঠির ডগা পুড়িয়ে মেটানো হয়েছে। এইভাবে বিপ্লবের দশ বছরের মধ্যে গোটা দেশের নিরক্ষরতার সমস্যা ঘোচানো হয়েছে। শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে লেলিন যে ভিত গড়ে দিয়ে গেলেন, ১৯২৪ সালের পর থেকে স্তালিন তাকে বিরাট মহীরূহে পরিণত করেছেন। ১৯২৯ সালে তাঁর নেতৃত্বে ঐতিহাসিক বিজ্ঞান-সেমিনার সারা দুনিয়ার মানুষের সামনে রাশিয়ার বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক সাফল্য সম্পর্কে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। ১৯৩০ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী হ্লোদার এবং ভারতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েত রাশিয়া দেখে এসে যে সব স্মৃতিকথা লিখেছেন, তাতে তখনকার **সমাজতন্ত্র-বিরোধী শিবিরের থোঁতা মুখ ভোঁতা** হয়েছে। অতঃপর ১৯৫৭ সালে সোভিয়েত 'স্পুৎনিক' বিজ্ঞান ও কারিগরি শিল্পের দুনিয়ায় আরও একবার বিপ্লব ঘটিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী দেশগুলির টনক নড়িয়ে দেয়। উল্লেখযোগ্য,

এর আগের বছর হুমায়ুন কবীর ভারত সরকারের পক্ষে রাশিয়ায় গিয়ে তাদের সবকিছু দেখেশুনে বিস্মিত হওয়া সত্ত্বেও সেখানে 'বিশেষীকরণ' ও 'বুদ্ধির পরীক্ষা' নেই বলে আক্ষেপ করেছেন। একই সময়ে নিউইয়র্ক টাইম্‌স (৩রা জুন, ১৯৫৬) বলেছে: হাই এনার্জি পদার্থ বিজ্ঞানে সোভিয়েত রাশিয়া এত এগিয়ে যে, আমেরিকাকে সেখানে পৌঁছতে আরও দশ বছর লাগবে।

চীনও ১৯৪৯ সালের বিপ্লবের পর পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার বিরাট ফাঁক অতি অল্প সময়ে ভরিয়ে নিয়েছে। তারা আমাদের মত মনীষা সৃষ্টি করেই আত্মপ্রসাদ লাভ করেনি; সমগ্র জনগণকে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিল্পের কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত করার জন্য প্রথমেই **সর্বসাধারণের সাধারণ শিক্ষার কর্মসূচী নিয়েছে** এবং চীনা ভাষার বর্ণমালা সহজতর করে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে আবশ্যিক করেছে। তারা দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপযোগী করে জাপান ও রাশিয়ার কারিগরি বিজ্ঞানকে গ্রহণ করে বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সকল সমস্যার সমাধানে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। ১৯৬৬ সালে কার্ট মেণ্ডেলেশন চীন ভ্রমণান্তে লিখেছেন: "প্রায় অর্ধ শতাব্দীর ক্ষুধা, যুদ্ধ ও নিরাপত্তার অভাব পার হয়ে তাদের সর্বজনিক উদ্যম এখন কখনই বলছে না যে, দিনকতক যাক; কোটি কোটি মানুষ বিপ্লবের পর থেকেই নতুন কারিগরি বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে অংশ নেওয়ার জন্য আগ্রহী হয়ে এগিয়ে এসেছে; পুরান ধরণের কারখানাগুলিকে বৃহৎ পরিকল্পনায় আধুনিক মডেলে গড়ার সুযোগ নিয়েছে এবং তাতে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছে।" চীনের ইয়াংশি নদীর সেতু নির্মাণ যে উদ্যম ও গণভূমিকায় সম্ভব হয়েছে, সেই রকম দায়িত্ব ও পরিকল্পনা নিয়েই নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও সেইসঙ্গে কৃষক ও শ্রমিক জনসাধারণকে বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস শেখানোর কাজ প্রায় পূর্ণ সাফল্যের স্তরে চলে এসেছে।

আজ চীনে জনগণের প্রধানতম সম্পদ হল বিজ্ঞান, যা সচেতন ও সংগঠিত ভাবে আত্মস্থ হচ্ছে এবং জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধানে প্রযুক্ত হয়ে চলেছে। **উৎপাদনের উপায়গুলি যখন জনগণের হাতে** চলে আসে তখন, এইভাবেই, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা শত ফুলে প্রস্ফুটিত হয়।

আমাদের দেশে বর্ণভেদ ও হরিজন প্রথা এবং ব্রিটিশ উপনিবেশতন্ত্র বা মিশ্র অর্থব্যবস্থার ভিত, আজও বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশে বাধা হয়ে রয়েছে। যে পরিমাণে বুর্জোয়া ধনতন্ত্রের বিকাশ অপূর্ণ ও অপুষ্ট থেকেছে, সেই পরিমাণেই গণতান্ত্রিক জীবনপদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর গতি শ্লথ ও দুর্বল থেকেছে

এবং সম্ভবতঃ তার চেয়েও বেশী ধীর ও সঙ্কীর্ণ থেকেছে বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাচেতনার বিকাশ। যে সমাজে বর্ণপ্রথা, অবতারবাদ, কর্মফল, জাত-পাত ইত্যাদি বটবৃক্ষের শিকড়ের মত অতলস্পর্শী, সেই সমাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা কখনই সার্বজনীন চরিত্রে সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটাতে পারে না। তাছাড়া এটা উপর থেকে চালিয়ে দিলেই হয় না; ভিতরের ব্যবস্থার পালাবদলের সঙ্গে বা তারই আনুষঙ্গিক রসদের প্রয়োজনে সেই পরিবর্তন ঘটাতে হয়।

প্রাচীন গ্রীস ও রোমের দাস ও দাস-মালিকদের মত, আমেরিকার নিগ্রো-সমস্যার মত, আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের মত আমাদের দেশে সেই বৈদিক আর্যদের সময় থেকে, মনু সংহিতার জাঁতায় পিষে সমাজকে নানা খোপে ভাগ করে রাখা হয়েছে; এ সবই হল, নানা রকমের ধর্ম-সম্প্রদায়, জাত-পাত, শাস্ত্র-প্রথা ইত্যাদি। এরই জন্য অর্জুন প্রমুখ পাণ্ডবদের সঙ্গে কর্ণের থাকা সম্ভব হয়নি, সীতাকে পাতালে যেতে হয়েছে, শাস্ত্রের বচন শূদ্ররা শুনে ফেললে কানে গরম সীসা ঢেলে দেওয়া হোত, অস্ত্র চালনায় উন্নত টেকনিক শিখে ফেলেছিল বলে দ্রোণাচার্যের কাছে ব্যাধের ছেলে একলব্যকে তার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণা দিতে হয়েছিল।

আজও বর্ণাশ্রম ও হরিজন প্রথা আমাদের গ্রাম-সমাজের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে পরিচালনা করছে। জমিদার মহাজনদের দল নিম্নবর্ণের ধর্ম-শাস্ত্রীয় বিচ্যুতির অজুহাতে বা অজুহাত বানিয়ে তাদের জমি ও ধান কেড়ে নিচ্ছে, ঘর-বাড়ী পুড়িয়ে দিচ্ছে, যথেচ্ছ খুন ও নারীধর্ষণ চালিয়ে 'ধর্মরক্ষা' করছে। এই কায়েমী স্বার্থের উচ্চবর্ণদের পূর্বপুরুষেরাই গ্রামে বর্ণ-পরিচয় ঢুকতে দেয়নি, রেল-লাইন বসাতে বাধা দিয়েছে। এইভাবে যুগ যুগ ধরে কৌলিক ও ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের কারণে সমাজের অর্থ-সম্পদ ও শিক্ষা-সংস্কৃতির একচেটিয়া অধিকার একাংশের মধ্যে ধর্মের নামে জমা হয়েছে, আর বৃহত্তর মেহনতকারী জনগণকে শূদ্র, হরিজন এইসব মার্কা দিয়ে শোষণ ও নির্যাতন চালানো হচ্ছে। শূদ্রদের মধ্যেও 'সৎশূদ্র' এবং সাধারণ শূদ্র ভেদ করা হয়েছে, হিন্দু-মুসলমান তো আছেই।

যে শ্রমজীবী মানুষ বেতার, টেলিভিশন ও মুদ্রাযন্ত্রের কারখানায় ঘাম ঝরিয়ে ও আধপেট খেয়ে 'বিজ্ঞানের বিস্ময়' সৃষ্টি করছেন, সেই শ্রমিকশ্রেণী আজও মে-দিবস, নভেম্বর বিপ্লব দিবস, রবীন্দ্র-নজরুল ও সুকান্ত দিবসে বেতার, টেলিভিশন কিংবা বৃহৎ পুঁজির সংবাদপত্রে ঠাঁই পায় না; ঐ সব প্রচারমাধ্যমে সেইসব অনুষ্ঠান ও ঘটনা সোচ্চারে সম্বর্ধিত হচ্ছে, যেগুলি শ্রমজীবী মানুষকে জীবন ও বিজ্ঞানের

উত্তরাধিকার থেকে সরিয়ে রাখতে প্রয়াসী, সংগ্রামবিমুখ নিষ্ক্রিয় ভাববাদী ধ্যান-ধারণা বিলানোয় সক্রিয়। 'আকাশবাণী'তে 'চাষী ভাইদের জন্য' অনুষ্ঠানে কীটনাশক ওষুধ ও রাসায়নিক সার ব্যবহার এবং পাম্প-ট্রাক্টর চালানো শেখানো হয়। এই সব চাষীভাই কারা? নিশ্চয়ই মাত্র পাঁচ শতাংশ বৃহৎ ভুস্বামী ও মহাজন। সত্তর শতাংশ ক্ষেতমজুর ও ভাগচাষীদের তো জমিই নাই এবং বিজ্ঞান ও কারিগরি শিল্পের প্রশ্ন তো অথৈ জলে। সামান্য প্রাথমিক শিক্ষাটুকু থেকে পর্যন্ত বঞ্চিত। পেটের জ্বালায় বাপ-মায়ের সঙ্গে জমিদার জোতদারের জমিতে মুনিশ খাটতে যাবে, কাঠ কুড়োবে, ঘুঁটে দেবে? না, বিদ্যালয়ে গিয়ে 'লেখাপড়া করে যে গাড়ী-ঘোড়া চড়ে সে' ছড়া মুখস্থ করবে? এরাই যদি উচ্চবর্ণদের সংরক্ষিত কুয়া থেকে তৃষ্ণার জল তুলে ফেলে, তবে এদের রক্তে মাটি ভেসে যায় অথবা পাড়া-কে-পাড়া পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

বর্তমান স্তরে এ কথা ঠিক, শনি-মনসা, মঙ্গলচণ্ডী, মন্ত্রতন্ত্র ও তুকতাকের সমাজে, বর্ণভেদে, সম্প্রদায়ভেদে শতছিন্ন সমাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রবেশ সহজ নয়। কিন্তু প্রশ্নটা কি শুধুই জাত-পাত ও হরিজন প্রথা? কেবল জমি দিলেই, চাষি স্বনির্ভর হয়ে ফসল ঘরে তুলতে পারে না; মহাজনের কাছে বাঁধা পড়ে যায়। জমির সঙ্গে উৎপাদনের উপায়গুলিও সরবরাহ করতে হয় এবং তা প্রয়োগের উপযুক্ত জ্ঞানও দিতে হয়। বর্তমান অবস্থায় চাষীদের জন্য হাজার হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলে দিলেই কি ওরা সব ছুটে আসতে পারবে? অবশ্য সেই সঙ্গে টিফিন ও বইখাতা দিলে খানিকটা এগোবে; কিন্তু শেষবিচারে **আমূল ভূমি সংস্কারের প্রশ্ন**, অন্নবস্ত্রের নিরাপত্তার প্রশ্ন না এসে যায় না।

কাজেই সমস্যাটা অর্থনৈতিক। দেখা গেছে, কল-কারখানায় যতটা জাত-পাত গেছে, গ্রামের সমাজে আদৌ ততটা যেতে পারেনি; তার মানেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শহরাঞ্চলের কল-কারখানায় যতটা ঢুকেছে, গ্রামের কৃষি-অর্থনীতির মধ্যে তার সিকিমাত্রও যায়নি। তাছাড়া মজুরী-প্রথার সীমাবদ্ধতার মধ্যেও যতটা নিরাপত্তা শ্রমিকরা পেয়েছে, গ্রামের ভূমিহীন ক্ষেত-মজুর ও ভাগচাষীদের সেটাও জোটা সম্ভব হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেই ক্ষেত-মজুরদের রেট আড়াই থেকে আট টাকা করলে প্রতিক্রিয়ার মৌচাকে ঢিল পড়ে।

যাই হোক, বর্ণাশ্রম ও হরিজন প্রথার অভিশাপ যে অর্থনৈতিক শোষণ-পীড়নের ব্যবস্থাটা ঘোচানোর সঙ্গে ক্রমে ক্রমে সরে যায়, তা চীন, রাশিয়া প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির দৃষ্টান্তে তো দেখানো যায়ই, আমাদের দেশের প্রাচীন

ইতিহাসেও তার কিছুটা নজির আছে; অবশ্য যদিও তা সীমাবদ্ধ, বিচ্ছিন্ন ও সাময়িক। ডঃ নৃপেন্দ্র কুমার দত্ত তাঁর 'Origin and Growth of Cast in India' গ্রন্থের এক যায়গায় বলেছেন: "বাংলার চাষী কৈবর্তদের উন্নয়ন আন্দোলন রাণী রাসমনির কৈবর্ত জমিদার পরিবারের নিকট খুবই ঋণী.......এ প্রসঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কাশিমবাজারের জমিদার পরিবার তিলি জাতের সামাজিক মর্যাদা উন্নয়নে যা করেছে এবং অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বৈদ্য জাতের ক্ষেত্রে রাজা রাজবল্লভ যে ভূমিকা নিয়েছিলেন তা স্মরণযোগ্য (পৃঃ ১৩৭)। দেখা যাচ্ছে, **অর্থের জোরেই প্রজাপতি ব্রহ্মাসৃষ্ট বিধি'** বদলানোও যায়, আবার অর্থ-নৈতিক শ্রেণীস্বার্থে তা ক্ষুধার্ত ও শোষিত জনগণের কাঁধে চাপিয়েও রাখা যায়।

গ্রামসমাজে তো এই রকম সব 'ভিতরের ল্যাজ' (রবীন্দ্রনাথ) গজিয়েই রয়েছে; অতঃপর শহরাঞ্চলের শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবী অংশ থেকেও যুক্তি, মানবিক মূল্যবোধ ও বস্তুবাদী চিন্তাচেতনা খতম করতে, সাম্রাজ্যবাদীদের মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানীগুলোর সঙ্গে যেমন ব্রথেল, নাইট ক্লাব, ক্যাবারে ও যৌনসর্বস্ব আনন্দমেলার হাট বসছে, তেমনি **সাঁইবাবা ও ভেক-বিজ্ঞানের** ম্যাজিকেও বাজার সরগরম্। ওরা নিজেদের দেশে এখন পচাগলা মনোপলি পুঁজির আধিপত্য বাঁচাতে বা সমাজতন্ত্র ঠেকাতে ঐ সমস্ত পচাই দেদার ঢেলে দিয়েছে, আর আমাদের দেশে বাজার রাখতে সেগুলো রপ্তানী করছে; আমাদের বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণীর এতে সুবিধাই হয়েছে; অন্নবস্ত্র ও শিক্ষার বিকল্প হিসাবে কাজ করছে; অর্ধভুক্ত ও বঞ্চিত মানুষকে জীবন ও সংগ্রাম থেকে সরিয়ে রাখার নেশায় ডুবিয়ে দেওয়া যাচ্ছে।

সুফিবাদ বা সাঁইবাদ মূলতঃ ভারতের উর্দুভাষী মুসলমান লোকসমাজের সার্বজনীন মানবিক সংস্কৃতির ঐতিহ্য। তাকে যাদু, অবতারবাদ ইত্যাদিতে বিকৃত করার জন্য দেশ-বিদেশের বুর্জোয়ারা প্রচারের ঢাক পেটাচ্ছে। যাদুর যুগ থেকে মানুষ একদিন শিল্প-বিজ্ঞান ও বুদ্ধি-চিন্তার যুগে এসেছিল, প্রকৃতিকে গোলামে পরিণত করেছিল। আজ অবক্ষয়ী সাম্রাজ্যবাদ ও অপূর্ণ পুঁজিবাদ ধ্বংসের মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে যাদুকরী, উদ্ভট ও অলীক সমস্ত কারসাজিতে মানুষকে আচ্ছন্ন করার উদ্যোগ নিয়েছে।

হায়দারাবাদের শির্দি সাঁই থেকে অবতারত্বের উত্তরাধিকারে সত্য সাঁইবাবার আবির্ভাব। সমুদ্র থেকে যেমন নদী, তেমন শ্রীভগবান থেকে এইসব অবতার। নদীরও যেমন শেষ নেই, তেমনি এদেরও—এই রকম অতি-লৌকিক বিশ্বাসে

দেশ-বিদেশের তাবড় সব পণ্ডিত ও বিজ্ঞানী আসরে নেমে লম্বা লম্বা অভিজ্ঞান পত্র দিয়ে চলেছেন; আর টেলিভিশন ও বৃহৎ পুঁজির পত্র-পত্রিকাগুলি সমানে তার বিবরণ ও বিজ্ঞাপন দিয়ে যাচ্ছে। বাঙ্গালোরের দামী হোটেলগুলি এখন পুত্তপর্থির সাঁইবাবার আলোচনায় সরগরম্। সেখানে এখন ইংলণ্ড, আমেরিকা ও পশ্চিম জার্মাণীর একচেটিয়া পুঁজির বুদ্ধিজীবী ক্রীতদাসরা ভিড় করেছেন। তাঁরা সাঁইবাবার অলৌকিক কাহিনী নিয়ে বড় বড় বই ও সংবাদ-সাহিত্য লিখে দেশ-বিদেশের চাঁই-চাঁই প্রকাশকদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। এতে অঢেল টাকাও আসছে, আর 'সামাজিক' কাজও চলছে। কয়েক মাস আগে বাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ নরসিংহানিয়ার নেতৃত্বে জনা কয়েক বিজ্ঞানী সাঁইবাবাকে চ্যালেঞ্জ জানালে, সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের ভাড়াটিয়া লেখক গ্রীন সাহেব দালালি করে বললেন: 'তাঁকে কেমন করে বোঝা যাবে? তিনি তো সাধারণ মনের স্তরে থাকেন না। একটা অন্য ডাইমেনসনে কাজ করেন।' দূত এসে সাঁই অবতারকে খবর দিলে তিনিও জানিয়ে দিলেন: এ্যাবাভ সেন্‌সকো বিচার বিলো সেন্‌স-ওয়ালা ক্যায়সে কর্ সকতা!'

এ সবের ঘাঁটি এখন আমেরিকা। সেখানকার ইউরি গেলার নাকি মন্ত্রতন্ত্রে তাবড় বিজ্ঞানীদেরও তাক লাগাচ্ছেন। ভেক-বিজ্ঞানের প্রতি এই রকম অন্ধ টান এখন এইসব সমাজেও জোর চালু হয়েছে। বিজ্ঞান এখন জনগণের মধ্যে নেই। সে এখন মনোপলি পুঁজির পাহারা লাগাতে মুনাফা কামাচ্ছে, আর জাতীয় মুক্তি-যুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়তে মারণাস্ত্রের ফরমূলা বানাচ্ছে।

আর গণপ্রজাতন্ত্রী চীন? বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার শক্তিকে সর্বজনীন চরিত্রে রূপান্তরিত করে নিরক্ষরতা, বেকারত্ব ও বন্যার বিরুদ্ধে লড়াই প্রায় সাঙ্গ করে, এখন রুক্ষ পাথুরে অঞ্চলে কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিপাত সৃষ্টি করছে। পাহাড়ী টিলায় দাঁড়িয়ে নাতি বলছে: ঐ দেখো দাদু, কত বেলুন উড়ল আকাশে! মেঘের পাহাড় হচ্ছে! বৃষ্টি নামলো বলে! দেখো-দেখো—বাবা ট্রাক্টরে স্টার্ট দিচ্ছে!

প্রগতির বাধা ও উত্তরণ প্রসঙ্গে

'কি এসে যায় আমি জন্মেছিলাম কিনা? আমি বেঁচে আছি, মরে আছি কিংবা মরছি কিনা? আমি ভেসে যাব যেমন করে এসেছি। জেনে কি দরকার আমি কে? কোথায় যাচ্ছি? অথবা আদৌ কোথাও যাচ্ছি কিনা?'—এ কথা বলছে স্যামুয়েল বেকেটের নায়ক। সাম্রাজ্যবাদীদের একচেটিয়া পুঁজির সঙ্গে এসে এই রকম নায়কদের জীবাণুবাও আমাদের দেশে বংশবৃদ্ধি করছে।

কেন এ রকম হয়, একটু তলিয়ে দেখা দরকার।

গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই বিশ্ব-পুঁজিবাদের মরণদশা সুরু হয়েছে। ক্রমে তা একচেটিয়া মালিকানার কব্জায় বাঁধা পড়েছে, ক্ষয়ে যাচ্ছে ও ভেঙে পড়ছে। এখন উৎপাদনের উপায় ও শক্তিগুলিকে কব্জায় রাখা নিয়ে, বাজারের ভাগাভাগি নিয়ে এইসব একচেটিয়া বৃহৎ ট্রাস্টগুলির মধ্যে সূক্ষ্ম ও স্থূলভাবে মারামারি বেড়েই চলেছে।

বুর্জোয়া উন্মেষযুগে মানুষ বিজ্ঞান ও কারিগরি শিল্পের শক্তি আরও উন্নতভাবে করায়ত্ত করেছিল, ক্রমে তার **মনন ও মেহনত দিয়ে প্রযুক্তি বিদ্যা ও বিজ্ঞানের** জয়-জয়কার ঘটিয়েছে। আজ সেই মানুষ মুষ্টিমেয় বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিপতিদের গোলামে পরিণত হয়েছে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা আজ মুনাফার সেবা করছে, জনগণের নয়; কারণ উৎপাদনের বর্ধিত শক্তি ও উপায়গুলি জনগণের হাতে আসেনি; তাদের জীবনকে বদলে দেওয়ার কাজে লাগেনি; কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। এই স্তরে দ্বন্দ্বটাও তীব্র হয়েছে।

আসলে এটা পচনশীল একচেটিয়া পুঁজিবাদের ক্ষয়ের লক্ষণ। একদিকে বিজ্ঞান ও টেকনলজির শক্তি বা উৎপাদনীশক্তি বেড়ে যাওয়ার দরুণ গোটা উৎপাদন ব্যবস্থার সামাজিকীকরণ ঘটেছে এবং মানুষের দারিদ্র্য ও দাসত্ব ঘুচে যাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে গেছে; অপরদিকে দেশে দেশে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বিরুদ্ধে এবং নিজেদের মধ্যে বাজারদখল-এর যুদ্ধে অবিরাম নিযুক্ত থাকার দরুণ ক্ষয় ও উদ্বেগ তীব্র হওয়ার ফলে, উন্নত ধরণের উৎপাদনী শক্তি ও কাঁচামাল ব্যাপক ও সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগানোর অক্ষমতার ফলে এবং এই কারণেই

বেকারত্ব, ছাঁটাই ও মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন ব্যাপকতর ও তীব্র হওয়ার ফলে এই **পরজীবী ও পীড়নমূলক পশুশক্তির ক্ষয় ও পতন** অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির ও উৎপাদন পদ্ধতির ভূমিকা সম্পর্কে লেনিন বলছেন: **"Production becomes social, but appropriation remains private. The social means of production remain the private property of a few and yoke imposed by a few monspolies on the rest of the population becomes a hundred times heavier, more burdensome and intolerable."** এই পর্বে উদ্বৃত্ত পুঁজি ঘরে খাটে না; সেগুলি যায় অনুন্নত পশ্চাৎপদ দেশগুলিতে। সেখানে পুঁজির ঘাটতি বলে জমির দাম, মজুরীর হার খুবই কম থাকে এবং কাঁচামাল সস্তায় পাওয়া যায়, যার দরুণ নিজের ঘরের চেয়ে দশ-বিশগুণ বেশী মুনাফা লোটা যায়। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় এই রকম লুঠ ও হামলা ভয়ংকর রকম বেড়ে চলেছে।

পুঁজিবাদী সমাজের বিকাশ ও গোটা অর্থব্যবস্থার বিরোধমূলক চরিত্রের ব্যাখ্যায় কালিনিন তাঁর 'অন কমিউনিষ্ট এডুকেশন' গ্রন্থে বলেছেন: 'একদিকে যন্ত্রপাতির উন্নতি, অস্ত্রের জন্য প্রতিযোগিতা ইত্যাদি পরিস্থিতিতে নিজেদের মধ্যে মারামারি এবং অপরদিকে শিক্ষা-সংস্কৃতির সুযোগ লাভের জন্য শ্রমিক কৃষকদের সংগ্রাম বুর্জোয়াশ্রেণীকে বাধ্য করে জনগণকে অন্ততঃ কিছুটা পর্যন্ত জ্ঞান দিতে; আবার আগ্রাসী যুদ্ধের স্বার্থে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে সাহস, দৃঢ়তা ও অন্যান্য গুণাবলীর বিকাশ ঘটাতেও বাধ্য হয়। যদিও তা বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে বিপজ্জনক ...... **বুর্জোয়া সমাজে উল্লিখিত দ্বন্দ্বগুলি** থাকা সত্ত্বেও শাসকশ্রেণী সমস্ত প্রকারে জনগণের উপর আধিপত্য চালানোর হাস্যকর প্রয়াস চালায়, খোলা-খুলি দমনমূলক উপায় থেকে সুরু করে ধূর্ত প্রতারণার দিকে এগিয়ে যায়, বুর্জোয়া সমাজে মেহনতি মানুষকে তার জন্মের দিন থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত শাসকশ্রেণীর সুবিধা হয় এমন সব চিন্তা, ধ্যান-ধারণা ও রীতিনীতির নিরবচ্ছিন্ন প্রভাবের মধ্যে রাখা হয় এবং তা করা হয় অসংখ্য উপায়ে, সময়-সময় সাধারণ ভাবে দুর্বোধ্য এমন সব পদ্ধতিতে। গীর্জা, বিদ্যালয়, শিল্পকলা, সিনেমা, থিয়েটার ও বিভিন্ন প্রকারের সংগঠন—এ সমস্তই বুর্জোয়াশ্রেণীর বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর আদর্শ, রীতিনীতি ইত্যাদি ঢুকিয়ে দেওয়ার অস্ত্র হিসাবে কাজ করে।"

কিন্তু এই অবস্থাটা অনড় অচল হতে পারে না; কারণ পার্থিব সম্পদ ও জীবনবাস্তবতা সম্পর্কে অনীহা প্রভৃতি ভাববাদী দর্শন দিয়ে তো আর পুঁজিবাদী উৎপাদনের উন্নততর বিকাশ সম্ভব নয়। তাই, অন্ততঃ কিছুটা পর্যন্ত বস্তুবাদী ধারণা ও প্রায়োগিক শিক্ষা দিতেই হয়, আবার মানুষকে বিকৃত ও বিভ্রান্ত করতে ভাববাদী উদ্ভট সব দর্শন ও শিক্ষা প্রচারে ব্যস্তও থাকতে হয়। শেষে এই দুয়ের টানাপোড়েনে ও বাস্তবের সঙ্গে বিরোধে অনিবার্যভাবেই **বস্তুবাদী বিপ্লবী মতবাদের** জন্ম ঘটে।

এই শতাব্দীর তিরিশের দশকে প্রকাশিত মার্কিণ লেখক হ্যামণ্ডের 'দি টাউন লেবরার' নামে একটি বইয়ে, প্রায় এক শতাব্দী আগে, ১৮৩১ সালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচারে নিযুক্ত এক সোসাইটি প্রকাশিত যন্ত্রশিল্পের ফলাফল সম্বন্ধীয় একটি পুস্তিকার উল্লেখ করে বলা হয়েছে—"The little book gives a glowing picture of the glories of inventions, of the permanent blessings of machinery, of the triumphant step that man takes in comfort and civilisation every time that he transfers one of the meaner drudgeries of the world's work from human backs to wheels and pistons."

আজ কিন্তু পচনশীল পুঁজিবাদের স্তরে বুর্জোয়াদের সুর বদলে গেছে। তারা আজ যন্ত্র ও প্রযুক্তিবিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতিতে ভয় পেয়ে তার কুফল ও তার সম্পর্কে ঘৃণা প্রচারে মরিয়া হয়ে উঠেছে; এবং তাদের এই প্রচারের শিকার হয়ে সুবিধাভোগী বুদ্ধিজীবী অংশ তাদের দর্শনে ও সাহিত্যে যন্ত্র ও বিজ্ঞানবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী গড়ার কাজে নেমে পড়লেও, সমাজের শ্রমিকশ্রেণী তাঁদের শত দুর্দশা সত্ত্বেও, যন্ত্র ও প্রযুক্তিবিজ্ঞানের মহান শক্তিকে, তাঁদের জীবন বদলানোর কাজে, নতুন ভবিষ্যৎ গড়ার কাজে আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন; শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ ও প্রযুক্তিবিজ্ঞানের বিকাশধারা একই কর্মসূচীতে পরিণত হয়েছে, যেহেতু যন্ত্র ও বিজ্ঞানের শক্তি বা উৎপাদনের উপায়গুলি সেক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর হাতে চলে আসে।

এই সংকট কাটাতে ও শ্রেণী-সংঘাত স্তিমিত করতে, আজকের বুর্জোয়া শিবিরের শাসকশ্রেণীর ভাড়াটিয়া পুরোহিতরা শেষে **বিজ্ঞানের মধ্যেও আধ্যাত্মিক ঈশ্বর**-এর আমদানী করছে, দর্শনের মায়াজাল বানিয়ে 'এ্যান্টি-ম্যাটার তত্ত্ব' প্রচারে নেমে পড়েছে।

বিজ্ঞান আজ একই সঙ্গে মানুষকে তার চেতনার মুক্তির দিকে ঠেলা দিচ্ছে, আবার মনোপলি পুঁজির সেবায় ও বজায় থেকে মানুষকে তার সমাজ-সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করছে। এই দুয়ের মিল করতে না পেরে সে আজ ভয়, হতাশা, উদ্বেগ ও পাপবোধে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে, বিচ্ছিন্ন অহং-এর তাড়নায় নিরালম্ব আত্মহননের শিকার হচ্ছে। বলাবাহুল্য, এ সবই ঘটেছে বুর্জোয়া ও তার সহযোগী পাতি-বুর্জোয়া সুবিধাভোগী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে; মজার কথা, বুর্জোয়া সমাজবিকাশের এক স্তরে ব্যক্তিসত্তার বিরোধমূলক যেসব লক্ষণকে 'নিউরোটিক' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, আজ সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিবাদী স্তরে সেইগুলোকেই 'সুর-রিয়ালিজম্', 'নিউ ওয়েভ', 'চৈতন্যস্রোত' নাম দিয়ে সম্মানিত করা হচ্ছে। এই স্তরের অর্থনৈতিক সংকটের মার খাওয়া মানুষের মধ্যে আরও এক ধরণের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে। পুরান স্তরের অর্থনৈতিক কনসেসন-এ লালিত বুর্জোয়া ধ্যান-ধারণার টান ছিঁড়ে বেরিয়েও আসতে পারছে না, আবার মনোপলি পুঁজির ভয়ংকর চাপও সইতে পারছে না। তাই তার 'আত্মা' কেঁদে উঠছে, শেষে বিজ্ঞান ও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের বিরুদ্ধে রাগে হাত-পা ছুঁড়ছে। সে এখন শেক্সপীয়ার-শেলী-বার্নস ছুঁড়ে ফেলে হাক্সলির 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড' কিংবা অরওয়েলের '১৯৮৪'-এর মত অস্তিত্ববাদী অবক্ষয়ী উপন্যাস ও চলচ্চিত্র গিলে খাচ্ছে। পুরান 'ওথেলো' আর নিচ্ছে না বলে ১৯৭১-৭২ সালে ব্রিটেনের মারমেড থিয়েটারে শেষদৃশ্যে ডেসডিমোনার নগ্ন দৃশ্য (মৃত) দেখানো হচ্ছে। পরিচালকরা বলছেন, ভিক্টোরিও যুগে যা চলতো না, এখন তা জোর চলবে। লণ্ডন-এর এক মঞ্চে ১৯৬৮ থেকে ৭২ পর্যন্ত টানা চার বছর 'হেয়ার' নাটক নগ্নতা ও যৌনতার জন্য বাজার মাতিয়ে চলেছে। কী নিদারুণ প্রতিক্রিয়াশীল হলে তবে মানুষ বিজ্ঞান ও মানবিক মূল্যবোধকে ভয় ও সন্দেহের চোখে দেখে!

যে সময়ে লেনিন তাঁর 'বস্তুবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদী সমালোচনা (১৯০৮) গ্রন্থে **ভাববাদী দর্শনের পুনরাক্রমণের বিরুদ্ধে** আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে বস্তুর সীমা অতিক্রান্তী বিবর্তনের শক্তি প্রসঙ্গে বিজ্ঞানের মহান ভূমিকা তুলে ধরছেন, সেই সময়েই জেম্স জিন্স প্রমুখ ভাববাদী দার্শনিকরা বিজ্ঞান ও বস্তুবাদকে গৌণ করে মনকেই বস্তুজগতের স্রষ্টা বলে ব্যাখ্যা দিতে চাইছেন। এই রকম আধ্যাত্মিক প্রবণতা সম্পর্কে সাবধান করে ১৯২৪ সালে ম্যাকসিম গোর্কিকে লেখা এক চিঠিতে লেনিন বলেছেন: "আদর্শের পোষাকে মন-ভোলানো সাজে সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক ধারণা অপেক্ষা লক্ষ লক্ষ পাপ, নোংরা ধূর্তামি ও হিংসার

সংক্রমণ জনগণ সহজে বুঝতে পারেন এবং শেষোক্তগুলি প্রথমোক্ত অপেক্ষা কম বিপজ্জনক।" উল্লেখযোগ্য, সামন্তবাদী মোটা দাগের ধর্ম-শাস্ত্রীয় আচার-প্রথার পীড়নের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতার পার্থক্য করতেই 'মন-ভোলানো সাজ'-এর প্রশ্নট বিশেষ করে এনেছেন; পচাগলা বুর্জোয়া নোংরামি ও হিংসার সঙ্গে 'সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতার' মাত্রার তফাৎ করলেন মাত্র; ব্যাপারটা ভাল বা মন্দের নয়।

স্মরণ রাখা দরকার, লেনিন রুশ বিপ্লবের সাত বছর পরেও এই রকম ভাববাদী প্রবণতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছেন; অথচ বিপ্লবের পরই তিনি মধ্যযুগীয়তা, ভূমিদাস প্রথা ও সামন্ততন্ত্রের স্তূপীকৃত জঞ্জালপূর্ণ আস্তাবল সাফ করে ছেড়েছেন বলে ঘোষণা করেছিলেন। রুশভূমিতে ঘটনাটা সত্য হলেও, পশ্চিমী দুনিয়ার অবক্ষয়ী দর্শন-সংস্কৃতির প্রভাব বেয়ে, বিশেষ করে লেখক-শিল্পী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ঐ সব ভাববাদী সংস্কার যেতে গিয়েও যাচ্ছে না দেখে, তাঁকে বার বার কলম ধরতে হয়েছিল। এই থেকে আরও একটা তথ্য বেরিয়ে আসছে। সেটা হল, ফরাসী বিপ্লবের চার-পাঁচ বছরের মধ্যে কৃষকের হাতে ব্যক্তিগত ভাবে জমির অধিকার গেলেও, অর্থাৎ কৃষকের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার সরকারীভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও, এবং আরও একশ-দেড়শ বছর আগে ইউরোপের বিভিন্ন অগ্রণী রাষ্ট্রের প্রগতিশীল নেতারা মধ্যযুগীয় বিশেষাধিকার থেকে, কোন এক বা অন্যান্য ধর্মের রাষ্ট্রীয় বিশেষাধিকার থেকে, জাতিগত অসাম্য থেকে সমগ্র মানবজাতিকে মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিলেও, রুশ বিপ্লবের আগে পর্যন্ত মানুষ তা পুরোপুরি পায়নি। তাই সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমী দুনিয়া রুশ দেশে মূর্ত মানুষের পূর্ণ ও প্রকৃত গণতান্ত্রিক অধিকারকে, গোটা বিশ্বের চোখে ধোঁয়াটে ও বিকৃত করার জন্য অবক্ষয়ী সংস্কৃতির চোলাই বা ভাববাদী ধ্যানধারণা লেখক-বুদ্ধিজীবীদের ভাবপ্রবণতার রন্ধ্রপথে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা অবিরাম চালিয়েছে; এবং এই কারণেই বিপ্লবকে রক্ষা ও বিকশিত করতে লেনিনকে, ও পরবর্তীকালে যোশেফ স্তালিনকে সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও আদর্শগত প্রতিরোধ সংগ্রামে সজাগ ও সক্রিয় থাকতে হয়েছে।

আমাদের দেশে গোটা জাতির গণতান্ত্রিক বিকাশের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আরও জটিল, আরও কঠিন। এখানে ঐ সব **সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি ও তার 'সাংস্কৃতিক' পাহারা** তো রীতিমত বাসা বেঁধেছেই, সেইসঙ্গে সুদীর্ঘকালের শিকলের জালে রয়ে গেছে সামন্ত অবশেষের ক্রিমি।

আমরা নিশ্চয়ই ভুলবো না, সারা দেশের ৪৫ শতাংশ কৃষিযোগ্য জমি ভোগ করছে মাত্র ৫ শতাংশ বৃহৎ ভুস্বামী; আর জাতধর্মের মধ্যযুগীয় বেড়াজালে আজও ৮০ শতাংশ কৃষিনির্ভর মানুষ বাঁধা রয়েছে, ৭০ শতাংশ নিরক্ষর মানুষই দারিদ্র্য–সীমার নিচে বাস করতে বাধ্য হয়েছে। এর সঙ্গে বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানী ও টাটা-বিড়লা-সিংহানিয়াদের বেপরোয়া লুঠ তো চলেইছে।

এই ধরণের সমাজে পাম্প ও ট্রাক্টর ঢুকলে, রাসায়নিক সার গেলে প্রকৃতি-নির্ভরতা ও দৈববিশ্বাসের নির্বোধ সান্ত্বনা খানিকটা কাটে এবং কিছু কিছু যে কাটছে না, তাও নয়। বিভিন্ন ধরণের মেশিনে হাত লাগিয়ে ভাষা ও ধর্ম–সম্প্রদায়ের ভেদও কিছু যাচ্ছে, এটাও সত্যি। কিন্তু জমি, পুঁজি ও ঋণের সমস্যা যে থেকেই যাচ্ছে; যার দরুণ দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও শিল্পপ্রসারের বাধা আদৌ সরছে না। তাছাড়া সস্তায় শ্রম পেলে যন্ত্রের কদর ও ব্যবহার বাড়বে কি করে? আসলে **জমি পাওয়া ও যন্ত্রের ব্যবহার অবাধ না হলে** সমাজের গণতান্ত্রিক বিকাশ সম্ভব নয়। এ লড়াই চলেছে এবং ক্রমেই তার প্রসার ও অগ্রগতি ঘটছে।

কিন্তু আরও কিছু বাধার কথা মাথায় রাখা দরকার। সেটা ঘটছে উপরতলায়, বিশেষ করে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে; জাতিদম্ভ, ভাষার হামলা, সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিদ্বেষ, ধর্মীয় পুনরুজ্জীবন, ইতিহাসের বিকৃতি, বিচ্ছিন্নতা, অবক্ষয় ও বৈষম্যের 'সাংস্কৃতিক' অস্ত্র প্রয়োগের ঘটনা।

ধর্ম পালন করার এবং কোন ধর্ম পালন না করার অধিকারও মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার। সে যুগে সুফী কবি হাফেজ লিখেছিলেন: যদি আমার মস্তক যায়, তবু আমার অন্তর থেকে তোমার করুণা যাবে না। বোঝা যায়, কবি চেয়েছিলেন নিজের সার্বজনীন মানবতার আদর্শ পালন করতে; বাদশাহ তা করতে না দিয়ে মসজিদে নামাজ পড়ার উগ্র ইসলামী ধর্ম পালনে তাঁকে বাধ্য করতে চেয়েছিল, এমনকি পাইক-বরকন্দাজ লেলিয়েও দিয়েছিল। আজ এই বিংশ শতাব্দীতেও সেইসব আরব দেশে ফতোয়া জারি হচ্ছে, যদি ধর্ম পালন না কর তবে মৃত্যুদণ্ড হবে। ভারতেও কয়েকটি সাম্প্রদায়িক দলকে সামনে রেখে শাসকশ্রেণী, প্রধানতঃ হিন্দুধর্ম ও হিন্দী ভাষাকে বিভিন্ন রাজ্যে চাপিয়ে দেওয়ার সুপরিকল্পিত প্রচার চালাচ্ছে এবং মুখে বলছে, আমরা গণতন্ত্র ও 'সেকিউলারিজম' রক্ষা করে চলেছি।

প্রধানতঃ ষাটের দশক থেকে আমেরিকা, ব্রিটেন ও পশ্চিম জার্মানির নয়া উপনিবেশবাদী চক্রান্ত ও আধিপত্যের অন্যতম কর্মসূচী হল—এশিয়া, আফ্রিকা

ও লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে জাতীয় ইতিহাসের ও লোক-সংস্কৃতির বিকৃতি ঘটানো। এর জন্য খোদ মার্কিনী ও বিলাতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে জাল ছড়ানো হয়েছে। ১৯৬৯ সালে (ভারতীয় সংস্করণ) প্রকাশিত কালিফোর্নিয়ার ডেভিড কফ তাঁর 'ব্রিটিশ ওরিয়েন্টালিজম অ্যাণ্ড বেঙ্গল রেনেসাঁস' বইয়ে বলেছেন—ব্রিটিশ শাসন ভারতের আশীর্বাদ, ওয়ারেন হেষ্টিংস এশিয়ার মুক্তিদাতা ও নব ভারতের জনক; ওয়েলেসলি ছিলেন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সংগঠক, নবজাগরণের পীঠস্থান ছিল ফোর্ট উইলিয়াম, হিন্দু কলেজ নয় এবং রাধাকান্তদেবই ছিলেন রেনেসাঁসের অগ্রদূত, রামমোহন-বিদ্যাসাগর ও ডেভিড-ডিরোজিও'র কোন অবদানই নেই ইত্যাদি। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই প্রকাশিত ব্রুমফিল্ডের ইতিহাসে বলা হয়েছে, স্বদেশী আন্দোলন ছিল অর্থনীতির ক্ষেত্রে শোষণকারী ও রাজনীতির ক্ষেত্রে জনগণের উপর আক্রমণকারী অংশের আন্দোলন; এতে জনগণের কোন ভূমিকা তো ছিলই না, এবং সফল হলে কোন ফয়দাও হোত না। প্রিন্সটন থেকে প্রকাশিত চার্লস হিমসান তাঁর 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল অ্যাণ্ড সোশ্যাল রিফর্ম' বইয়ের ভূমিকায় বলেছেন: ডঃ রমেশ মজুমদারের দ্বিজাতিতত্ত্ব তাঁরও মনের কথা। দেখা যাচ্ছে, পুরান ধারার সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকরা তো আমাদের জাতীয় ইতিহাসকে বিকৃত করেছেই, নয়া উপনিবেশবাদীরা তার সঙ্গে একটা বামচরিত্র বা শ্রেণী-বিশ্লেষণের ভেক নিয়ে তা ঘটাচ্ছে। এতে অতিবাম বিপ্লবীদেরও রসদ যোগানো হচ্ছে এবং তারাও গিলছে। তারাও আজ ট্রটস্কির মত বলছে: জাতীয় বুর্জোয়াদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন ছিল 'প্রতিক্রিয়াশীল,' তা শোষকশ্রেণীর আন্দোলন। উল্লেখযোগ্য যে, এদের সম্পর্কে এঙ্গেলসের 'এ্যান্টি-ডুরিং' মোক্ষম জবাব।

কয়েক বছর আগে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বিশ্বভারতীতে 'উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণ' বিষয়ক বক্তৃতায় বাংলার নবজাগরণকে হিন্দু ধর্ম-সংস্কৃতির জাগরণ এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদের পুনরুজ্জীবন বলে ব্যাখ্যা ও প্রচার করেছেন। এইভাবে তিনি হিন্দুমহাসভা, জনসঙ্ঘ ও মুসলীম লীগের দ্বিজাতি তত্ত্বকেই খুঁচিয়ে তুলেছেন। কিছুদিন আগে টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে তিনি বললেন: সতীদাহ নিবারণে রামমোহনের কোন অবদানই নেই। সেটা বেন্টিক তুলে দিয়েছিলেন। সম্প্রতি দিল্লীতে ডঃ সুব্রহ্মণ্য স্বামী কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী করেছেন, ডঃ রামশরণ শর্মা প্রমুখ দিল্লী ও নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ঐতিহাসিকের বই নিষিদ্ধ করা হোক এই কারণে যে, তাঁরা বলেছেন—

প্রাচীন ভারতে শ্রেণী-সংগ্রাম ছিল, মুসলমান যুগ বিদেশী শাসনের যুগ ছিল না, হিন্দুযুগ ভারতীয় জাতি-সমূহের পক্ষে আদৌ "স্বর্ণযুগ' ছিল না ইত্যাদি। মজার কথা, যে-রমেশচন্দ্র আর. এস. এস-এর মুখপত্র 'Organiser-'এ ঐ সব ঐতিহাসিকের বই নিষিদ্ধ করার পক্ষে সায় দিয়ে প্রবন্ধ লিখলেন, তাঁকেই কেন্দ্রীয় জনতা সরকার সভাপতি করে একটি কমিটির হাতে ব্যাপারটা খতিয়ে দেখার ভার দিয়েছেন। শোনা যাচ্ছে, ইনিই নাকি আচার্য সুনীতি কুমারের শূন্য পদে 'জাতীয় অধ্যাপক' হচ্ছেন। এই ঘটনায় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী বেরিয়ে আসে না কি? তবে সুখের কথা, দিল্লী ও নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকদের বিরাট অংশ এই রকম গণতন্ত্র-বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তুলেছেন।

আজ পশ্চিমবাংলার বুকে এই রকম সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, উগ্র হিন্দুয়ানী ও ভাষার আধিপত্য ইত্যাদি নিয়ে চক্রান্তের চালবাজী ধোপে টি ঁকবে না সত্য, তবু সাহিত্য ও ইতিহাসের বিকৃতির 'slow poison' থেকে নিস্তার পাওয়া কঠিন। এর বিরুদ্ধে জাতীয় স্তরে বিতর্ক ও আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। কারণ গোটা ভারতের জনগণ যেদিন—আমি তোমার সঙ্গে এক তিলও একমত নই; কিন্তু আমি তোমার মত ও বক্তব্য প্রকাশের অধিকারের জন্য প্রাণ দিতে পারি—এ কথা বুক ফুলিয়ে বলতে পারবেন, সেই দিনই ভারত প্রকৃত অর্থে বৃহত্তম গণতন্ত্রের ও ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হবে। বলাবাহুল্য, **শ্রমজীবী মানুষের প্রয়োজনের স্বীকৃতি বাস্তবসম্মত** করার লক্ষ্যে গণ-আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথেই এটা সম্ভব।

সংস্কৃতির স্বাস্থ্য ও তার রোগ

সমাজে যখনই শ্রেণীর থাক সৃষ্টি হয়েছে, তখনই শ্রমের ভাগ হয়েছে—মানসিক ও কায়িক; তখন থেকেই আইন-প্রশাসন, ধর্ম-দর্শন সব কিছুর সঙ্গে মানুষের গোটা জীবনকর্ম বা সংস্কৃতিও শ্রেণী-সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু মানসিক শ্রমকারী পুরোহিতকুল ঘাতক-শ্রেণীর অর্থ বা উৎপাদন-ব্যবস্থাকে পরিপুষ্ট ও নিরাপদ করার জন্য সমাজ-সংসারের বাস্তব সম্পর্কবিহীন নানারকম বিধি-নিষেধের ভাববাদী ধ্যান-ধারণা বানিয়ে প্রচার করেছিল। এঙ্গেলস বলেছেন: 'Division of labour only becomes such from the moment when a division of mental and material labour appears. From this moment onward consciousness can really flater itself that it is something other than consciousness of existing practice.' তার মানে, মন বলছে—এটা করো তো করতে হবে, মন বলছে—ওটা ভাঙো তো ভাঙতে হবে; সংস্কৃতি মানেই তখন বিশুদ্ধ বুদ্ধিচর্চা, যার কথা হল—আত্মাই সব, জগৎ মিথ্যা ইত্যাদি। গ্রহ-উপগ্রহগুলি 'পবিত্র' দেবদেবীদের রাজ্য; এ সব নিয়ে যন্ত্রপাতির সাহায্যে যারা কিছু প্রমাণ করতে যাবে, অর্থাৎ 'অশুদ্ধ' কায়িক শ্রমের ছোঁয়া লাগিয়ে অশুচি করবে, তাদের মধ্যে 'পিশাচ' ভর করেছে বলে ফরমান জারি কর', চোখ উপড়ে নেওয়া ইত্যাদি 'মহান সাংস্কৃতিক কর্তব্য' মহাসমারোহে পালন করা হবে—এই হল সামন্ততান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার উপযোগী সংস্কৃতি। যোশেফ স্তালিন তার 'মার্কসবাদ ও ভাষা সমস্যা' বইতে বলেছেন: 'সামাজিক ভিত হল সমাজ বিকাশের কোন এক স্তরে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো; আর উপরি কাঠামো হল সেই সমাজের রাজনৈতিক, আইনী, ধর্মীয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। প্রতি ভিতেরই নিজস্ব উপরিকাঠামো তৈরী হয়।....যদি ভিত বদলে যায় বা তাকে উৎখাত করা হয় তবে সেইসঙ্গে ক্রমে তার উপরিকাঠামোও বদলে যায় এবং আগেরগুলিকে উচ্ছেদ করা হয়।" অবশ্য তার মানে এই নয় যে, এই নিয়ম যান্ত্রিকভাবে চলে। উপরিকাঠামো ভিত-নির্ভর বলেই যে ঠুঁটো জগন্নাথ তা নয়।

সেগুলি তার অর্থব্যবস্থা বা শ্রেণী-সম্পর্কের ব্যাপারে আদৌ উদাসীন থাকে না, নিষ্ক্রিয় থাকে না। পালাবদল বা নতুন শক্তির উন্মেষের পর ক্রমে তার উপরি-কাঠামোর বিভিন্ন উপাদানও সামগ্রিকভাবে একটি সক্রিয় শক্তিতে পরিণত হয়; ভিৎ-মহলের মধ্যেও যেমন ঠোকাঠুকি লাগে, তার পাহারাদারী শক্তিগুলির মধ্যেও তেমনি ইতি-নেতির লড়াই বাধে; তখন একাংশ স্থিতাবস্থা রাখতে এবং অপরাংশ সমাজ প্রগতির মাল-মশলার যোগান দিতে কোমর বেঁধে লাগে। এইভাবে এক সময়ে দেবতাদের **অলীক স্বর্গ রাজ্য ভেঙ্গে** ইউরোপীয় রেনেসাঁসের বিজ্ঞানী-দার্শনিকদের বস্তুরাজ্য মানুষ ফিরে পেয়েছিল; এইভাবেই সেক্সপীয়ারের ভাষায় মানুষই হয়েছিল 'প্রকৃত ঈশ্বর'; সার্ভেন্তিসের ডন কুইকজোট তাই 'পিছনের হারিয়ে যাওয়া'কে নিরাসক্ত মনে ফেলে সামনের নতুন মানবিক রাজ্যে এগিয়ে গেছে।

পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে সারা ইউরোপে শিল্প-সাহিত্য ও বিজ্ঞান-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পালাবদল হয়েছিল তার গর্ভ সঞ্চার হয়েছিল বিগত কয়েক শতাব্দীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও লোক-সংস্কৃতিগত গণতান্ত্রিক উপাদানের ঘাত-প্রতিঘাত ও বিকাশের ধারায়। মধ্যযুগীয় বার্গাররা শিল্প-উৎপাদন, নৌপরিবহণ ও নতুন দেশ আবিষ্কার করে এবং যন্ত্রবিজ্ঞানে উন্নততর শক্তির অধিকারী হয়ে চার্চ ও ধর্মযাজকদের পীড়নমূলক আধিপত্যের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করেছিল, সামন্ত অভিজাত শ্রেণী ও তার বশংবদ চার্চ-যাজকদের শক্তি ভেঙ্গে নতুন বুর্জোয়া সমাজের ও ইউরোপীয় জাতীয় চেতনার সূচনা করেছিল, তারই নাম ইউরোপীয় রেনেসাঁস। এই ঘটনায় বিজ্ঞান, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, শিল্প-সাহিত্য ও লোকধর্মের যুগান্তকারী রূপান্তর প্রতিফলিত হয়েছে; এই সময়েই লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি, ম্যাকিয়াভেল্লি ও মার্টিন লুথার প্রমুখ বিপ্লবী ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে। বলাবাহুল্য, এই যুগের সামন্ত অভিজাত ও চার্চ যাজকদের 'সংস্কৃতি' প্রতি-বিপ্লবী ভূমিকায় নেমেছিল; আর সেই সময় অবক্ষয় ও ধ্বংসের হাত থেকে মানবসভ্যতার উত্তরণ ঘটিয়েছিল বিজ্ঞান ও শিল্প-সংস্কৃতি; বিজ্ঞান দিয়েছিল উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের শক্তি এবং বৈপ্লবিক সংগ্রামকে মানবিক আবেগে আদর্শায়িত ও গৌরবান্বিত করেছিল শিল্প-সাহিত্য।

কিন্তু সমাজ-সংস্কৃতির গতি ঢেউয়ের মতো; বুর্জোয়া সভ্যতার উন্মেষপর্বের এই মানব মহিমার পতাকা ক্রমে পথের ধূলায় দলিত হয়েছে। কারণ সেই একই শ্রেণী-সংগ্রামের মুখে পড়ে ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর চরম প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে

যাওয়া এবং আবার ক্যাথলিক জেস্যুইটবাদের অন্ধ গুহার রাজত্ব কায়েম করা। কিন্তু ইতিহাসের কোন পর্বে সমাজের উদ্ভট ও বিকারগ্রস্ত ধ্যান-ধারণা শেষ ও একমাত্র কথা হতেই পারে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর 'আলোকপ্রাপ্ত' (Enlightenment) দর্শন-সাহিত্য ও ফরাসী বিপ্লবের (১৮৮৯) বীজ সেই ঢেউয়ের নিচের তলা থেকে অঙ্কুরিত ও বিকশিত হয়েছিল। এঙ্গেলস তাঁর 'এ্যান্টি-ডুরিং'-এ বলেছেন: "তাঁরা বাইরের কোন কর্তৃত্ব মানতে চাননি। ধর্ম, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, সমাজ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সব কিছুকেই যুক্তির কাঠ গড়ায় দাঁড়াতে হবে; তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হবে। যুক্তিই হল সবকিছু গ্রহণের নিরিখ।"

কিন্তু সামন্ত আধিপত্য ও পচনশীল রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে যে বুর্জোয়াশ্রেণী নবযুগের সূচনা করেছিল, তাতে নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকরাও অংশ নিয়ে যখন 'স্বাধীনতা ও সাম্য' চাইল, তখনই বুর্জোয়া নেতাদের মুখ কুৎসিত ও হিংস্র হয়ে উঠল; তার গর্ভ থেকেই জন্মেছিল জাকোঁবাদ, অর্থাৎ শ্রমিক কৃষক ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত জনগণের স্বাধিকারের আন্দোলন; এতে স্বভাবতই বুর্জোয়া শাসকরা আতঙ্কিত হল এবং অচিরেই 'যুক্তির দর্শন' ও স্বাধীনতা মৈত্রী-ঐক্যের আদর্শকে সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও নেপোলিয়নীয় স্বৈরাচারের শ্রীচরণে অর্পণ করল। বিপ্লবের আগে সামন্ততান্ত্রিক অপরাধ প্রকাশ্যেই হত; পরে সেগুলি পুরোপুরি উচ্ছেদ না হলেও, কিছুটা কোনঠাসা হয়েছিল; কিন্তু গত শতাব্দীর প্রথম দু-তিন দশকেও যে সব বুর্জোয়া অপরাধ গোপনে হত, চল্লিশের দশক থেকে সেগুলি বেপরোয়াভাবে ঘটতে লাগল। বুর্জোয়াদের ব্যবসা-বাণিজ্য মানেই প্রতারণায় দাঁড়াল; 'মৈত্রী' চুলোয় গেল, দেখা দিল রেষারেষি, বিদ্বেষ, খুন-জখম, দুর্নীতি ও ব্যাপক হারে বেশ্যাবৃত্তি। বলাবাহুল্য, এই অবস্থাটা সারা ইউরোপীয় সমাজেরই ছবি। ইংরাজ কবি শেলী বর্ণনা দিচ্ছেন: নৈরাশ্য ও মানুষের প্রতি বিদ্বেষ এখনকার কালের রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যক্তিগত হতাশা অজ্ঞাতসারে নিজের ব্যক্তিগত বিষণ্ন তার অনুভূতিকে ইচ্ছাকৃতভাবে বাড়াবাড়ি করে দেখে ও তাতেই সান্ত্বনা পায়।" এই অবক্ষয়ী ও বিকৃত পরিবেশের শ্মশানভূমিতে দাঁড়িয়ে শেলী যখন উচ্চারণ করেন "পিটারলু ম্যাসাকার" ও "কুইন ম্যাব"-এর মত অগ্নিক্ষরা কবিতা, তখন পচাগলা প্রতিবিপ্লবী সংস্কৃতির ঠিকাদাররা চমকে উঠেছে। দেখা গেছে, ১৮৪৮ সালের ফরাসী বিপ্লবের জ্বালানী হয়েছিল যুক্তিবাদী মানবিক মূল্যবোধের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য; ফ্রান্সের জাকোঁবাদের উত্তর সাধনায়, ইংলণ্ডে চার্টিস্ট আন্দোলনের (১৮৩২-৪৮) প্রভাবে ও শ্রেণী সংগ্রামের অনিবার্য পরিণতিতে (১৮৪৮ সালে

মার্কস এঙ্গেলসের 'কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো' রচিত হয়েছিল) যুগান্তকারী প্যারি কমিউন (১৮৭১) ঘটেছিল। ইংলণ্ডের ক্ষয়িষ্ণু-বুর্জোয়া শাসনের বিরুদ্ধে চার্টিস্ট কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে : অহো ! কালো রাত্রি ভেঙে যাচ্ছে ; সূর্যোদয়ের কাল আসন্ন !' ফ্রান্সের কমিউনও ধ্বংস হয়েছিল ; কিন্তু তার বাণীকে দুনিয়ার বুক থেকে মুছে নিতে পারেনি ; তাই ১৮৭৬ সালে ইউজেন পতিয়ের রচনা করলেন সারা দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী সঙ্গীত—'আন্তর্জাতিক সঙ্গীত।'

ইংরাজরা এসে এদেশে পুঁজিবাদের তথা বুর্জোয়া গণতন্ত্রেরও সুস্থ বিকাশ ঘটায়নি ; তারা একাধারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভিত গড়ে নতুন জমিদারী ব্যবস্থাও কায়েম করেছিল এবং সেই সঙ্গে 'লেসে ফেয়ার' বা শিল্প পুঁজিবাদের 'অবাধ বাণিজ্যনীতি'-ও বহাল করেছিল। বিগত ত্রিশ বছরের কংগ্রেসী শাসনে এই মিশ্র ও ভাঙাচোরা ব্যবস্থাই চলে এসেছে ; তাই আজ দেখা যাচ্ছে, বর্তমান সংবিধানের কাঠামোয় আমূল ভূমি-সংস্কার ঘটানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে ; অথচ আমূল ভূমি-সংস্কারের প্রশ্নকে চেপে রেখে বা সরিয়ে দিয়ে, বৃহৎ মালটি-ন্যাশনাল কোম্পানীগুলির পাশাপাশি গ্রামীণ ক্ষুদ্র শিল্পে উৎসাহ দিয়ে, কিংবা গ্রামে গ্রামে অবৈতনিক স্কুল বানিয়ে দিয়েও ভয়ংকর বেকার সমস্যার ও নিরক্ষরতা সমস্যার কিনারা হতে পারে না। স্মরণ রাখা দরকার, প্রধানতঃ এই দুই জাতীয় সমস্যার রন্ধ্রপথেই অপসংস্কৃতির ঘোলা জল বন্যার মতো ঢুকে পড়েছে।

আজও সামন্ততান্ত্রিক অবশেষের ও পচাগলা পুঁজিবাদের মিশ্র-অর্থনীতি আমাদের এই সমাজের ভিত ; একে পাহারা দিচ্ছে সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কার ও ফ্যাসিবাদী, নয়া-ফ্যাসিবাদী বা সাম্রাজ্যবাদী অবক্ষয়ের 'সংস্কৃতি'। এই পাহারাটা ভালই জমেছে ; কারণ আমাদের দেশে শতকরা ৭০ শতাংশ মানুষই নিরক্ষর ও অর্ধভুক্ত। উন্নত পাশ্চাত্য দেশগুলিতে যখন ফ্যাসিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী অপসংস্কৃতি দেদার ছড়ানো হচ্ছে, তখন বুঝতে হবে তা সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিকল্প হিসাবে করা হচ্ছে ; কিন্তু আমাদের দেশে এসব তো শিক্ষা, খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের 'বিকল্প' নেশা বা মন-বানানোয় (manupulation) পরিণত হয়েছে।

কিন্তু আমরা অবক্ষয়ী পুঁজিবাদী বা সাম্রাজ্যবাদী যুগে বাস করছি মানেই, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বা শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রীর ভিত্তিতে পরিচালিত বিপ্লবী সংগ্রামের (জনগণতান্ত্রিক) ঐতিহাসিক দায়িত্ব নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছি ; কিন্তু এই

সংগ্রামের বর্তমান স্তরে, আমরা যে সামন্ততান্ত্রিক অবশেষগুলিকে উৎখাত করতে অর্থাৎ অসমাপ্ত গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করতে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন সংগঠিত করে চলেছি, তাতে পচাগলা বুর্জোয়া শ্রেণীর কোন ভূমিকা থাকতে পারে না। তাদের রাজনীতি তো ব্যক্তিগত মালিকানা আগলে রাখা, আমূল ভূমি-সংস্কারের বিরোধিতা করা এবং তাদের 'সংস্কৃতি' তো যৌন-লাম্পট্য-মূলক শিল্প-সাহিত্য, সাঁইবাবা, সন্তোষী মা কিংবা অবিরাম হরি-সংকীর্তনে দেদার টাকা ছড়ানো এবং ছাঁটাই ও বেকারত্বজনিত বিচ্ছিন্নতার সুযোগ নিয়ে যুবসমাজের একাংশকে গণ-আন্দোলন ভাঙার সমাজবিরোধী গুণ্ডায় পরিণত করা। সাম্রাজ্য-বাদের আশ্রিত অপুষ্ট ও রুগ্ন পুঁজিবাদের থলিতে ইতিবাচক বা মানবিক মূল্যবোধের আর কিছুই থাকতে পারে না।

এই প্রসঙ্গেই 'অপসংস্কৃতির মামলাটা সেরে নেওয়া দরকার! লক্ষ্য করছি, যে সময়ে এ রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার জনগণের সুস্থ ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির আন্দোলন ও ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে ও শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীর মধ্যে সম্প্রসারিত করতে উদ্যোগ নিয়েছেন, সেই সময়েই বৃহৎ পুঁজির মালিকানাধীন প্রতিক্রিয়াশীল শিবির থেকে রব উঠছে, সংস্কৃতি ও রাজনীতিকে মেলানো হচ্ছে কেন? তা ছাড়া সংস্কৃতি ব্যাপারটাই যদি ভাল, তবে আবার 'অপ' কিসের ইত্যাদি। আসলে ওদের পচাপাঁকের বদ্ধ জলাশয়কে বা চোলাইয়ের ভাঁটিখানাকে 'অপ' বা নিকৃষ্ট বলাতেই ওদের রাগ। ওরা চায়না, সংস্কৃতির নামে চালু ওদের ঐ সব বাজারী পণ্যগুলিতে অপসংস্কৃতি লেবেল পড়ুক; অপসংস্কৃতির চেহারা-চরিত্র ও ঘাঁটি-গুলি জনসাধারণ চিনে ও বুঝে নিয়ে বর্জন করুক; তাতে ওদের আখের ও বাজার দুয়েতেই মোক্ষম ঘা লাগে। এখনো যে ভাবে ওরা পচা ঘাগুলোকে নানা মার্কার দর্শন ও মনোহারী ফর্মের আবরণে ঢেকে বাজারে কেনাবেচা চালাচ্ছে এবং একই সঙ্গে মানুষের মনকে বিকৃত-বিভ্রান্ত করতে ও মোটা অঙ্কের টাকা কামাতে পারছে, তাতে প্রগতিশীল সরকারের সহযোগিতায় ব্যাপক গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির আন্দোলনের মুখে, 'রাজনীতিবর্জিত শিল্প-সাহিত্য'-এর গণেশ উল্টে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে বলেই ওদের 'সংস্কৃতিপ্রেম' হঠাৎ উথলে উঠেছে। ভাবখানা যেন, ওরা যা ছাড়ছে ও ছড়াচ্ছে সেগুলোই 'আধুনিক সংস্কৃতি', তবে আবার অপসংস্কৃতি নিয়ে হৈচৈ করা কেন? মানুষের কাছে আমাদের জবাবটা রাখা দরকার। সামন্তযুগের লোকধর্ম ও সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং বুর্জোয়া উন্মেষযুগের ও 'আলোকপ্রাপ্ত' পর্বের সংস্কৃতির ঐতিহ্য অবশ্যই মানবসভ্যতার

বিকাশে ইতিবাচক অবদান রেখেছে। তা ছাড়া সামন্তযুগেও গীর্জা ও যাজকদের ডগ্‌মা ও আচারাশ্রয়ী প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে আক্রমণ বা 'হেরেসি' ছিল এক ধরণের বিশুদ্ধ শাস্ত্র ও লৌকিক ধর্ম-দর্শনের প্রতিরোধ আন্দোলন, যা ফর্মের দিকে প্রতিক্রিয়াশীল হলেও তথাকথিত আচারপ্রথার পবিত্র জৌলুসকে খসাতে বেশ কিছুটা অগ্রগামী ভূমিকা নিয়েছিল। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের জার্মাণীর কৃষক বিদ্রোহে এবং আমাদের দেশের সন্ন্যাসী বিদ্রোহে এবং তারপরে, উনিশ শতকের গোড়ায় রামমোহন বিদ্যাসাগরের সমাজ–সংস্কার আন্দোলনে এই রকম 'হেরেসি' ঘটেছিল। আবার গোটা বুর্জোয়া ধনতন্ত্রের যুগে (সাম্রাজ্যবাদী পর্ব ছাড়া) একাধিকবার সারা ইউরোপে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রগতির শক্তি ঢেউয়ের উপরতলা সৃষ্টি করেছে; কিন্তু সমাজতন্ত্রের উত্তরণের মুখে এসে বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদী ঘাতক ও পুরোহিতদের শিবির বলছে, তারাই যখন শেষ হয়ে যাচ্ছে ও যাবে, তখন দেশে দেশে জনগণের গণতান্ত্রিক ও মানবিক সমস্ত ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে খতম করে যাব। ওদের পক্ষে এ ছাড়া নাহ্য পন্থা। ওদের সব কিছু আজ ধ্বংসাত্মক বিকৃত ও নেতিমূলক, যাকে অবশ্যই সংস্কৃতি নাম দেওয়া চলে না; তাই তা অপসংস্কৃতি, যার সঙ্গে অনিবার্যভাবে ঔপনিবেশিক ও সামন্ততন্ত্রের তলানিও ঘুলিয়ে উঠেছে।

প্রসঙ্গতঃ আরও একটি কথা বলা দরকার। ভাষা আগে, ব্যাকরণ পরে। মানুষের যৌথ কর্মক্ষেত্র থেকে কাজের প্রয়োজনের ও সমাজ-সম্পর্কের ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়ায় ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। মূল ধাতু বা শব্দের সঙ্গে যুগ যুগ ধরে যে অজস্র প্রত্যয় বিভক্তির যোগ হয়ে নতুন নতুন শব্দের সৃষ্টি হয়েছে, তা কোন পুরোহিত বা পণ্ডিতের মস্তিষ্কপ্রসূত নয়, জনগোষ্ঠীর কাজের অভিজ্ঞতা, প্রয়োজন ও সামাজিক আদান-প্রদানই জাতি গোষ্ঠীর শব্দ ভাণ্ডার সৃষ্টি করেছে। এই শব্দ-ভাণ্ডার কোন যুগের স্থাবর সম্পত্তি নয়। সমাজের অর্থব্যবস্থা ও সংস্কৃতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে, পুরনো অসংখ্য শব্দের অর্থেরও পরিবর্ত্তন হয়েছে; আবার লক্ষ লক্ষ নতুন শব্দ এসে শব্দ ভাণ্ডার ভরিয়েছে। পাণিনির ব্যাকরণে নেই এমন হাজারো শব্দ মানুষ তার কাজের ক্ষেত্রে, সামাজিক আদান-প্রদানের প্রয়োজনে ব্যবহার করে চলেছেন। 'অপসংস্কৃতি' শব্দটিরও জন্ম হয়েছে স্বৈরতন্ত্র ও ফ্যাসি-বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্র থেকে; আজ ব্যাকরণে নেই, কাল নিশ্চয়ই সংযোজিত হবে। তাছাড়া ভাষা যদি অপভাষা হয়, দেবতা যদি অপদেবতা হয় তবে সংস্কৃতি 'অপসংস্কৃতি' হবে না কেন? অনেকে বলেছেন নেতিবাচক

'অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে' না বলে ইতিবাচক 'সংস্কৃতির সপক্ষে' বললেই হয়। এটাই আমাদের কথা এবং যথেষ্ট বলাও হচ্ছে; কিন্তু তাহ'লে তো 'সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে' কথাটাও বাতিল করতে হয়! সাম্রাজ্যবাদ কথাটাই তো নেতিবাচক!

যাই হোক, শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লবের বর্তমান স্তরে, আজকের সামন্ততান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী অপসংস্কৃতির চেহারা ও চরিত্রগুলোকে যেমন মানুষকে বোঝানোর প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি বিকল্প **গণতান্ত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধের উত্তরণমুখী** সংস্কৃতির সৃষ্টি ও প্রচারের ক্ষেত্রেও ব্যাপক কর্মসূচী নিয়ে নেমে পড়া বড়োই জরুরী। সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব' বইয়ে লেনিন বলেছেন: কোটি কোটি জনগণের মধ্যে কয়েকশ' বা কয়েক হাজার সুবিধাভোগী মানুষ শিল্প-সাহিত্য থেকে কী পেল সেটা বড় কথা নয়; শিল্প-সংস্কৃতি জনগণের সম্পদ। ব্যাপকতর মেহনতি মানুষের গভীরেই তার শিকড় যাওয়া চাই। তাঁদেরই অনুভূতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সংহত ও জাগ্রত করতে হবে। তাঁদের জন্যই আমাদের ম্যানেজমেন্ট শিখতে হবে, হিসাবশাস্ত্র গড়তে হবে। এ কথাটা শিল্প-সংস্কৃতিরক্ষেত্রেও খাটে।

ভেক-বিজ্ঞানের মত সমাজতান্ত্রিক শিবিরে ভেক-প্রগতি-ওয়ালারাও ঢুকে পড়ে। এদের সম্পর্কেও লেনিন সাবধান করে বলেছেন: বুর্জোয়া ভাবধারার ডিম থেকে সদ্যজাত **হলুদ ঠোঁটওয়ালা পাখীরা** সব সময়েই ভয়ংকর রকমের চালাক।' এরা যে কেবলই যৌন লাম্পট্য ও ক্ষয়মূলক শিল্প-সাহিত্যকে সার্টিফিকেট দেয় তা নয়, শ্রমিক-কৃষকের জীবন নিয়ে গড়া গল্প-নাটক-চলচ্চিত্রে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের রসায়নে যৌনতার জৈব ভূমিকা ও মনের বিকারকে বড় করে দেখায়। যৌনতার যে সামাজিক ভূমিকা—প্রজাতি রক্ষায় ও উৎপাদনী শক্তির বিকাশে যা অপরিহার্য মূল্যবান উপাদান, তাকে সরিয়ে দেয় মানেই, অবক্ষয়ী পুঁজিবাদের পক্ষে বিপদের কারণগুলিকে আড়াল করে।

বাংলার নবজাগরণ ও সাহিত্য-সংস্কৃতির ঐতিহ্য-১

॥ এক ॥

বণিকী পুঁজির ব্রিটিশ আমলা লর্ড কর্ণওয়ালিস এদেশে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার 'বন্দোবস্ত' (১৭৯৩) পাকা করার সময়ে বলেছিলেন: 'রায়তদের পুরোপুরি ক্রীতদাস না বানালে জমিদারের পক্ষে নিয়মিত সরকারী কোঠা অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়।' এইভাবে অনেকটা ইউরোপের মধ্যযুগীয় সার্ফ প্রথার মত নয়া বন্দোবস্ত কৃষককে জমিতে শিকড় গেড়ে গাছের মত স্থাবর-সম্পত্তিতে পরিণত করেছিল। কার্ল মার্কস 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের একস্থানে মন্তব্য করেছেন: 'ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসেই কেবল দেখা যায়, সে দেশের অর্থব্যবস্থায় অনেকগুলি ব্যর্থ ও কুখ্যাত পরীক্ষা হয়েছে। বাংলাদেশে তারা ব্যাপকভাবে সৃষ্টি করেছে বিলাতী ধরণের বড় আকারের জমিদারীর নিকৃষ্ট নকল।' মহাভারতের যুগ থেকে আকবর পর্যন্ত চাষের জন্য সেচের জল ছিল, কমবেশী নজরও ছিল; কিন্তু ব্রিটিশ শাসকরা এসে তাঁতও ভাঙল, সেচেরও নিকেশ করে ছাড়ল। ভারতীয় ইতিহাসকে জানার চাবিকাঠি যে পাবলিক ওয়ার্কস, সেই খাল, বিল, পুকুর সে সবই গ্রামের মানুষের যৌথ সম্পত্তি থেকে ব্যক্তিগত মালিকানায়, প্রধানতঃ জমিদারের মেছো ভেড়িতে পরিণত হল। অবশ্য সেচ গেলেও রেল বসল, গ্রামের আকাশের নিচে টেলিগ্রাফের তার গেল। অবশ্য যদিও তা শিল্প-বিকাশের সচেতন স্বার্থে নয়, তবু কাঁচামাল ও মুনাফার প্রয়োজনে যেটুকুও করতে বাধ্য হল, তারই মধ্যে আসন্ন সংঘাত ও নতুন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শক্তির বীজ বপন করা হয়ে গেল। এ সম্পর্কে এ. এল. মর্টন বলেছেন: "The railway not only transformed things, it transformed people. It created an industrial middle-class and an industrial working class; it bound the whole country into an economic unity it had never before possessed and gave it the beginning of a political unity." (দি পিপল্স হিস্ট্রি অব ইংলণ্ড, পৃঃ ৪৬৯)।

দেখা গেছে, অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে বণিকী পুঁজির শক্তি কেবলই

বেপরোয়া লুণ্ঠন ও ধ্বংস ঘটিয়েছে; অতঃপর ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের পর্বে চলেছে শিল্প-পুঁজিদের সঙ্গে অর্থাৎ লেসে ফেয়ারের (অবাধ-বাণিজ্য) সঙ্গে বণিকী পুঁজির একচেটিয়া বাণিজ্যের সংঘাত, এর মধ্যে বিজ্ঞান ও যন্ত্রপাতির নতুন নতুন আবিষ্কার ও উন্নতির সঙ্গে উৎপাদনের শক্তিও বেড়েছে; অবাধ-বাণিজ্যের নীতি উৎপাদনের ও গণতন্ত্রের অগ্রগতির পথ করেছে এবং পার্লামেণ্টের ভিতরে ও বাইরে আন্দোলন তীব্রতর হয়েছে। এরই ফলে উনিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশক থেকে, চার্টার আইনের মাধ্যমে এদেশে অবাধ-বাণিজ্যের শক্তি কায়েম হয়েছে এবং বিকাশের ভিত্তি রচনা করেছে। তাহলেও কৃষিকে মেরে শিল্প-বাণিজ্যের সাংগঠনিক ও সামগ্রিক বিকাশ অবাধ হতে পারে না; সীমাবদ্ধ ও খণ্ডিত সামন্ত-পুঁজিবাদী মিশ্র অর্থব্যবস্থার অভিশপ্ত বনিয়াদের উপরই ব্রিটিশ ভারতের নতুন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। এ সম্পর্কে ১৮৫৩ সালে কার্ল মার্কস 'ভারতে ব্রিটিশ শাসন' নিবন্ধে যে প্রাসঙ্গিক মন্তব্য করেছেন তা অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। "....কিন্তু ইংলণ্ড ভারতীয় সমাজের সমগ্র কাঠামোই ভেঙে দিয়েছে, পুনর্গঠনের কোন লক্ষণ এখনও অদৃশ্য।" অবশ্য তিনি বাষ্পশক্তি ও বিজ্ঞানের পদসঞ্চারকে ঐতিহাসিক বিকাশের সহায়ক বলে চিহ্নিত করে বলেছেন: "সারা ভারতবর্ষ জুড়ে কৃষি ও হস্তচালিত শিল্পের যে বন্ধন ছিল, ব্রিটিশ বাষ্প ও বিজ্ঞান তাকে উন্মূলিত করে দিয়েছে।" কিন্তু এই ঘটনায় বিষাদের কোন কারণ নেই, এবং পুরোন জগতে ফিরে যাওয়াও বর্বরসুলভ পশ্চাৎপদতা; তাই আশ্চর্য কাব্যময় ভাষায় বলেছেন: "ঐ সব লক্ষ লক্ষ শ্রম-পরায়ণ পিতৃতান্ত্রিক ও নিরীহ সামাজিক সংগঠনগুলি অসংগঠিত হয়ে চূর্ণ চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে ডুবে যাচ্ছে দুর্দশার এক সমুদ্রে, সে সংগঠনের সদস্যদের কাছ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে যুগপৎ তাদের প্রাচীন ঐতিহ্য ও জীবিকার্জনের বংশানুক্রমিক উপায়—দেখতে এটা মানবিক অনুভূতির কাছে যতই বেদনাদায়ক হোক না কেন, একথা যেন না ভুলি যে এইসব শান্ত সরল (idyllic) গ্রাম-গোষ্ঠীগুলি যতই নিরীহ মনে হোক, প্রাচ্য স্বৈরাচারের তারাই ভিত্তি হয়ে এসেছে চিরকাল, মানুষের মনকে তারাই যথাসম্ভব ক্ষুদ্রতম পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে, তাকে বানিয়েছে কু-সংস্কারের অবাধ ক্রীড়নক.... এইসব গোষ্ঠী ছিল জাতিভেদপ্রথা ও ক্রীতদাসত্ব দ্বারা কলুষিত, অবস্থার প্রভুরূপে মানুষকে উন্নত না করে তাকে করেছে বাহিরের অবস্থার অধীন,....এ কথা সত্য যে, ইংলণ্ড হিন্দুস্তানে সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে গিয়ে প্ররোচিত হয়েছিল শুধুই হীনতম

স্বার্থসাধনে ; তার আচরণ ছিল নির্বোধের মত। কিন্তু সেটা প্রশ্ন নয় ; প্রশ্ন হল, এশিয়ার সামাজিক অবস্থার মৌলিক একটা বিপ্লব ছাড়া মানবজাতি কি তার নতুন ভবিষ্যৎ গড়তে পারে? যদি না পারে, তবে ইংলণ্ডের যত অপরাধই থাক, সে বিপ্লব সাধনে ব্রিটিশ শাসন ছিল ইতিহাসের অচেতন অস্ত্র।" ভারত-প্রসঙ্গে তিনি ভবিষ্যৎ অগ্রগতির বাস্তব ভিত্তি হিসাবে রেল-ব্যবস্থাকে নির্দেশ করেছেন, যা **বর্ণাশ্রমিক শ্রম-বিভাগ ও বর্ণাশ্রমের জাল** ছিন্নভিন্ন করে গোটা জাতির মুক্তির পথ নির্মাণ করবে ; এবং এই পথ রচনায় অগ্রণী হবেন, ব্রিটিশ শাসকদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সৃষ্ট, একশ্রেণীর পাশ্চাত্য যুক্তিনির্ভর মানবতাবাদে ও বিজ্ঞান-দর্শনে উদ্দীপিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী।

রবীন্দ্রনাথ প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের সনাতন সমাজ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন: "তার সমস্ত তথ্য ও রসধারা বংশানুক্রমে বৎসরে বৎসরে বার বার হয়েছে আবর্তিত অপরিবর্তিত চক্রপথে, সেইগুলিকে অবলম্বন করে আমাদের জীবনযাত্রার সংস্কার নিবিড় হয়ে জমে উঠেছে, সেই সকল কঠিন সংস্কারের ইট পাথর দিয়ে আমাদের বিশেষ সংসারের নির্মাণকার্য সমাধা হয়ে গিয়েছিল।" ব্রিটিশ শাসনের সংগে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আগমনকে কবি কী কারণে স্বাগত জানিয়েছেন, তার ব্যাখ্যা দিয়ে যা বলেছেন তার সারমর্ম হল: মুসলমানেরা এদেশে এসে রাজ্যসংঘটন করেছে ; কিন্তু তারাও সামন্ততান্ত্রিক চিরপ্রথার আগলে বাঁধা সংস্কৃতি ব্রাহ্মণ্যশাসিত হিন্দু-সংস্কৃতির কোন নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারেনি। "তখনকার কালে দুই সনাতন বেড়া-দেওয়া সভ্যতা ভারতবর্ষে পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে, পরস্পরের দিকে মুখ ফিরিয়ে। তাদের মধ্যে কিছুই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয়নি তা নয়, তা সামান্য।....বাহিরে থেকে মুসলমান এসে স্থায়ী বাসা বেঁধেছে, কিন্তু আমাদের দৃষ্টিকে বাহিরের দিকে প্রসারিত করেনি। তারা ঘরে এসে ঘর দখল করে বসল, বন্ধ করে দিলে বাইরের দিকে দরজা। সেইজন্য চণ্ডীমণ্ডপেই রয়ে গেল আমাদের প্রধান আসর।" কবি এটাও লক্ষ্য করেছেন চণ্ডী, মনসা ও অন্নদা প্রভৃতি মঙ্গল কাব্যে যে 'অন্যায়ের বিভীষিকায় দেব-দেবীর প্রতিপত্তি'কে স্বৈরাচারী শাসকের ভয়ঙ্কর শক্তির প্রতিরূপে আঁকা হয়েছে, তার মধ্যেই 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' কথাটার অর্থ রয়ে গেছে। আরো পুরোন কাল থেকে মনুর স্মৃতি-শাস্ত্রে ব্রাহ্মণকে ভূদেব কল্পনা করে শূদ্রের প্রতি অধর্মাচরণ করার অবাধ ক্ষমতা তো দেওয়াই ছিল। দেখা যাচ্ছে, মধ্যযুগের অভিজাত সামন্ত সমাজের মূল ধারাটি চিনতে কবির ভুল হয়নি। কিন্তু মুসলমান ধর্ম

সংস্কৃতির প্রবহমানতায় সেই স্থলতানী যুগ থেকেই সাদী, ইরাকী, হাফেজ ও গালীবের স্থফী কবিতা ও গানের লোকজীবনসিঞ্চিত উত্তরাধিকার কীর্তন, বাউল, মালসী-মারফতির ভেদ ও ভোগ-বিরোধী ঐতিহ্য আমাদের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির ধারায় কম প্রভাব রাখেনি; এবং এই ধারাই সমস্ত সমাজের বিরোধমূলক ও প্রতিবাদী সংস্কৃতির দিক। তাই লালন ফকির গান ধরেন :

"সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে
লালন বলে জেতের কি রূপ দেখলাম নানা নজরে
যদি স্থন্নত দিলে হয় মুসলমান
নারীর তবে কি হয় বিধান
বামুন চিনি পৈতা প্রমাণ
বামনী চিনি কিসে রে...."

বাউল প্রচার করেছেন :

"তোমার পথ ঢাইকাছে মন্দিরে ও মসজিদে
তোমার ডাক শুনে সাঁই
চলতে না পাই
রুইখে দাঁড়ায় গুরুতে মোরসেদে
তোর দুয়ারেই নানা তালা
পুরাণ কোরাণ তসবী মালা
ভেদপই তো প্রধান জ্বালা
কাঁইদে মদন মরে খেদে।"

দিল্লীর স্থলতানী আমলে যে একাধিক প্রজাবিদ্রোহ হয়েছিল, তা কি সাদী-ইরাকী ও নিজামুদ্দিন আউলিয়া প্রমুখ সহজিয়া স্থফি দর্শনে সম্পৃক্ত ধর্মীয় গান ও কবিতার প্রভাবে নয়? দেখা যায়, এইসব গান ও কবিতা ফর্মের দিকে ফিউডাল হলেও, ভাববস্তুতে গণতান্ত্রিক উপাদানের কাঁপন রয়েছে। 'জার্মানীর কৃষক-বিদ্রোহ' গ্রন্থে এঙ্গেলস দেখিয়েছেন, বিদ্রোহগুলির আগে যে গীর্জা ও পুরোহিত-তন্ত্রের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে রহস্যবাদ ও এ্যাসেটিসিজম-এর ব্যবহার, তার মধ্যেই বিদ্রোহের উৎসমুখ খুলে যাওয়ার বীজ ছিল।

॥ দুই ॥

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'তখনকার কালে দুই সনাতন বেড়া দেওয়া সভ্যতা পরস্পরের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছিল।' বোঝা যায়, পাশ্চাত্য এনলাইটনারদের

যুক্তি ও মানবতার প্রভাবকে স্বাগত জানাতেই তিনি এ কথা বললেন; কিন্তু মুসলমান ধর্ম-সংস্কৃতির শাস্ত্রীয় ডগ্‌মার নিচে যে লোক-সংস্কৃতির (সহজিয়া সুফি ধর্মের) ধারা ছিল এবং আমাদের ব্রাহ্মণ্য হিন্দুশাসিত সমাজের গভীরে নিপীড়িত শূদ্রাদি নিম্নবর্ণ-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে আউল-বাউলের ব্যাপক প্রভাব পরস্পর মিলেমিশে প্রায় একাকার হয়েছিল, সম্ভবত এই হিসাবটা মাথায় রাখেননি, যদিও অন্যত্র বলেছেন, উভয় সংস্কৃতির সমীকরণ খুব সামান্যই হয়েছে। কিন্তু ঘটনাটা সামান্য নয়। একদিকে ইসলামের মৌলানা গোষ্ঠীর ধাক্কায়, অপরদিকে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের ঠেলায় উভয় অংশেরই অনভিজাত নিম্ন-শ্রেণীর সাংস্কৃতিক জীবনে মিল হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। এমনকি ব্রাহ্মণ মানেই 'ভূদেব' ছিল না, ব্রাহ্মণসমাজ মানেই পণ্ডিত সমাজ ছিল না এবং সামাজিক (অর্থগত) মর্যাদা তাদেরই একচেটিয়া ছিল, এটাও ঠিক নয়, ব্রাহ্মণদের মধ্যেও ভাগ ছিল, 'ব্রাত্য'ও ছিল। কবিকঙ্কণ বলেছেন, শাস্ত্র-বিবেচনা করার ও ভারত-পুরাণ পড়ার অধিকারী ব্রাহ্মণদের পাশাপাশি 'মূর্খ বিপ্র' যাজন করত, চন্দন-তিলক পরে দেব-পূজার অধিষ্ঠান করত ও 'চাউলের বোঁচকা' বেঁধে ঘরে ফিরত। এমনকি প্রাচ্য স্বৈরাচারে বাঁধা স্বসমাজ ব্রাহ্মণদের 'কৌলিক মর্যাদা'রও নিকেশ করে ছাড়ত। কবিকঙ্কন বলেছেন: 'ধন লয় নৃপবর, প্রাণ লয় দণ্ডধর, জাত লয় জ্ঞাতি বন্ধুগণ।' আসলে এই সমাজে ধনপতি সদাগরের সামাজিক মর্যাদা ব্রাহ্মণদের চেয়ে কম ছিল না। দেখা যাচ্ছে, ব্রাহ্মণদের 'ভূদেব' কল্পনা মনুই করেছে, মুসলমান আমলে অর্থনৈতিক স্বার্থ ও সংস্কৃতির ঠোকাঠুকিতে কবিকঙ্কনের এই দলিলই ইতিহাস সম্মত ঘটনা। কই? কবিকঙ্কন তো আর একটি চানক্যের ছবি আঁকতে পারলেন না! হিন্দু যুগের সমাজ আর মুসলমান আমলে ভারতীয় সমাজের উৎপাদনগত অগ্রগতির স্তর ও শ্রেণী সম্পর্কের চরিত্র, স্বভাবতই এক ছিল না; এই কারণে, সমাজের অন্যান্য শোষিত শ্রেণীর সঙ্গে ব্রাহ্মণদেরও একাংশকে নেমে আসতে হয়েছিল, যেমন মৌলনা মুফ্‌তিদেরও বিশেষ করে ঔরঙ্গজেবের পর থেকে, ইউরোপীয় বণিকদের চাপে দুর্দশায় পড়তে হয়েছিল।

প্রসঙ্গতঃ, একটা মামলার ফয়সলা হওয়া দরকার। কাজি আবদুল ওদুদ, ডঃ রমেশ মজুমদার, এমনকি শ্রদ্ধেয় বিনয় ঘোষ মহাশয়ও আফশোষ করেছেন, পাশ্চাত্য রেনেসাঁসে যেমন প্রাচীন গ্রীক-লাতিনের পুনরুদ্ধার হয়েছিল, আমাদের বঙ্গ-জাগরণে তেমন হয়নি। আমরা প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতি থেকে কী ফিরিয়ে

আনব? নির্বিচারে সব? তা'হলে তো শূদ্রের কানে গরম শিসা ঢেলে দেওয়া, একলব্যের আঙুল কেটে গুরু দক্ষিণা দেওয়া কিংবা আরুণীর আলে শুয়ে গুরুর ক্ষেত বাঁচানোর ঐতিহ্যও ফিরিয়ে আনতে হয়। কাজেই **র‍্যাশনাল দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্ন** খারিজ করে এ প্রসঙ্গে আলোচনাই হতে পারে না। মিল্টন তো আর গ্রীক সভ্যতার দাস প্রথা আমদানী করেননি; তিনি প্রাচীন প্রজাতন্ত্রের নাগরিক আদর্শ খানিকটা ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। সে তো আমাদের রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রাচীন কালের বিশুদ্ধ শাস্ত্র ফিরিয়ে নিয়েই, যথাক্রমে সতীদাহের বিরুদ্ধে ও বিধবাবিবাহের পক্ষে আন্দোলন করেছেন। তাছাড়া যে সময়ে বেকনের বস্তুবাদী দর্শনের প্রয়োজন, সেই সময়ে কি প্রতিষ্ঠা করতে হবে সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়, আর ফিরিয়ে আনতে হবে বেদান্তের ভাববাদী কাল্পনিক শিক্ষা? এই প্রশ্ন তিনি ১৮২৩ সালে লর্ড আমহার্স্টকে করেছিলেন। রামমোহন তাঁর তুহ্‌ফা গ্রন্থে, দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে এবং মধুসূদন তাঁর ইংরাজী রচনায় যে হাফেজ প্রমুখ সুফি কবি দার্শনিকদের রচনার উল্লেখ করেছেন, তা কি ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার নয়?

উনিশ শতকের গোড়ায়, বিশেষ করে গ্রামীন উচ্চবর্ণের ও প্রভাবশালী অংশের পশ্চাৎপদতা ও কৌলিন্য সংস্কার প্রায় এক শতাব্দী পিছিয়ে ছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য 'আলোকপ্রাপ্ত'দের স্পর্শ-পাওয়া শিক্ষিত অংশ তখনো সযত্নে সুফি দর্শন ও ফার্সি ভাষা–সাহিত্যের ঐতিহ্য বহন করেছেন; এবং এই কারণেই তাঁরা পিছিয়ে থাকা উচ্চবর্ণের সম্ভ্রান্ত অংশের চেয়ে প্রায় এক শতাব্দী এগিয়ে থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করলেন। এ সব কথা বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আত্মজীবনী থেকে পিতৃদেবের স্বীকৃতিতে জানা যায়। এটা হওয়ার কারণ, রেনেসাঁসের মানবতা ও এনলাইটনারদের যুক্তিবাদের সঙ্গে, ভাববাদী সত্ত্বেও, সুফি কবি-দার্শনিকদের মানবতা ও বাস্তব জীবনবোধের কিছুটা মিল। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কালান্তর'-এ যখন মন্তব্য করেছেন, মোগল আমলে বহু ফার্সী শব্দ আমাদের কালচারে প্রবেশ করলেও, মুসলমান সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভাব আমাদের সমাজে তেমন পড়েনি, তখন স্বভাবতই কথাটা পুরোপুরি মানতে অসুবিধা হয়। সাদীর গুলিস্তাঁ ও বোস্তাঁ, কিংবা হাফেজ-গালীবের প্রভাব রামমোহন মধুসূদনের মধ্যে দীর্ঘ ঐতিহ্য সূত্রেই এসেছিল। ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর 'সামাজিক প্রবন্ধ'-তে বলেছেন: হিন্দু ধর্মের নিজস্ব থাক ভাগের ব্যাপারটা ছাড়া সাধারণ ভাবে হিন্দু-মুসলমানের ভাগাভাগির প্রশ্নটা আমাদের গ্রামসমাজে ছিল না; আরব দেশ

থেকে অথবা এদেশেরই কোন ভদ্র ও বিদ্বান মৌলভী এসে যদি মুসলমানদের উত্তেজিত করে তবেই সাময়িক উত্তেজনার বশে হিন্দুদের সংশ্রব ছাড়ার হিড়িক পড়ে যায়। ১৮২৮ সালে সৈয়দ আহমদ এ রকমটাই করেছিলেন। সে সব ঘটনা সাময়িক। কিন্তু ভেদ স্থায়ী ও রক্ষা করার জন্য ইংরাজ শাসক ভাড়াটিয়া গ্রন্থকারদের দিয়ে এই কথাই প্রচার করেছে যে, মুসলমান আমলে রাজা ছিল স্বৈরাচারী; তারা হিন্দুদের উপর অকথ্য অত্যাচার করেছে। এইভাবে হিন্দুদের মনে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ঢুকিয়ে মানুষে মানুষে প্রীতির সম্পর্ক নষ্ট করার চেষ্টা করেছে। আধুনিক ইংরাজী শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে এই জাতৃধর্মের ভেদ-বিদ্বেষ যত প্রবল, আগেকার ফার্সী জানা সদ্‌-ব্রাহ্মণদের মধ্যেও তার অর্ধেকও ছিল না। দেখা যাচ্ছে, সুফীবাদী ফার্সী-সাহিত্যের প্রভাব, নিচের দিকে তো বটেই, এমনকি উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যেও কাজ করেছিল, যাতে মানুষে মানুষে প্রীতির সম্পর্ক কিছুটা অন্ততঃ বজায় ছিল।

আমরা লক্ষ্য করেছি, কবি রঙ্গলাল যখন 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়' ঘোষণা করছেন, তখন হিন্দু-মুসলমানের সেই মিলিত মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭) পর ব্রিটিশ আমলা ও উপনিবেশবাদী তাত্ত্বিকরা বিচার বিভাগ ও আইন-কানুন ঢেলে সাজিয়ে ফার্সী-জানা মুসলমান আইনজীবীদের বাতিল করেছে, সরকারী প্রশাসন থেকে মুসলমানদের হয় নামিয়েছে, নয়ত ছাঁটাই করেছে; আর সেইসঙ্গে ইংরাজী স্কুল-কলেজে মোগল যুগের ইতিহাসকে সাম্প্রদায়িক ভেদের উপর রেখে লিখিয়েছে, পড়িয়েছে ও প্রচার করেছে।

মনুর স্মৃতিশাস্ত্র ও হিন্দু বর্ণাশ্রম-নির্ভর সমাজের নিচের তলায় মিশে যাওয়া আউল বাউলের লোকধর্ম-সংস্কৃতির সঙ্গে সহজিয়া মুসলমান সুফিদের বিরোধাত্মক প্রতিবাদী ধর্ম-দর্শনের প্রভাব যত কমই হোক, গুণগত বিচারে তার গণতান্ত্রিক মূল্য কম ছিল না। সাদী তাঁর গুলিস্তাঁ ও বোস্তাঁয় ধর্মের ভেদ ও মধ্যযুগীয় স্বৈরতন্ত্রের চেহারা-চরিত্র নিয়ে তামাশা করে বলেছেন: যদি কেউ খালি হাতে বাজার যায়, ভয় হয় মাথার পাগড়িটা না খুইয়ে আসে; তুমি জ্ঞান-বিচার কোথায় শিখলে? উত্তর—অন্ধদের কাছ থেকে, কারণ ওরা পরীক্ষা না করে পা রাখে না; ধর্ম কি? মানুষে মানুষে মেলামেশাই সবচেয়ে বড় আনন্দের, মানুষের সেবা ছাড়া অন্য কোন সাধন পদ্ধতি নেই—তসবী, নামাজ, পাটি বা দরবেশের পোষাকে নেই; স্বৈরাচারী রাজার ক্রোধের মুখে পড়া কোন মানুষকে বাঁচাতে যদি মিথ্যা বলতে হয় তবে সে মিথ্যা মঙ্গলের; দরবেশকে রুটি দিলে তার আধখানা সে দেয় অপর

গরীবকে, কিন্তু রাজা এক দেশের দখল পেলে, আর একটা দখলের মতলবে থাকে; কুকুর যখন আগন্তুকের কাপড় ছিঁড়ে দেয়, তখন সে কামড় সেই গৃহস্থের যে সেই কুকুরকে প্রতিপালন করে, প্রজা যখন উৎপীড়কের বিরুদ্ধে রাজার বিচার প্রার্থনা করে, তখন সেই উৎপীড়ন আসলে বিচারক রাজারই। ইরাণের হাফেজও রহস্যবাদী ও বিষাদ-বিরোধী কবি। তাঁর প্রভাবও ভারতীয় লোকজীবনে কম পড়েনি। ইকবালের কাব্য ও প্রেমচন্দের গল্প-উপন্যাসে তার সাক্ষ্য রয়েছে। হাফেজ বলছেন: মাদ্রাসার বহস্ (শাস্ত্র) আলোচনা, তর্কবিতর্ক, বড় বড় মসজিদ বা স্তম্ভে কী লাভ, যদি না মনটা জ্ঞান আহরণের মত ও চোখটা দেখার মত হয়? ওরে স্ফূর্তিবাজ ছন্নছাড়া তিতির, বিড়াল নামাজ পড়ছে দেখে পুলকিত হ'য়ো না; অত্যাচারীর অনুসরণকারী হ'য়ো না, এ ছাড়া অন্য যা ইচ্ছা কর, কারণ আমার কাছে এ ছাড়া অন্য কিছু পাপ নেই; যদি আমার মস্তক যায় যাক, তবু আমার অন্তর থেকে তোমার করুণা যাবে না। দেখা যাচ্ছে, রাজনীতি ও বাস্তববোধের পক্ষে এবং ধর্মের গোঁড়ামি ও মায়াজালের বিরুদ্ধে এনলাইটনারদের সঙ্গে এইসব সুফী কবি দার্শনিকদের অনেকটা মিল রয়েছে।

তাহলে উনিশ শতকের নবজাগরণে **কোন্ ঐতিহ্যের সঞ্চারণ** স্বাভাবিক ও উপযুক্ত ছিল? প্রাচীন আর্যামি, হিন্দুত্ব বা দুষ্মন্তের 'অলৌকিক বিস্মরণ'? এ সবের ঐতিহ্য কি, ইউরোপীয় মধ্যযুগের গ্রীক-লাতিনের মত, আমাদের ইতিহাসে নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল? প্রশ্ন হল, ধর্মের ঐতিহ্যরূপে কোনটাকে গ্রহণ করবো? অলৌকিক ভাববাদ? না লৌকিক বা বস্তুবাদী উপাদানের উত্তরাধিকার?

ইউরোপে উনিশ শতকের প্রথম দিকে, যখন বুর্জোয়া অর্থব্যবস্থা ও মূল্যবোধ পচতে শুরু করছিল, তখন স্বভাবতই তার উপরিথাকে বেকন-লক-হব্স্ থাকতে পারে না; সে যায়গায় বার্কলে, স্পেনসার ও কোঁৎ-এ প্রমুখ দার্শনিকদের 'সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতা' ঢুকিয়ে প্রচার সুরু হল, শিক্ষা-সংস্কৃতিকে 'রাজনীতিমুক্ত' রাখতে হবে। অথচ কোঁৎ-এ বলছেন, সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ রাখার দায়িত্ব হল, শিল্পপতি, বৃহৎ ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্ক-মালিকদের; তাঁরাই সামাজিক ন্যায়বিচার রক্ষা করবেন; আর পারিবারিক ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ও পবিত্রতা রাখবেন নারীরা, যাঁরা অবিচ্ছেদ্য বিবাহ ও বৈধব্য মেনে চলবেন; কিন্তু কোনরকম রাজনৈতিক ও নাগরিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেবেন না। মার্কস এইসব 'Positive philosopher'দের সম্পর্কে বলেছেন: "The positive philosophers tried to make philosophy subservient to religion by proclaiming

divine revelation the only source of positive knowledge. They called negative every philosophy which recognised rational cognition as its source."

লেনিন এইসব তথাকথিত রাজনীতিহীন দর্শন-সংস্কৃতি সম্পর্কে 'বুর্জোয়া ভণ্ডামি' বলেছেন। কিন্তু এদের সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতার জাল বিস্তারের প্রয়াস থাকলেও, গীর্জা ও যাজকতন্ত্রের আগল ভেঙে যে-সমাজ যুক্তি ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বাদ পেয়েছে, প্রযুক্তি বিজ্ঞান ও গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটাচ্ছে, সেই সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে মহান ইংরাজ কবি শেলী কোন ঐতিহ্যের পতাকা বহন করেছেন? ১৮১৯ সালে নেপোলিয়নীয় প্রতিক্রিয়ার প্রতিবাদে তিনি লিখেছেন:

Rise like lions after slumber
In Unvanquishable number
Strike your chains to earth like dew
Which in sleep have fallen on you—
Ye are many—They are few." ('পিটারলু ম্যাসাকার')

এর মধ্যে তিনি ইংলণ্ডের শ্রমিকশ্রেণীর চার্টিস্ট আন্দোলনেরই (১৮৩২) নান্দীগান করলেন।

॥ তিন ॥

আমাদের দেশে তখন জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী ও তার প্রগতিশীল ভাবধারা চোখ মেলে তাকায়নি; তখনকার বণিকী পুঁজিবাদী ও সামন্তবাদী সমাজে পাশ্চাত্য 'এনলাইটেনমেণ্ট'-এর প্রদীপ হাতে দাঁড়ালেন নবজাগরণের পথিকৃৎ রামমোহন। স্মরণ রাখা দরকার, এর আগে, ইংলণ্ডের জের থেকে, এদেশেও "অবাধ-বাণিজ্য-এর শিল্প-পুঁজি কায়েমের পক্ষে ও তার অনুকূল উপনিবেশিকের প্রয়োজনে কয়েকজন অগ্রণী ইংরাজই সর্বপ্রথম সংবাদপত্র, ইতিহাস লেখা, ভূগোল বিজ্ঞানের শিক্ষা প্রচারে ও ধর্মীয় কু-সংস্কারের বিরুদ্ধে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু বণিকী-পুঁজির সমর্থক ও এদেশের পশ্চাৎপদ রক্ষণশীল ট্রাডিশন বজায় রাখতে সক্রিয় কর্নওয়ালিস ও হেস্টিংসের দলবল তাতে বাধা দিয়েছিলেন। ১৭৮০ সালে হিকি সাহেবের 'বেঙ্গল গেজেট' হেস্টিংস বন্ধ করে দেন; ১৭৯৩ (যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হচ্ছে) উইলিয়ম কেরীকে গোপনে ডেনমার্কের এক জাহাজে করে শ্রীরামপুরে আসতে হয়েছিল এবং ১৭৯৮ সালে চার্লস ম্যাকলিসন

প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গল হরকরা' ও 'ইণ্ডিয়া গেজেট' কে উদার বুর্জোয়া আদর্শের জন্য লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল।

রামমোহন নবাবী আমলের পারিবারিক ও আরবী-ফারসী-সংস্কৃতের উত্তরাধিকার নিয়ে যখন কলকাতায় এলেন তার ছয় বছর পর বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় দত্তের জন্ম হয়েছিল। কলকাতায় এসেই রামমোহন দ্রুত ইংরাজী ভাষা, ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী, বেকন-লক-হবস ও ম্যাৎসিনি-গ্যারিবল্ডীর স্বাধীনতার দর্শন প্রভৃতি পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে উঠলেন। অতঃপর ১৮১৮-১৯ সালে তিনি যখন একের পর এক প্রচার পুস্তিকা লিখে, সতীদাহ প্রথা বন্ধের জন্য বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়ে প্রতিপন্ন করেছেন যে, সহমরণ অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য শ্রেষ্ঠ, তখন একদিকে মৌলনা সৈয়দ আহমদ সারা উত্তর ভারতে উগ্র ইসলাম ধর্মমত প্রচার করে কলকাতায় এসে সাম্প্রদায়িক ধর্মাচারের জোয়ার বহিয়েছেন, অপরদিকে রক্ষণশীল হিন্দু পণ্ডিত সমাজ ধর্মরক্ষায় মারমুখী হয়ে উঠেছেন। তাছাড়া, স্মরণ রাখা দরকার, রামমোহনের সময় থেকে বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত ইংরাজ আদালতে হিন্দু ও মুসলমান আইনের জন্য মৌলবী ও পণ্ডিত উপস্থিত থাকতেন। ১৮৫৫ সাল নাগাদ লেখা 'বিধবা বিবাহ বিষয়ক' বইতে বিদ্যাসাগকেও, রামমোহনের মত উদার মানবিক আবেদনের সঙ্গে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ব্যবহার করতে হয়েছিল। এই পর্বে রামমোহন-বিদ্যাসাগরকে মধ্যযুগীয় কু-সংস্কারের বিরুদ্ধে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা নিয়ে নামতে হল কেন, অর্থাৎ বিশুদ্ধ যুক্তির হাতিয়ারে বৈপ্লবিক আঘাত না হেনে এ ধরণের 'আপোসধর্মী' পদ্ধতি অবলম্বন করলেন কেন, সেটা বুঝতে হলে তখনকার সমাজ-প্রকৃতির বাস্তবতা ও শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিবেশটা জানা দরকার। ১৮১৭ সালের হিন্দু কলেজ নিঃসন্দেহে অবাধ-বাণিজ্যের শিক্ষা-সংস্কৃতির সহায়ক হয়েছিল; কিন্তু তারও সীমাবদ্ধতা ও স্ব-বিরোধিতা পুরোমাত্রাতেই ছিল; কারণ ঘাত-প্রতিঘাতের গর্ভ থেকে তখন সবেমাত্র জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর ভ্রূণাবস্থা বলা চলে। তখন মুসলমান সম্প্রদায় এই কলেজের বাইরে ছিল এবং ইংরাজীর সঙ্গে সংস্কৃত শাস্ত্র-সাহিত্যও পড়ানো হোত। ১৮২৮ সাল থেকে ১৮৫১-৫২ সাল পর্যন্ত অতিনব্য (ডিরোজিয়ানস) ও অতি-প্রাচীন পন্থীদের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক সংগ্রাম চলেছিল, তাতে **রামমোহন-বিদ্যাসাগর বাস্তববাদী পদক্ষেপ** নিয়ে (মধ্যপন্থা) বিচ্যুতি বাঁচিয়ে চলার দৃষ্টান্ত রেখেছিল। ১৮২৮ সালে মধ্যযুগীয় আচারসর্বস্বতা, পৌত্তলিকতা ও সাম্প্রদায়িক ভেদের বিরুদ্ধে রামমোহন

যখন 'ব্রহ্মসভা' স্থাপন করলেন, তখনই ডিরোজিয়ানরা বিশুদ্ধ যুক্তিবাদের প্রেরণায় সরাসরি 'এ্যাকাডেমিক সভা' স্থাপন করলেন ; পরের বছর উদারপন্থী বুর্জোয়াদের মুখপাত্র বেন্টিঙ্ক যখন সতীদাহ রোধের আইন পাশ করলেন, তখনই রাধাকান্ত দেবের হিন্দু রক্ষণশীল দল 'ধর্মসভা' প্রতিষ্ঠা করে রণে নামলেন ; এই সময়ে লড়াইটা আরও জমল যখন ডাফ সাহেব রামমোহনের স্কুলকে সামনে রেখে খ্রীশ্চান ধর্ম-প্রচারে নেমে পড়েছেন। রক্ষণশীল শক্তি, অতঃপর রামমোহনকে খ্রীশ্চান ধর্মের গুপ্তচর বানিয়ে এবং অতিনব্য ইয়ংবেঙ্গল বা ডিরোজিয়ানদের সুরাপায়ী লম্পট বলে প্রচার করে নিজেদের শক্তিকে এমনই জোরাল ও উগ্র করতে পেরেছিল যে, এমনকি হিন্দু কলেজ থেকে ডিরোজিওর মত প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বকে হটাতে সক্ষম হয়েছিল (১৮৩১)। অবশ্য কিছুদিন আগেই, সতীদাহ প্রশ্নে, সম্ভবতঃ সাময়িক হতাশার কারণেই, রামমোহন বিলাত যাত্রা করেছেন। যাইহোক, বোঝা যায়, হিন্দু কলেজের সরষের মধ্যেও ভূতের দাপট কত প্রবল হয়ে উঠেছিল।

আসলে ব্রিটিশ শাসক এদেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ অবাধ হতে না দেওয়ার জন্যই, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও তার পরগাছা ডাল-পালাকে গজিয়ে উঠতে এবং তারই অনুগামী ঝোঁকগুলোকে রেখে-ঢেকে রাখতে সচেষ্ট ছিল বলেই, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রামমোহন-বিদ্যাসাগরকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আসন্ন জাতীয় জাগরণের উপযোগী দৃষ্টি রচনা করতে হয়েছে, তার জন্য কঠিন সংগ্রাম ও মূল্য দিতে হয়েছে, যেমন করে অষ্টাদশ শতকের রুশো-দিদেরো ও ভলটেয়ার প্রমুখ দার্শনিকেরা **আসন্ন বিপ্লবের জন্য মানুষের মন** তৈরী করে গেছেন এবং যার উত্তরসাধনায় উনিশ শতকের গোড়ায় নেপোলিয়নীয় স্বৈরাচারের অন্ধকার দিনগুলিতে, সারা ইউরোপে যখন ধর্মদ্রোহীতা বা অধর্মাচরণের দায়ে আদালতে বিচার হচ্ছে, তখন ইংরাজ কবি শেলী তাঁর 'Queen Mab' কবিতায় (বহুদিন নিষিদ্ধ ছিল) বলেছেন :

> "I belong to those who have struggled
> And with resolute will
> Vanquished earth's pride and meaness,
> Burnt the chains
> The icy chains of customs and have shone
> The day-stars of their age"

আমাদের দেশে 'এর প্রায় একশ' বছর পরে সময়ের অগ্রগামী বিপ্লবী শক্তিকে ভাষা দিয়েছেন বিদ্রোহী নজরুল ও বিপ্লবী কবি সুকান্ত।

॥ চার ॥

কিন্তু প্রশ্ন হল, সেই উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার 'আলোকপ্রাপ্ত' বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম প্রতিনিধি রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় দত্ত প্রমুখ মনীষীগণ কেন সেই সময়েই ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে নিপীড়িত কৃষক শ্রেণীকে বিস্ফোরিত হওয়ার ডাক না দিয়ে, কেবল সতীদাহ, স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবাবিবাহ ধরণের সমাজ সংস্কার নিয়ে ব্যস্ত থাকলেন? তা-ও আবার শাস্ত্র ব্যাখ্যার নজিরে?

রামমোহন বিদ্যাসাগরের শাস্ত্র ব্যাখ্যার প্রশ্নে পরে আসছি। আগে, ঐতিহাসিক পরিস্থিতির বিচারে, অর্থাৎ জাতীয় ধনতন্ত্র যখন আঁতুড় ঘরেই আসেনি, সেই ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী সমাজে, পাশ্চাত্য যুক্তি দর্শনে প্রদীপ্ত এই দুই মণীষীর কর্মসাধনা কতটা 'প্রতিক্রিয়াশীল' দেখা যাক। মার্কস-এঙ্গেলস 'বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ' গ্রন্থে ওয়েন ফুরিয়ে, সাঁ সিমোঁ প্রমুখ কল্পবাদী সমাজতন্ত্রীদের সম্পর্কে, বলেছেন: 'Since social relations were not yet developed enough at the time for the working class to constitute itself as a political party, the first socialist, (Fourier, Owen, Saint-Simon etc) had had to confine themselves to dreams of a future model society and to censure all attempts as strikes, coalitions and political actions undertaken by the workers to some what improve their situations." দেখা যাচ্ছে, বুর্জোয়া বিপ্লবের পরই, ধনতন্ত্রের বিকাশের প্রাথমিক স্তরেই, এই সব কল্পবাদী দার্শনিকেরাও শ্রমিক ধর্মঘট প্রভৃতি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সুরু করার ডাক দেননি এবং তবু মার্কস-এঙ্গেলস বলেছেন, 'We have no more right to disavow these patriachs of socialism'. এঙ্গেলস তাঁর বিখ্যাত 'এ্যান্টিডুরিং' গ্রন্থেও এই প্রসঙ্গে ফুরিয়ে, ওয়েন প্রমুখের অবদানকে লঘু ও ব্যঙ্গ করার জন্য, ঐতিহাসিক বিকাশের স্তর সম্পর্কে বাস্তব-বোধবর্জিত **অতিবিপ্লবী গবেষক ডুরিং-কে** জোর একহাত নিয়েছেন। যেখানে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবটা সুরু হওয়ার উপযুক্ত ক্ষেত্রই প্রস্তুত হতে পারছে না, সেখানে ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক? অথবা

কৃষি বিপ্লবের ডাক? এ তো একলাফে এক শতাব্দী বা অনিবার্য একটি বৈপ্লবিক স্তরকে টপকে একেবারে সমাজতন্ত্রের যুগে এসে বোকার মত দাঁড়ানো!

ভারত প্রসঙ্গে মার্কস বলেছেন: "আরব, তুর্কী, তাতার মোগল যারা পর পর ভারতবর্ষ দখল করেছে, দ্রুত তারা হিন্দুভূত (Hinduised) হয়ে গিয়েছিল। ইতিহাসের চিরকালীন নিয়ম অনুযায়ী পশ্চাৎপদ জাতির বিজয়ীরা বিজিতের উন্নততর সভ্যতার দ্বারা বিজিত হয়েছিল। ব্রিটিশরাই প্রথম বিজয়ী যারা ভারতের চেয়ে উন্নততর সভ্যতা নিয়ে এসেছিল এবং সেই কারণেই ভারতের সভ্যতায় লীন হয় নাই।" মুসলমান আমলের মূল্যায়নে রবীন্দ্রনাথ 'কালান্তর' প্রবন্ধে কিছুটা অন্যভাবে প্রায় এ রকম মন্তব্যই করেছেন। আওরঙ্গজেবের সময়ে ফরাসী পর্যটক বার্নিয়ার এসে সতীদাহ সম্পর্কে যা দেখেছেন ও বুঝেছেন তাতে বলেছেন, হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসে হাত না দিয়ে অন্যভাবে মুসলমান শাসকরা এই প্রথা বন্ধ করতে চেষ্টা করেছিলেন; স্বাধীন হিন্দু রাজ্যে এই প্রথা বেশী প্রচলিত ছিল। তাঁর মনে হয়েছে, শাস্ত্রীয় বিধান পেলে অনেক স্ত্রীলোক সহমরণ না ঘটিয়ে বেঁচে থাকতে পারতেন। বলা বাহুল্য, ইংরাজী শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাব না পেলে এই রকম মধ্য-যুগীয় কু-সংস্কারের বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় বিচারের অবকাশ হওয়া সম্ভব ছিল না। বিধবা বিবাহ সম্পর্কেও দেখা যায়, ইসলামের অনুমোদন থাকা সত্ত্বেও, লোকাচার এমনই শিকড় গেড়েছিল যে, অভিজাত মুসলমান সমাজে আকবরের আমলেও বিধবা বিবাহ দিতে ও বাল্যবিবাহ বহুবিবাহ বন্ধ করতে ফরমান জারি করতে হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের প্রবর্তনায় রাতারাতি এই মধ্যযুগীয় সামন্ত-সমাজ বদলে যায়নি, বরং জমিদারী ব্যবস্থা ও তার শাখা-প্রশাখায় (মধ্যস্বত্বভোগী পত্তনিদার, তালুক-দার, মহাজন প্রভৃতি) জট আরও নানাভাবে পাকিয়ে ছিল; তাই নারীর অধিকার স্ত্রীশিক্ষা, পাঠক্রম সহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে রক্ষণশীল শক্তির পশ্চাৎপদ পুনরুজ্জীবনবাদী টান প্রবল ছিল; জাতীয় বুর্জোয়া সমাজের বিকাশও যত দুর্বল ও শ্লথ থেকেছে, উদার গণতান্ত্রিক ও মানবিক অধিকারের গতিও ততো মন্থর হয়েছে। মনে রাখা দরকার, তখন সবেমাত্র রেলপথ বসেছে, শহরাঞ্চলে দু-একটি কলেজ হয়েছে। পুরোন সামন্ত-সমাজের লোকাচার, অন্ধ ভক্তি বা বিশ্বাসের স্থানে, নতুন পুঁজিবাদী সমাজের যুক্তি, বিজ্ঞান, বস্তুবাদী দর্শন ও শ্রেণী বোধের তারতম্য তখনই আসবে কি করে? এরই মধ্যে ১৮২৩ সালে লর্ড আমহার্স্টকে লেখা পত্রে রামমোহন যে এদেশের শিক্ষায় বেকন প্রমুখ বস্তুবাদী দার্শনিকের রচনা রাখার সুপারিশ করেছিলেন, এদেশের শিক্ষায় গণিত, প্রকৃতিবিজ্ঞান, রসায়ন, ও অন্যান্য

ব্যবহারিক বিজ্ঞান দিতে চেয়েছিলেন, ১৮৫৩ সালে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যসূচীতে ব্যালাণ্টাইন অনুমোদিত বার্কলের সাবেকী ভাববাদী দর্শনের (এনকোয়ারি) জোরাল প্রতিবাদ করে যে বলেছিলেন 'while teaching these in the Sanskrit courses we should oppose them by sound philosophy in the English Course to counteract their influence,' এইসব ভূমিকায় কি **মার্কস-কথিত 'এশীয় সমাজের উজ্জীবন মূলক'** অবদান থেকে যায় নি ? উল্লেখযোগ্য যে, লেনিনকেও তাঁর 'মেটেরিয়ালিজম এণ্ড এম্পিরিও ক্রিটিসিজম' (১৯২০) গ্রন্থে বার্কলের উদ্ভট ভাববাদী চিন্তাধারার তীব্র সমালোচনা করতে হয়েছে।

এবার সতীদাহ ও বিধবাবিবাহের প্রশ্নে শাস্ত্র বিচারের পদ্ধতি, সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, কতটা সঠিক দেখা যাক। যে সময়ে পুঁজিবাদী সমাজ ও শ্রেণী তৈরী হয়নি, মধ্যযুগীয় সামন্ত সংস্কার পুরোদস্তুর শিকড় গেড়ে রয়েছে এবং তার সঙ্গে নতুন জমিদারী ব্যবস্থা ও তার সাংস্কৃতিক রক্ষাকবচগুলির জট দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, সেই সময়ে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর শাস্ত্র বিচারের পথে ধর্মনির্ভর সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। মাও সে-তুঙ বলেছেন: "If we tried to go on the offensive when the masses are not yet awakened, that would be adventurism....All work done for the masses must start from their needs and not from any individual, however well intentioned. It often happens that objectively the masses need a certain change, but subjectively they are not conscious of the need, not yet willing or determined to make the change. In such situations, we should wait patiently."

রামমোহনের মত মোতাজেলা দর্শনে বিশ্বাসী ও সকল ধর্মমতকে, এমনকি বেদকেও অনিত্য ঘোষণাকারী সমাজনেতা কেন শাস্ত্রের দোহাই পেড়ে সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামলেন, এবং তাঁর প্রায় তিন দশক পরেও, বিদ্যাসাগরের মত সকল ধর্মমতেই অবিশ্বাসী কেন বিধবাবিবাহ আন্দোলনে শাস্ত্র ব্যাখ্যার উদ্যোগ নিলেন, এ প্রশ্ন কেবল আজকের 'অতি বিপ্লবী বস্তুবাদী'রাই নয়, তাঁর সমকালের সামন্ত-বুর্জোয়া সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রও করেছেন: "যদি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শাস্ত্রে বিশ্বাস ও ভক্তি না থাকে, তবে সেই শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া কপটতা।" এই বলে তিনি 'দেবী চৌধুরাণী'তে পুরুষকে শিখিয়ে দিলেন—

'স্ত্রীলোককে অত সম্মান করিতে নাই।' 'ধর্মতত্ত্ব' বইয়ে গুরু-শিষ্য সংবাদে বললেন: 'সাম্য কি সম্ভবে? পুরুষ কি প্রসব করিতে পারে, না শিশুকে স্তন্যপান করাইতে পারে?' অর্থাৎ 'সাম্য' লেখার পরই প্রসব করা ও শিশুদের স্তন্যপান করানোকেই স্ত্রীজাতির একমাত্র কর্তব্য বলে নির্দেশ করেছেন।

পাশ্চাত্যের পূর্ণ বুর্জোয়া সমাজে 'কমিউনিষ্ট ইশতেহার' রচনার একুশ বছর পরও, ইংলণ্ডে চার্টিস্ট আন্দোলনের দমনের পর এবং প্যারী কমিউনের মাত্র দু বছর আগে, মিল তাঁর 'Subjection of Women' (১৮৬৯) গ্রন্থে নারীদের পারিবারিক ও সামাজিক অসুবিধাকে বিচ্ছিন্ন বা 'সলিটারী' সমস্যা বলে নির্দেশ করেছেন। এই ঘটনার প্রায় তিন দশক আগে রামমোহন আমাদের দেশের সামন্ত আধিপত্যের সমাজে দাঁড়িয়ে সতীদাহের বিরুদ্ধে শাস্ত্রের বিচার তুলে বললেন: 'যে দেশের পুরুষ মৃত্যুর নাম শুনিলে মৃতপ্রায় হয়, তথাকার স্ত্রীলোক অন্তঃকরণের স্থৈর্য দ্বারা স্বামীর উদ্দেশ্যে অগ্নিপ্রবেশ করিতে উদ্যত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দেখেন, অথচ কহেন, তাহাদের অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য নাই।'

আসলে 'সতীদাহ' থেকে 'বিধবাবিবাহ' পর্যন্ত প্রায় অর্ধশতাব্দী জুড়ে সমাজে নারীর স্থান, অধিকার ও স্ত্রী-শিক্ষার হাল কেমন ছিল, এই বক্তব্য থেকে তো বটেই, তখনকার 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'সোমপ্রকাশ.' 'বামাবোধিনী' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' লিখেছে যে, তাঁরা বাংলার স্ত্রীজাতির কলেজী উপাধি পাওয়াকে বিশেষ মঙ্গলের ও উন্নতির নিদর্শন বলে মনে করেন না; তারা উচ্চ শিক্ষা পেলে পুরুষদের মত ধর্মে অবিশ্বাসী ও সুনীতি বর্জিত হয়ে যাবে। 'সোমপ্রকাশ' তার সম্পাদকীয়তে (২৯শে মে, ১৮৬৫) স্ত্রীশিক্ষার বাধা হিসাবে সচেতনতার অভাব. বাল্য বিবাহ, জাতিভেদ প্রথা ইত্যাদির প্রশ্ন তুলেছেন। ১৮৬৮ সালে 'বামাবোধিনী' পত্রিকা বেথুন স্কুল সম্বন্ধে বলেছে: 'আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে, এ দেশের সর্ব-প্রধান বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে এক্ষণে মাত্র ৩০টি ছাত্রী অধ্যয়ন করিতেছে।' উল্লেখযোগ্য, যে, তখনও ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়ে বৌরা পর্যন্ত প্রকাশ্য রাজপথে, নিজেরা তো দূরের কথা, পুরুষদের সঙ্গেও বার হত না। ১৮৬৭ সালে, বেথুন স্কুল কমিটির সদস্য থাকাকালীনই মেয়েদের নর্মাল স্কুল (টিচার্স ট্রেনিং) স্থাপনের পরিকল্পনাকে অবাস্তব আখ্যা দিয়ে তখনকার ছোট লাট উইলিয়ম গ্রে-কে বিদ্যাসাগর যে চিঠি দেন তাতে বলেছেন: 'সমাজের বর্তমান অবস্থা ও দেশবাসীর মনোভাব এরূপ প্রতিষ্ঠানের পরিপন্থী......সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা যখন অবরোধ-প্রথা

ভঙ্গ করিয়া দশ-এগার বছরের বিবাহিতা বালিকাকেই বাড়ী হইতে বাহির হইতে দেয় না, তবে ইহা নিঃসন্দেহ যে, অন্তঃপুর ছাড়িয়া সাধারণ শিক্ষয়িত্রীর কাজে নামিয়াছে বলিয়াই তাহারা সন্দেহ ও অবিশ্বাসের পাত্রী হইবে, ফলে অনুষ্ঠানের সাধু উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে……আমার দেশবাসীর সামাজিক কু-সংস্কার যদি অলঙ্ঘনীয় বাধারূপে না দাঁড়াইত, তাহা হইলে আমিই সকলের আগে এ প্রস্তাব অনুমোদন করিতাম।'

দেখা যাচ্ছে, বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ্ মিল সাহেবের ব্যাখ্যার মত, সমাজে নারীর সমস্যাটা বিচ্ছিন্ন বা 'সলিটারী' নয়, প্রশ্নটা **সমাজের অর্থ ব্যবস্থার স্তর ও গোটা সমাজের মনোভাবের** (Superstucture) সমস্যা। এঙ্গেলস তাঁর 'জার্মানীর কৃষক যুদ্ধ' গ্রন্থে বলেছেন: গ্রীক ও রোমান যুগ থেকে রেনেসাঁস পর্যন্ত যে মাঝের যুগ, সেই মধ্যযুগে সব কিছুই প্রায় নতুন করে আরম্ভ হয়েছিল; তারা প্রাচীন সভ্যতা, প্রাচীন দর্শন, রাজনীতি, ব্যবহারশাস্ত্র সবকিছুই শ্লেট থেকে মুছে দিয়েছিল। যাজকরাই বিদ্যার্জনের একচেটিয়া অধিকার পেয়েছিল, শিক্ষা ব্যাপারটাই ধর্মশাস্ত্রের শিক্ষায় দাঁড়াল। যাজকদের কাছে রাজনীতি ব্যবহারশাস্ত্র অন্যান্য বিজ্ঞানের মত ধর্ম শাস্ত্রীয় বিদ্যার শাখা হিসাবে রয়ে গেল। গির্জার নীতি (ডগমা) হতো রাজনৈতিক স্বতঃসিদ্ধান্ত……এ কথা পরিষ্কার যে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার আক্রমণ এবং সমস্ত বিপ্লবী সামাজিক ও রাজনৈতিক মতবাদ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এবং যুগপৎ ছিল প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদ (হেরেসি)। বর্তমান যে সমাজব্যবস্থা তাকে আক্রমণ করার পূর্বে তার পুণ্য ও পবিত্র চেহারার জৌলুস শেষ করে তার নগ্ন চরিত্রকে লোক সম্মুখে উপস্থিত করার প্রয়োজন ছিল….প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধবাদ (হেরেসি) গির্জা ও তার ডগ্‌মার আরও বেশী বিকাশকে অধঃপাত হিসাবে দেখে। এ রকম বিরুদ্ধ-বাদ আনুষ্ঠানিক চেহারায় (Form) প্রতিক্রিয়াশীল।

কাজেই, যে সময়ে আমাদের দেশে মার্কস কথিত 'বর্ণাশ্রমের বাধা' ভাঙার প্রয়োজন ছিল এবং মধ্যযুগীয় কু-সংস্কার ও ধর্মীয় আচার–সর্বস্ব সমাজের নগ্ন চেহারা উন্মোচন করার প্রয়োজন ছিল, এবং যে সময়ে বুর্জোয়া ব্যবস্থা নিতান্তই কাঁচা স্তরে রয়েছে, সেই সময়ে প্রাচীন ভারতের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যায় (ফর্মে প্রতিক্রিয়াশীল হলেও) **হেরেসি** ঘটানো রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের পক্ষে বাস্তবসম্মত পদ্ধতি হয়েছিল। বুর্জোয়া অর্থব্যবস্থার বিকাশ ও পরিণতি যেমন ও যতটা হবে, সামাজিক উৎপাদনে নারীকে টেনে এনে তার মুক্তির পথ ততোই প্রশস্ত হবে,

যদিও সমাজের ইতিহাসে যতদিন উৎপাদনের উপায়ে ব্যক্তিগত মালিকানা থাকবে, ততদিনই নারীর দাসত্ব থাকবে। এর অবসানেই নারীর পূর্ণ মুক্তি সম্ভব। তবু এরই মধ্যে যে আমরা মাইকেলের 'প্রমিলা তারা কৈকয়ী'কে পেয়েছি, রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' ও গোরা, চোখের-বালি, ঘরে-বাইরে চতুরঙ্গ উপন্যাসের নারীচরিত্র পেয়েছি, শরৎচন্দ্রের 'অভয়া-সুনন্দা-সন্ধ্যা'দের পেয়েছি, তা পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী চিন্তাধারা ও সমাজের বুর্জোয়া বিকাশেরই ফল; আবার বঙ্কিমী নারীরাই মাইকেলের ভানুমতী-দুঃশলা, গিরিশচন্দ্রের জনা ছাড়া অন্যান্য নারীচরিত্র এবং শরৎচন্দ্রের বিন্দু-শুভদা-বন্দনারা জমিদারী স্বার্থের ভিত ও স্পেনসার কোঁৎ-এ-মিলের ভাববাদী দর্শনের প্রতিফলন।

এই প্রসঙ্গে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আরও একটা মূল্যবান দিক স্মরণ রাখা দরকার। উনিশ শতকের শেষ দিকে, পচনশীল পাশ্চাত্য বুর্জোয়া দর্শনে যখন ধর্ম ও বিজ্ঞানের চোলাই হচ্ছে, এবং তারই গাঁজলায় জারিত বিদ্যুতের সঙ্গে টিকির মিল (শশধর তর্কচূড়ামণি) ও মহাকাশ ভ্রমণের সঙ্গে পীর পয়গম্বরের স্বর্গরাজ্য ভ্রমণের মিল (মৌলানা মৌদুদীপন্থীদের) দেখানো হচ্ছে, তখন মাইকেলের বুড়ো শালিকদের ঘাড়ে রোঁ দেখানো, কুলীনদের জামাই ব্যারাকে (বারিক) ঢুকিয়ে দীনবন্ধুর তির্যক ব্যঙ্গ বেঁধানো এবং সেই সময়ের হিন্দু ধর্ম-সমাজের ও সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণী-স্বার্থের ভয়ংকর আধিপত্যের মাঝে দাঁড়িয়ে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে'র প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার পক্ষে বই প্রকাশ (১৮৬৮), অন্ততঃ attitude-এর দিক থেকে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের প্রকাশ তো বটেই! তার সঙ্গে, দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' ছাড়াও, ১৮৭২ সালে লালবিহারী দে'র 'গোবিন্দ সামন্ত' (যা পড়ে ১৬৮১ সালে চার্লস ডারউইন 'শিক্ষামূলক' বলে অভিনন্দিত করেছেন) এবং ১৮৯০ সালে লেখা মীর মশারফ হোসেনের 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'র (নীল পীড়নও প্রতিরোধের কাহিনী) ঐতিহ্য অবশ্যই স্মরণ রাখা দরকার।

॥ পাঁচ ॥

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে (১৯১৪-১৮) রবীন্দ্রনাথ 'শূদ্রধর্ম' প্রবন্ধে, আমাদের দেশের ধর্মশাস্ত্রের আধিপত্য ও তার জন্য গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসম্পূর্ণতার অভিশাপ জাতীয় জীবনের কাঁধে কী মর্মান্তিক জোয়াল চাপিয়ে রেখেছে এবং পাশ্চাত্য দেশগুলির শ্রমজীবী শ্রেণী ধর্মের বাধামুক্ত গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় কী ভাবে ধর্ম আন্দোলনের কাঁপন জাগিয়ে পরজীবী শ্রেণীর স্থিতস্বার্থে আঘাত করছে, এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে বলেছেন: "যে দেশে জীবিকা অর্জনকে ধর্ম-

কর্মের সামিল করে দেখে না, সে দেশেও নিম্নশ্রেণীর কাজ বন্ধ হলে সমাজের সর্বনাশ ঘটে।........ আজকাল মাঝে মাঝে যখন সেখানকার শ্রমজীবীরা সমাজের সেই গরজের কথাটা মাথা নাড়া দিয়ে সমাজের নিষ্কর্মা বা পরাসক্ত বা বুদ্ধিজীবীদের জানান দেয়, তখন সমাজে একটা ভূমিকম্প হয়। তখন কোথাও বা কড়া রাজ্য শাসন, কোথাও বা তাদের আর্জি-মঞ্জুরির দ্বারা সমাজ রক্ষার চেষ্টা হয়।.... আমাদের দেশে বৃত্তিভেদকে ধর্ম শাসনের অন্তর্গত করে দেওয়াতে এ রকম অসন্তোষ ও বিপ্লব প্রচেষ্টার গোড়া নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এতে করে জাতিগত কর্মধারাগুলির উৎকর্ষ সাধন হয়েছে কি না ভেবে দেখবার বিষয়।" বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ আন্তর্জাতিক পটভূমিতে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সমাজের ঐতিহাসিক স্তরের পার্থক্যটি ধরার চেষ্টা করেছেন, এবং ভারতের 'অধিকাংশ শূদ্রশ্রেণী'র মুক্তির প্রশ্নকে চাপা দিয়ে জাতীয় জাগরণ বা মুক্তির সমস্যাকে ভাবতে আদৌ রাজী নন। এই চিন্তাধারার একটা ঐতিহ্য রয়েছে; তা বামদিকের ডিরো-জিয়ানদের ঐতিহ্যও নয়, আবার তাদের ডানদিকের হিন্দুমেলা'র ঐতিহ্যও নয়, যদিও রবীন্দ্রনাথ পারিবারিক সূত্রে হিন্দু মেলার আবহাওয়াতেই কিশোর জীবন কাটিয়েছেন; রবীন্দ্র মানসে রামমোহন—বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয় দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও বঙ্কিমের মধ্যজীবনের ঐতিহ্যই বেশী ক্রিয়াশীল। রবীন্দ্রনাথ ডিরোজিয়ানস্ বা ইয়ং বেঙ্গলদের অতি-বাম আন্দোলনকে তেমন গুরুত্ব দেননি। 'লোকহিত' প্রবন্ধে এই ধরণের সংস্কৃতি আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা ও আংশিকতাকে নির্দেশ করে বলেছেন: "এক দিন যখন আমরা দেশহিতের ধ্বজা লইয়া বাহির হইয়া-ছিলাম তখন তাহার মধ্যে দেশের অংশটা প্রায় কিছুই ছিল না, হিতের অভিমানটাই বেড়া ছিল। সেদিন আমরা য়ুরোপের নকলে দেশহিত সুরু করিয়াছিলাম, অন্তরের একান্ত তাগিদে নয়।" মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা' কিংবা দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' প্রহসন-নাট্যের উচ্চ গ্রাম বর্ণনার সবটাকে গ্রহণ না করেও বলা যায়, ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যদের পাশ্চাত্যভঙ্গীর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং কাব্য-সাহিত্যে রিচার্ডসনের প্রভাব কিছু শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে সাড়া জাগিয়েছিল, তা গোটা সমাজ বা জাতির মন গড়ার কাজে, বিচ্ছিন্ন, আরোপিত ও আকস্মিক হওয়ার কারণে, খুব সামান্যই দেশ রাখতে পেরেছে; উপরন্তু তাঁদের নেতিমূলক ও আবেগপ্রবণ কর্মকাণ্ড সমাজ-সংস্কারের বাস্তব সীমাবদ্ধতাকে টপকে, পরোক্ষে পুনরুজ্জীবনবাদী হিন্দু ধর্ম-সংস্কৃতির গোঁ বাড়িয়ে তুলেছিল। ১৮৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমেলার কার্য-নির্বাহক সভা

বা 'জাতীয় সভা'র উদ্দেশ্য বর্ণনা করে হিন্দু জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রবক্তা রাজনারায়ণ বসু বলেছেন : .... "already a band of young men have expressed a desire to sever themselves at once from Hindu society and renounce even the Hindu name. It is feared that the tide of revolution may sweep away whatever good we have inherited from our ancestors. To prevent this catastrophe and to give a national shape to reforms it is proposed that a society for the promotion of national feeling among the educated natives of Bengal." এই হিন্দুমেলার ফেরিওয়ালাদের ঝুলিতে পূর্বপুরুষদের কি কি মঙ্গলকর ঐতিহ্য ভরা ছিল? কোন্ ধরণের জাতীয় ভাবে তারা দেশবাসীকে ভরাতে চেয়েছিলেন? রবীন্দ্রনাথ এই হিন্দু জাগরণ সম্পর্কেই 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধে বলেছেন: "যত রাজ্যের জাতের বেড়া, আচারের বেড়া মেরামত করিয়া পাকা করাই যদি পুনরুজ্জীবন হয়, যদি এমনি করিয়া জীবনের ক্ষেত্রকে বাধাগ্রস্ত ও বুদ্ধির ক্ষেত্রকে সংকীর্ণ করাই আমাদের গৌরবের কথা হয়, তবে তৃষ্ণার্তের ঘড়াঘটি সব চুরমার করিবে তারপরে চালুনি দিয়া জল আনিতে ঘন-ঘন ঘাটে-ঘরে আনাগোনা, এ আবদার বিধাতার সহ্য হয় না।' এই হিন্দু পুনরুজ্জীবনের পর্বে, হিন্দুমেলায় মুসলমানদের ঠাঁই ছিল না; ব্যতিক্রম শুধু ১৮৭৫ সালের নবম অধিবেশনে হিন্দু সঙ্গীতের ওস্তাদ মৌলা বক্সের উপস্থিতি, তা-ও হিন্দুশাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পারদর্শিতার কারণে। এই মেলায় গীত সত্যেন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'মিলে সবে ভারত সন্তান' ছিল প্রাচীন হিন্দু ভারতেরই আবাহনী—

'আসি ভারতভূমে একবার দেখে যাও আর্যগণ
কোথা ব্যাস বশিষ্ঠ বাল্মীকি আদি জনক সনাতন
বুক ফাটে কি বলব আর ভারতভূমি চেনা ভার
নাই আচার নাই অধিকার আশ্চর্য পরিবর্তন'।

দেখা যাচ্ছে, এই সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিল মূলত আর্য ঐতিহ্যের সম্ভ্রান্ত বর্ণ-হিন্দুদের পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন। এর অন্যতম নেতা মনোমোহন বসু 'সর্ব-সাম্প্রদায়িক হিন্দু' ভারতের প্রতিষ্ঠায় বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, বৌদ্ধ, জৈন সহ নেপালী, পাঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী ও মারাঠী প্রভৃতি সকল হিন্দুকেই এক জাতীয় মঞ্চে আহ্বান করেছে। এরই মধ্যে, এই জাতীয় মেলা বা সভায় অহিন্দুদের কোন স্থান নেই, এই প্রশ্ন করার মত মানুষ, সংখ্যায় কম হলেও, ছিল,

কারণ ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর, ১৮৬০ সালে 'নীলদর্পণ'-এর এবং পাশ্চাত্য দেশের যুক্তিবাদী মানবতা ও বিপ্লবী ইতিহাসের প্রভাব আমাদের শিক্ষিত অংশে উজ্জীবনমূলক মন গড়ার কাজে আরও কিছুটা এগিয়েছে। তাই সেই বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' এবং যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের 'আর্যদর্শন' এই সঙ্কীর্ণ হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রতিবাদে লেখালেখি সুরু করল, তখন 'ন্যাশনাল পেপার'-এর সম্পাদক ও হিন্দুমেলার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নবগোপাল মিত্র ১৮৭২ সালের ডিসেম্বরে বললেন, 'আমরা বুঝতে পারছি না কেন কিছু ব্যক্তি হিন্দু নামে এত আপত্তি করছেন; হিন্দুরাই একটা জাতির রূপ নিয়েছে এবং তাদের গঠিত সমাজই জাতীয় সমাজ বা সভা অবশ্যই হতে পারে।' এই বছরই একদিকে 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক' ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর প্রতিষ্ঠা হল, অপরদিকে হিন্দুমেলার অধিবেশনে রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' প্রবন্ধ পঠিত হল। উল্লেখযোগ্য, এর দু-তিন বছরের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা' ও 'বাঙ্গলার ইতিহাস' প্রবন্ধ লিখে জানালেন, ভারতে মুসলমান রাজত্বকাল একটানা পরাধীনতার কাল নয়, পাঠান আমলেই বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস, রঘুনাথ ও চৈতন্যদেব তাঁদের ধর্ম-সংস্কৃতির ডালি উজাড় করেছিলেন, স্বাধীনতা বা পরাধীনতার বিচারে জাতি ধর্ম বড় কথা নয়, কল্যাণবোধের দৃষ্টিভঙ্গীই বড় কথা, দেখা যাচ্ছে, মধ্যজীবনে বঙ্কিমমানসে হিন্দু জাতীয়তাবাদের ধারণা দানা বাঁধেনি; কারণ তখনও জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব হয়নি। উত্তরকালে অবশ্য দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম, ধর্মতত্ত্ব ও কৃষ্ণ চরিত্রের মধ্যে এই প্রতিক্রিয়ার শক্তি বাসা বেঁধেছিল। 'বাঙ্গলা হিন্দু-মুসলমানের দেশ একা হিন্দুর দেশ নহে; যতদিন উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে এই গর্ব থাকিবে যে বাঙ্গলা তাহাদের ভাষা নহে, ততদিন এই ঐক্য জন্মিবে না'—এক কথা বঙ্কিমই বলেছেন ১৮৭৩ সালে লেখা মীর মশারফ হোসেনের (জমিদার দর্পণের লেখক) 'গোরাই ব্রিজ' কাব্যগ্রন্থের সপ্রশংস আলোচনায়। এই সময়ে হিন্দুমেলার হিন্দু জাতীয়তাবোধের বিরোধিতায় আরও যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের ভূমিকা স্পষ্ট ও জোরাল। অসাম্প্রদায়িক ভারতীয় জাতীয়তাবোধের উজ্জীবন চেয়ে তিনি এই মেলার নাম 'ভারতমেলা' দেওয়ার আবেদন রেখে বলেছিলেন: 'যেন ইহা এখন হইতে ভারতবাসী মাত্রেরই উৎসবস্থল হয়। হিন্দু ব্যতিত অন্য কোন জাতি ইহাতে যোগ না দিলে আমরা কাঁদিব। কিন্তু আমরা ভারতবর্ষীয় কোন ভ্রাতার বিরুদ্ধে ইহার

দ্বার অবরুদ্ধ রাখিব না।'

হিন্দুমেলা ও দয়ানন্দের আর্য-সমাজ-এর সঙ্গে বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' ও যোগেন্দ্রনাথের 'আর্যদর্শন'-এর যে রেষারেষি তাকে নিছক শরিকী সংঘাত বলা যেতে পারে; কারণ একই শ্রেণীভিত্তি থেকে এদের সকলেরই জন্ম; এদের ভূমিস্বার্থের বিরোধী বা বিকল্প শক্তি রূপে **যতদিন না বুর্জোয়া শ্রেণী শক্তির জন্ম হয়েছে** ততদিন পর্যন্ত সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এদের যা কিছু সামান্য বিরোধ-বিবাদ তার পিছনে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীগত প্রশ্ন ছিল না।

দিনে দিনে, উনিশ শতকের শেষ কয়েক দশকে ইউরোপীয় ধনতন্ত্র বিকাশের চূড়ান্ত স্তরে, পচতে সুরু করলে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী অবক্ষয়ের মুখে পড়লে, ভারতীয় উপনিবেশের ব্রিটিশ অর্থনীতিতেও তার প্রভাব পড়ল; কিন্তু এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা, যন্ত্র ও কারিগরি শিল্পের প্রসারে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর অভ্যুদয়ও অনিবার্য হয়েছিল এবং তা যতই সীমিত ও মন্থর হোক না কেন, তার বিরুদ্ধে সামাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী শক্তি এককাট্টা হয়ে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মার মারতে লেগেছিল। বুর্জোয়া ধনতন্ত্র সাম্প্রদায়িক ও জাত-ধর্মের ভেদ ঘোচাতে সাহায্য করে; আর তার বিপরীত পচনশীল ধনতন্ত্র (ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ) ও মধ্যস্বত্বভোগীদের জোট তা খুঁচিয়ে শোষিত জনগণের ঐক্য ভাঙতে ও দুর্বল করতে সক্রিয় হয়। অবশ্য অপূর্ণ ও অপুষ্ট বুর্জোয়া শক্তি শেষ পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণীর জাগরণের মুখে ঐ পচাগলা প্রতিক্রিয়ার খোঁয়াড়েই মাথা গুঁজে বাঁচতে চায়!

তবু যোগেন্দ্র বঙ্কিম শরিক যে শেষ পর্যন্ত রাজনীতি বা স্বাদেশিকতার সঙ্গে হিন্দুয়ানীকে মিশিয়ে হিন্দুরাষ্ট্রের বন্দনা করেছেন, ধর্মতত্ত্ব ও কৃষ্ণচরিত্রের মধ্যে জাতীয় মুক্তির সন্ধান করেছেন, 'নীলদর্পণ'কে কটাক্ষ করেছেন এবং জমিদার দর্পণকে নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করেছেন, এ সবই উদীয়মান জাতীয় বুর্জোয়া-শক্তির বিকাশ রুদ্ধ করতেই ঘটেছিল; বঙ্কিম প্রমুখ পুনরুজ্জীবনবাদীরা এক বিশেষ শ্রেণীর প্রতিনিধিমাত্র, ব্যক্তিগত খামখেয়ালীপনা ছিল না।

শেষে এই পাপের বীজই দ্বিজাতিতত্ত্ব ও কার্জনের বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫) বিষবৃক্ষ রচনা করেছিল। লক্ষ্য করার মত, নীলদর্পণ, বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ ও জমিদার দর্পণ-এর মুখে ১৮৭৬ সাল থেকে বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্রিটিশ বর্বরতন্ত্র (সামন্ত শিবিরের সহযোগিতায়) লাগামছাড়া হয়েছিল; তাদের কাছে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী ও সাম্প্রদায়িক 'সংস্কৃতি' আন্দোলন আতঙ্কের ছিল না, আতঙ্কের হয়েছিল বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে গোটাজাতির দুর্বার প্রতিরোধ আন্দোলন, যা অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবোধের জাগরণকে অনিবার্য করে তুলেছিল।

বাংলার নবজাগরণ ও সাহিত্য-সংস্কৃতির ঐতিহ্য-২

উনিশ শতকের মাঝ বরাবর সাঁওতাল বিদ্রোহে (১৮৫৫) কেবল হিন্দু বা কেবল মুসলমান সাঁওতাল উপজাতিরা ব্রিটিশ শাসক ও দেশীয় জমিদারদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল, তা নয়; সিপাহী ও নীল বিদ্রোহ সম্পর্কেও একই কথা, মিলিত হিন্দু-মুসলমানদের আর্থ-রাজনৈতিক বিস্ফোরণ। এইসব ঘটনা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের পক্ষে বিপজ্জনক; বিশেষ করে হিন্দু-মুসলমানদের সম্মিলিত স্বদেশচেতনাই তাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। এদেশের মত আয়ার্ল্যাণ্ডেও ওরা দেশীয় তাঁতি ও কারিগরদের পেশা ধ্বংস করে একদিকে ল্যাঙ্কাশায়ার ও ম্যাঞ্চেষ্টারের কলে তৈরী কাপড় বেচার বাজার সৃষ্টি করেছিল, অপরদিকে গ্রামের সব মানুষকে জমির গোলামে পরিণত করে কাঁচামালের বিপুল ক্ষুধা মেটাতে নেমে পড়েছিল। যে বছর এখানে সিপাহী বিদ্রোহ ঘটল, সেই বছর আয়ার্ল্যাণ্ডে বিপ্লবী ফেনিয়ান সোসাইটি গঠনের খবরও সম্ভবতঃ এখানকার ব্রিটিশ শাসকদের কানে পৌঁছেছিল।

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই ভেঙে-পড়া বাদশাহী ও হিন্দু রাজত্বের দুর্দশাগ্রস্ত সিপাহী ও পাইক-বরকন্দাজরা ব্রিটিশবাহিনীতে চাকরী পেয়েছিল; গ্রামের তাঁতি-কারিগররাও হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে জমির জোয়ালে বাঁধা পড়ে দুর্ভিক্ষের শিকারে পরিণত হল এবং বাঁচার শেষ চেষ্টায় একই সঙ্গে ব্রিটিশ শাসক ও দেশীয় জমিদারদের বিরুদ্ধে দিকে দিকে স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহে ফেটে পড়ল।

মোগল বাদশাহীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নিয়েই ব্রিটিশ শাসনের সূত্রপাত হয়েছিল; স্বভাবতই মুসলমানেরা গোড়া থেকেই ইংরাজদের প্রতি ক্ষেপেছিল এবং এটা বুঝেই ১৭৯৩ সালের যে সব জমিদারদের হাতে জমির ব্যক্তিগত মালিকানা স্থায়ী করেছিল, তারা প্রায় সবাই ছিল হিন্দু। তাছাড়া পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্ষেত্রেও উচ্চ হিন্দু সমাজের আগাম যায়গা হয়েছিল।

কিন্তু অভিজাত উপরতলাতেও এই রকম ভাগাভাগি রেখে কাজ করা পুরোপুরি সম্ভব হয়নি; কারণ সুদীর্ঘকালের আইন-আদালত থেকে মুসলমান মোল্লা-মৌলভীদের বাতিল করা সম্ভব হয়নি; সিপাহী বিদ্রোহের আগে পর্যন্ত হিন্দু পণ্ডিতদের সঙ্গে তাদের পরামর্শেরও প্রয়োজন ছিল। তবু ধর্ম সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে ব্রিটিশ শাসক এতদিন পর্যন্ত ট্র্যাডিশনে হাত দেয়নি।

কিন্তু পর পর কয়েকটি বিদ্রোহের ঘটনা, বিশেষ করে সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনা (মার্কস যাকে ভারতের 'প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ' বলেছেন) গোটা ব্রিটিশ নীতিকে তার সাম্রাজ্যবাদী 'Divide et empara'-কে নগ্ন করে তুলল। উইলিয়াম হাণ্টার তাঁর 'ইণ্ডিয়ান মুসলমান্স' গ্রন্থে বলেন—মিউটিনির পর ব্রিটিশরা মুসলমানদের প্রকৃত শত্রু বলে গণ্য করতে থাকে। কারণ এই ঘটনা একাধারে ছিল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও উপর থেকে নিচে পর্যন্ত সর্বস্তরে মিলিত হিন্দু-মুসলমানদের সংগ্রাম। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধে বলেছেন—"এতদিন সেই গোড়ার দিক থেকে এক রকম মিল ছিল! পরস্পরের তফাৎ জেনেও আমরা পরস্পর কাছাকাছি ছিলুম। সম্প্রদায়ের গণ্ডীর উপর ঠোকর খেয়ে পড়তে হত না; সেটা পেরিয়েও মানুষে মানুষে মিলের যথেষ্ট যায়গা ছিল। কিন্তু এক সময়ে যে কারণেই হোক ধর্মের অভিমান যখন উগ্র হয়ে উঠল তখন থেকে সম্প্রদায়ের কাঁটার বেড়া পরস্পরকে ঠেকাতে ও খোঁচাতে সুরু করে।"

সাধারণভাবে এটাই ধারণা এবং কিছুটা সত্যও বটে যে, এদেশে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও সংঘাত ব্রিটিশ শাসকরাই কলকাঠি নেড়ে ঘটায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই মতকে পুরোপুরি মানতে পারেন না বলেই 'যে কোন কারণেই হোক' বলেছেন। যতদিন উপরের ও নিচেরতলায় মোটামুটি একটা অভ্যস্ত অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ছিল, ততদিন পর্যন্ত ধর্ম-সম্প্রদায়গত অবস্থান ও সম্পর্কের মধ্যে তেমন উগ্রভাবে নাড়া লাগেনি, ব্রিটিশ প্রবর্তিত অর্থনীতি ও তৎশ্লিষ্ট রাজনীতির ধাক্কা খেয়ে গোটা সমাজ কাঠামোই ভেঙে পড়ল এবং প্রধানতঃ সুবিধাভোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবেই সাম্প্রদায়িক ক্ষেত্রে জোর গোল বাধল—এ রকম মূল্যায়ন রবীন্দ্রনাথ না করলেও, বিশেষ করে হিন্দু ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে হাজারো রকমের 'জাতের বেড়া আচারের বেড়া'ই অন্ধ সাম্প্রদায়িক ভেদের মূল, এ কথার উপরই তিনি বেশী জোর দিতে চেয়েছেন; অর্থাৎ প্রশ্নটা কি হিন্দু, কি মুসলমান উভয় ধর্মেরই মধ্যে শিকড়ে শিকড়ে রয়েছে, উপর বা বাইরে থেকে ডালে-পাতায় হাওয়া লাগানো নয়; এই রকম অভিমতই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন রচনায় ব্যক্ত করেছেন। 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধে বলেছেন: মহাভারতে একটা সমাজ বিপ্লবের প্রবাহ ছিল; কোন সংহিতার কারখানায় তা ঢালাই-পেটাই হয়নি। মিশরের কবরখানার তলায় রাখা 'মমি'র মত সমাজের চোখে ঠুলি পরিয়ে মানুষকে দিয়ে ঘানি টানানো এবং সেই ঘানিটাকেই সনাতন বলে চালানো কখনই

মুক্তির নির্দেশক হতে পারে না। যে মানসিক সঙ্কীর্ণতা; আত্মদণ্ড ও বিচ্ছিন্নতাকে সনাতন বলে মেনে হিন্দু ধর্ম-সংস্কৃতির ঘানি বানানো হয়েছে, সেই প্রভুত্বের শক্তির সঙ্গে (ব্রাহ্মণই ভূদেব) মুসলমান শাসকদের স্বৈরাচারী শক্তির মিল করেই মনসা ও চণ্ডী ধরণের ভয়ংকর একনায়কতন্ত্রের ধর্মীয় রূপকল্প গড়া হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, ম্যাক্সিম গোর্কি এই রকম স্বৈরতন্ত্রী ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ সম্পর্কে 'ব্যক্তিত্বের বিচ্ছিন্নতা' ব্যাখ্যায় অনেকটা এই রকম কথাই বলেছেন—'...যখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অপরকে উৎপীড়ন করার অধিকার নিয়ে শাসনকারী হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হল, সৃষ্টি করল এক চিরন্তন ঈশ্বর, জনগণকে বাধ্য করল 'আমি'র দেবতাসুলভ প্রকৃতিকে স্বীকৃতি দিতে।'

ইংরাজরা উন্নততর রাজনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব নিয়ে এসেছিল। মার্কস যাকে 'বর্বরসুলভ অহমিকা' বলেছেন, তার গায়ে লেগেছিল বলেই কি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আর অভিজাত মৌলানা অংশ, হীনমন্যতাবোধে ব্রিটিশ কালচার প্রথম দিকে মেনে নিতে পারেনি; আবার অন্য কারণও ছিল এবং প্রধানতঃ হিন্দুদের ক্ষেত্রে স্ববিরোধও ছিল। প্রথম দিকে, জীবিকাগত ও রাজনৈতিক যে সব সুযোগ সুবিধা পাওয়ার আশায়, প্রধানতঃ হিন্দু সম্প্রদায় ব্রিটিশ শাসনের 'অনুগত শক্তি' হয়ে উঠেছিল, সেইসব ক্ষেত্রে, সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে, প্রতারণার বোধ জেগে ওঠে এবং ক্রমে তাদের ব্রিটিশ-বিরোধিতা হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী স্বাতন্ত্র্য বা স্বাজাত্যবোধে রূপান্তরিত হয়। অবশ্য তাদের স্ববিরোধিতাও যথেষ্ট ছিল; বিগত প্রায় দেড় শতাব্দী ধরে বাদশাহী আমলের ভাঙন ও নৈরাজ্যের ঢালে পড়ে সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারগুলিও একাধারে দুর্দশা ও সম্ভ্রমবোধের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে; অত:পর ব্রিটিশ শাসনের সরকারী পদ ও শিক্ষা পাওয়ার আশায় একই সঙ্গে মুসলমান সম্প্রদায়কে (অভিজাত অংশকে) বিচ্ছিন্ন করতে ও ব্রিটিশ শাসনের দিকে ঝুঁকে পড়তেই চেয়েছিল। বলাবাহুল্য, এরা ছিল সমাজের সম্ভ্রান্ত ও সুবিধাভোগী মধ্যবিত্ত অংশ।

'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়।'

কবি রঙ্গলাল যখন ১৮৫৯ সালে তাঁর 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' কাব্যে এই ঘোষণা উচ্চারণ করলেন, তখন কাঙাল হরিনাথ বা ফিকির চাঁদের "হরি দিন তো গেল

সন্ধ্যা হল পার কর আমারে/তুমি পারের কর্তা শুনে বার্তা ডাকছি হে তোমারে"— এই রকম সামন্ত সমাজের বিষণ্ণ আত্মসমর্পণের তুলনায়, ব্রিটিশ প্রভুশক্তির প্রতি ক্রোধের প্রকাশে যথেষ্ট প্রগতিশীল, এটাও যেমন সত্যি তেমনি যে-বিদ্রোহগুলিতে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য-শক্তির প্রকাশ ঘটেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে এই কাব্যের ও এই স্বাধীনতার মধ্যে সম্পৃক্ত হিন্দু জাতীয়তাবোধের সীমাবদ্ধতা, সোচ্চার বীরত্বের শব্দেও চাপা থাকে না। এ কথা হেমচন্দ্রের 'ভারতসঙ্গীত' এবং মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র প্রসঙ্গেও সত্য। তবু তাঁদের মধ্যে হিন্দু জাতীয়তাবোধের ঐতিহ্য কাজ করলেও, উগ্র হিন্দুত্ববোধের তাড়নায় ব্রিটিশ স্বৈরতন্ত্রের পুজায় তাঁরা নতুন কোন মঙ্গলকাব্য' রচনা করেননি বা ঈশ্বর গুপ্তের মত কেবলই সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক কেচ্ছা করেননি; সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনায় গুপ্ত কবি লিখেছেন—

'কেবলি মর্জ্জি তেড়া কাজে ভেড়া মাথা যত
নরাধম নীচ নাই নেড়েদের মত'।

এই ধরণের কদর্য স্বাদেশিকতার তুলনায় মধু-হেম-রঙ্গলালের রাজনৈতিক দাসত্ব-শৃঙ্খলের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার ঘোষণা, ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বলিষ্ঠ ও ইতিবাচক পদক্ষেপ।

দেখা গেছে, শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রধানতঃ রক্ষণশীল ও পশ্চাৎপদ শক্তিকে এবং দ্বিতীয়ার্ধে ধর্ম-সম্প্রদায়ের ভেদের শক্তিগুলিকে প্রশ্রয় দিয়েই ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী এ দেশের নিজস্ব বুর্জোয়া শক্তির বিকাশে বাধা দিয়েছে; যুক্তিবাদ, বস্তুবাদ, ব্যক্তিত্ববাদ ও প্রতিবাদী বীরত্বভাবকে চাপা দিয়ে রাখার জন্য, জাতীয় ইতিহাসের বিকৃতি ঘটিয়েছে, কোঁৎ-এ, স্পেনসার ও বার্কলে প্রমুখ যতসব ভাববাদী দর্শনের বইয়ে উচ্চশিক্ষার পাঠক্রম ভরিয়েছে। তাছাড়া, ব্রিটিশ শাসনের গুণগত ও ইতিবাচক দিক অস্পষ্ট ও জটিল থাকার কারণে, এমনকি রামমোহন-বিদ্যাসাগর ডিরোজিও-ডেভিডের প্রভাবেও অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত বুদ্ধিজীবীদের হিন্দুত্বের ঐতিহ্যগত ভাবসংস্কারের বরফ গলাতেই পারেনি; বরং ব্রিটিশ-বিরোধী রক্ষণশীল অংশের মধ্যে এই ধারণাই গড়ে ওঠে যে, প্রথমার্ধ ছিল ব্রিটিশ-তোষণনীতির জাতীয়তা-বিরোধী পর্ব। এই ধারণা থেকেই একদিকে 'হিন্দুমেলা' ও দয়ানন্দের 'আর্য-সমাজ আন্দোলন', অপরদিকে সৈয়দ আহমদের উগ্র ইসলামী তথা 'আলিগড় আন্দোলন' দানা বেঁধে ওঠে। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের যুক্তিবাদী মানবতার ধারা এবং মধু-হেম-রঙ্গলালের বীরত্বমূলক জাতীয়তাবাদের ধারা সরানোর চেষ্টা

হয়ে, সে জায়গায় উগ্র ধর্ম-সাম্প্রদায়িক পশ্চাৎপদতা পুনরুজ্জীবনবাদ এবং অতীতের সব পেয়েছির জগৎ হারিয়ে যাওয়ার অসহায় বিলাপ প্রাধান্য পায়। ১৮৭২ সালে হিন্দুমেলার কর্ম-পরিষদ বা 'জাতীয় সভা'র প্রতিষ্ঠায় প্রস্তাব নিয়ে বলা হল: '...a great change has taken place in the minds of of the educated youths of Bengal. The tide of denationalisation has sustained an ebb. A happy reaction has taken place in native feelings. People have began to disbelieve in the theory that for a nation's progress they have simply to learn the art of borrowing." এইভাবে পাশ্চাত্যের 'অন্ধ অনুকরণ' ঠেকাতে গিয়ে হিন্দুমেলার বুদ্ধিজীবী নেতারা প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার সনাতন আদর্শ নিয়েই বাড়াবাড়ি সুরু করলেন। তার প্রতিফলন ঘটল তাঁদের সমস্ত কর্মসূচীতে, কাব্যে ও সঙ্গীতে; বিভিন্ন বাৎসরিক অধিবেশনে হিন্দু আইন, হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা, হিন্দু আচার-ব্যবহার, পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ হয়েছে। ১৮৭২ সালে, 'জাতীয় নাট্যশালা' প্রতিষ্ঠার (নীলদর্পণ' প্রথম অভিনয়) পরের বছর ব্রিটিশ হাইকোর্ট ব্যাভিচারিণী হিন্দু বিধবার পক্ষে স্বামীর সম্পত্তির লাভের রায় দিলে এই হিন্দুমেলার কর্তাব্যক্তি ও অনুগামীদের মধ্যে তুমুল বিক্ষোভ দেখা দেয়। রাজনারায়ণ বসু বললেন: ইউরোপে স্ত্রী প্রভুত্ব যেমন সমাজের ভিত্তি, এদেশে সতীত্ব তেমনি আমাদের সমাজভিত্তি। সেখানকার বীরত্বের মত এখানকার সতীত্বও তেমনি মহনীয়। দ্বিজেন্দ্র ঠাকুর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন: আমাদের ভাল-ভাল রীতি সব গেছে, থাকার মধ্যে কেবল সতীত্ব; তা-ও যাবার উপক্রম। অতঃপর 'জাতীয় সভা' এই সতীত্ব রক্ষার পক্ষে বা বিধবার সম্পত্তি পাওয়ার বিরুদ্ধে বিলাতে আপীল ও আন্দোলন করছে। শতাব্দীর গোড়ায় রামমোহন ব্যক্তি-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য এবং সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে বিলাতে আপীল-আন্দোলন করেছেন, বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের পক্ষে লড়েছিলেন, উচ্চশিক্ষার পাঠ্যসূচী থেকে অধ্যাত্মবাদী বার্কলের দর্শন বাতিলের জন্য সুপারিশ করেছিলেন, রামনারায়ণ তর্কালঙ্কার 'কুলীন কুলসর্বস্ব' মাইকেল 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' ও 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' নাটক সৃষ্টি করেছেন; কিন্তু দেখা গেল, ভিক্টোরিয়ার রাজত্বে লেসে ফেরার-এর উপযোগী পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের গতিমুখে (কিছুটা অন্ততঃ) দেশীয় সংস্কৃতির মধ্যে, পুনরুজ্জীবনবাদী পশ্চাৎপদ ধারা আবার মাথা চাড়া দিল। এটা ছিল, তখনকার

দেশীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর সূচনার মুখে মধ্যস্বত্বভোগী পত্তনিদার ও কুসীদ-জীবীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার মরসুম এবং সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তারই প্রতিফলন। এই সময়েরই হিন্দু জাতীয়তাবোধের উত্তরসাধনা ঘটেছে, বিংশ শতাব্দীর গান্ধীবাদী চিন্তা-দর্শনে, তিলকের শিবাজী-উৎসবে, গণেশ পূজায়।

'গগনবিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়'—হিন্দুমেলার দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ অতীতের ভাববাদী হিন্দু ঐতিহ্যের অধঃপতন অর্থে ডিরোজিওর এই বিখ্যাত কবিতার অনুবাদ করেছেন; কিন্তু প্রকৃত অর্থে বাস্তববাদী ও র‍্যাশনালিস্ট ডিরোজিও মানুষের চেয়ে, মানবিক মহিমার চেয়ে কোন ভাবসর্বস্ব দৈবশক্তিকে বড় করেননি; বরং মানবিক মূল্যবোধের অবনমনে মহান বুর্জোয়া কবি মর্মাহত। অপরপক্ষে, 'জাতীয় সভা'র কবি-দার্শনিকরা সবাই স্বজাতীয় ঐক্য, স্বদেশীয়দের দ্বারা হিন্দুজাতীয় ঐক্য, স্বদেশীয়দের দ্বারা হিন্দুজাতির মৈত্রীযজ্ঞ সম্পন্ন করতে মোল্লা-মৌলভীদের প্রাচ্য শিক্ষা বাদ দিয়ে কেবলই হিন্দুর অতীত ধর্ম-সংস্কৃতির গৌরবগান করেছেন এবং কালী, লক্ষ্মী, জগত্তারিণী, আর্য রামচন্দ্র, সীতা, মৈত্রেয়ী, সাবিত্রী প্রভৃতি নানা হিন্দু প্রতীকে জাতীয় ভাব জাগাতে প্রয়াসী হয়েছেন।

'মিলে সবে ভারত সন্তান/একতান মনপ্রাণ/গাও ভারতের যশোগান'—সত্যেন্দ্রনাথের জাতীয় বা স্বদেশী গানেও সেই একই আর্যামি ও হিন্দুত্বের মহিমা ঘোষিত হয়েছে। এই হিন্দু ভারতের দুর্দশা ও বিবর্ণতার জাতীয়তাবাদী কবি দ্বিজেন্দ্রনাথকে যে 'ন্যাশনাল সঙ্গীত' রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল, তা হল : আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি / এ দুঃখ তোমার হায়রে সহিতে না পারি।'

উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথও (কিশোর বয়সে) এই মেলার প্রথম দু-একটি অধিবেশনে পঠিত 'হিন্দু মেলার উপহার' ধরনের কবিতায় রামরাজত্ব ফিরে পাওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছেন। সংস্কৃতি ক্ষেত্রে দেশের বুদ্ধিজীবী পরিবারগুলিতে হিন্দুমেলার প্রভাব এমনই প্রবল ছিল; যদিও এই ধ্যান-ধারণা এক দশক আগের রঙ্গলাল—হেমচন্দ্রেরই উত্তরসাধনা ছিল, তবু ইংলণ্ডের চার্টিস্ট সাহিত্যে অভিনন্দিত ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের প্রভাবে তখন বীরত্ব ও ইংরাজ পদলেহীদের প্রতি ধিক্কার যতটা ছিল হিন্দু মেলার কালচারে তা ছিল না। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ স্বৈরতন্ত্রের বর্বরতা ও কণ্ঠরোধের শাসনকে নিন্দিত করে রবীন্দ্রনাথ যেমন কৌশলে মহাভারতের দুর্যোধন চরিত্র ('গান্ধারীর আবেদন' কাব্য—নাট্যে) এঁকেছেন,

১৮৫৮ সালে রচিত কাহিনীকাব্যে হেমচন্দ্র মহারাষ্ট্রীয় যুবকের বীরত্ব ও মর্যাদাবোধের পরিচয় রেখেছেন :

‘এখন সেদিন নাহিক আর
দেব আরাধনে ভারত-উদ্ধার
হবে না, হবে না, খোলো তলোয়ার
এ সব দৈত্য নহে তেমন ;
একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র মিলে
কর দৃঢ় পণ এ মহীমণ্ডলে
তুলিতে আপন মহিমা ধ্বজা
জপ তপ আর যোগ আরাধনা
পূজা হোম যাগ প্রতিমা অর্চনা
এ সকলে কিছু হবে না....’

এখানে আর্যভারতের দৈব বা ধর্ম-শাস্ত্রীয় ট্রাডিশনকে, বর্ণাশ্রমকে বর্জন করার ডাক দেওয়া হয়েছে। এতে সমকালের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী-মানসের উপযোগী হিন্দু-মুসলমান ঐক্য না থাকলেও, উঁচু-নিচুর ভেদবিহীন বীরত্বপূর্ণ ব্রিটিশ-বিরোধিতার যে সুর ফুটেছে, তা নিঃসন্দেহে মহাবিদ্রোহেরই ফল।

কিন্তু হিন্দুমেলার প্রচলিত ঐতিহ্যের ধারায় মনোমোহন বসুর ‘হরিশচন্দ্র’ পালার (১৮৭৪) দুটি গান স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে ; সম্ভবতঃ নাটকের গান বলেই বাস্তব ইতিহাসের স্পর্শ পেয়েছে ; আর্য-ভারতের ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিষন্ন বিলাপ এতে কম।

“নরবর নাগেশ্বর শাসন কি ভয়ংকর
দে কর দে কর রব নিরন্তর
করের দায়ে অঙ্গ জরজরা
সিন্ধুবারি যথা শুষে দিনকর
শোণিত শোষণ করে শতকর
করদাহে নব নিকর কাতর
রাজা নয়, যেন বৈশ্বানর।”

এতে শুধু ভূমিকর নয়, বাড়ী, জল, সেতু, তরী, গো-শকট, লবণ সবেরই উপর চাপানো করের বিরুদ্ধে জাতীয় ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে ; এবং রাজা যে আজ আর

রামচন্দ্রের মত নয় সে কথাও ঘোষিত অবশ্য হয়েছে। অপর গান :

তুঙ্গদ্বীপ হতে পঙ্গপাল এসে
সার শস্য গ্রাসে যত ছিল দেশে
তাঁতি কর্মকার করে হাহাকার
সূতা জাঁতা টেনে অন্ন মেলা ভার
দেশী বস্ত্র অস্ত্র বিকায় নাকো আর
হলো দেশের কী দুর্দিন ;
আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ
কলের বসন বিনা কিসে রবে লাজ ?"

সমাজনিরপেক্ষ ভাববাদী অতীতচারিতার জোয়ারে এই রকম কয়েকটি সমাজসচেতন সৃষ্টির ঐতিহাসিক মূল্য না বুঝলে গোটা জাতির গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারা থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব। সময়ের সীমাবদ্ধতা মেনেই এইসব গানের মধ্যে যে সব 'ডকুমেন্টারী' উপাদান রয়েছে, যে সমাজবাস্তবতার প্রতিফলন ঘটেছে তা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। এই প্রসঙ্গে 'জাতীয় সভা'র নেতা মনোমোহন ও কবি-নাট্যকার মনোমোহনের মধ্যেকার স্ববিরোধের দিকটাও লক্ষ্য করার মত ; এই রকম স্ববিরোধিতা তখন কমবেশী সকলের মধ্যেই ছিল। আখ্যানধর্মী এই গানের মধ্যে পাওয়া যায় একাধারে পরাধীনতার গ্লানি ও বেদনা, ব্যাপক জনজীবনে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির চিত্র, জাতীয় অবমাননাবোধ, আর্যভারতের জন্য, সূর্য ও চন্দ্র বংশের জন্য বিলাপ, জাহাঙ্গীরের আমল থেকে অষ্টাদশ শতকের কোম্পানী আমল পর্যন্ত দেশের সম্পদ-হরণ, কৃষি ও হস্তশিল্পের সর্বনাশ এবং যন্ত্রসভ্যতার প্রতি বিরাগ ; অর্থাৎ পিছুটান ও বাস্তবচেতনার সহাবস্থান।

'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন/এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন'—কবি জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুরের এই গান ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয় ভাব জাগানোর বলিষ্ঠ ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েও হিন্দুয়ানীর সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত নয় ; থাকার কথাও নয়। তবু এতে হারানোর হা-হুতাশ নেই, আছে আত্মসমর্পণের মনোভাবের বিরুদ্ধে একটা সম্মেলক প্রত্যয়ের দীপ্তি।

সাঁওতাল, সিপাহী ও নীল বিদ্রোহের সময়ে যে সব আদিবাসী লোকসঙ্গীত রচিত হয়েছিল, সেগুলি সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত সমাজের সমর্থন ও সহযোগিতা না

পাওয়ায় কালের অগোচরে রয়ে গেছে; পরবর্তীকালে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগেও সেগুলি সংগ্রহ করার কোন সংগঠিত ও উল্লেখযোগ্য প্রয়াস হয়নি। লোকসঙ্গীত সংগ্রহে যে দু-একটি কাহিনীমূলক গানের নিদর্শন কদাচিৎ চোখে পড়ে, তাও খণ্ডিত ও খাপছাড়া ভাবে; এরই মধ্যে 'নীলদর্পণ' নাটক প্রকাশের সঙ্গে ১৮৫৯-৬০ সালের নীলবিদ্রোহের বিখ্যাত স্বদেশী গান সেই যুগের গভীরতর সমাজচেতনার পরিচয় বহন করছে। গানটির রচয়িতা 'বিদ্যাভূনী' ছদ্মনামের অজানা কবি।

'নীল বাঁদরে সোনার বাংলা করলে এবার ছারখার
অসময়ে হরিশ ম'লো লঙ-এর হ'লো কারাগারা।'

মধুরার ভূমিহীন কিষাণ কবি সাত্যকী শর্মার একটি সাঁওতাল বিদ্রোহের গান পাওয়া যায়: 'এবার জাগো বীর কিষাণ ভাই জাগো / কৃষ্ণ যে পথ দেখিয়েছেন সেই পথে চলো / আমাদের ঘরে ঘরে চোর ডাকাত ঢুকেছে / তুমি ঘুমিও না কিষাণ ভাই।'

স্মরণ রাখা দরকার, সে যুগের সংস্কৃতি আন্দোলনের নেতৃত্ব তখন ভূমিস্বার্থে বাঁধা মধ্যস্বত্বভোগী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে; তাঁরা কৃষকবিদ্রোহের ঘটনাতে, তা যতই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী হোক, স্বভাবতই বিরক্ত, বিষণ্ণ ও আতঙ্কিত হয়েছেন। অপরদিকে, এই অংশ বুর্জোয়া শিল্পবিকাশের পথে, শিল্প কারখানার পত্তনে সম্ভবমত বাধাই দিয়েছেন। কিন্তু কৃষি ও কৃষকের প্রশ্নে যেমন, সামান্য অংশে হলেও, সহানুভূতির মনোভাব ছিল, তেমনি জাতীয় শিল্প ও প্রযুক্তিবিজ্ঞানের উন্নতির পক্ষেও দ্বারকানাথ ঠাকুরের 'কার ঠাকুর কোম্পানী', বোম্বাইয়ের রুস্তমজী কাওয়ানজীর শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারে উদ্যোগগ্রহণ, ডেভিড হেয়ারের আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষণা, হিন্দুমেলার পঞ্চম অধিবেশনে (১৮৭১) সীতানাথ ঘোষের বিদ্যুৎ ও চৌম্বকশক্তির মূল্য বিষয়ক বক্তৃতাদান ও গ্রন্থ প্রকাশ, দশম অধিবেশনে (১৮৭৬) আন্দুলের গিরিশ মুখার্জীর অক্ষর নির্মাণের ও কাগজ তৈরীর কল প্রদর্শন প্রভৃতি ঘটনা বুর্জোয়া সমাজবিকাশের পক্ষে নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ যত হবে, শিল্প-বিজ্ঞান সম্পর্কিত যুক্তিবাদী মনোভাবের বিকাশ যত হবে, মধ্যযুগীয় পশ্চাৎপদতার টানও ততো ঘোচে এবং বিরোধ-সংঘাতের মধ্য দিয়ে সমাজের নতুন শক্তির ঐক্য ও বিকাশের সম্ভাবনাও ততো বাড়ে। লক্ষ্য করা যায়, হিন্দুমেলার পঞ্চম অধিবেশন থেকে তাঁত চরকার সঙ্গে, দেশীয় কুটির শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক

শিল্প বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণও যেমন বেড়েছে, নিছক হিন্দুত্ববোধ ও শহরকেন্দ্রিক সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধেও তেমনি আবেদনের কণ্ঠস্বর ক্রমে জোরাল হয়েছে। ১৮৭৬ সালে মেলার দশম অধিবেশনে আনন্দমোহন বসুর স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েসনের সভায় ছাত্রনেতা সুরেন্দ্রনাথ নতুন ইতালির জাগরণ ও ম্যাৎসিনি গ্যারিবল্ডির বীরত্বপূর্ণ নেতৃত্ব বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং একই বছরে 'সাধারণী' পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়: উন্নতির সমস্ত উপকরণ ভারতে আছে; রায় বাহাদুর, রাজা বাহাদুর দেশহিতৈষীরাই প্রাধান্য পাচ্ছে, এটাই দুঃখের। শিল্প ও প্রযুক্তিবিদ্যায় মধ্যবিত্তদেরই এগিয়ে আসতে হবে; তাদের দুর্দশার বিরুদ্ধে সংগ্রাম তাদেরই করতে হবে। দেশের ভাল মন্দ এই সম্প্রদায়ের উপরই নির্ভর করছে। লক্ষ্য করার মত, যে সময়ে মধ্যস্বত্বভোগী রক্ষণশীল অংশের প্রাধান্য, সে সময়ে দুর্দশাগ্রস্ত নিম্ন-মধ্যবিত্তদের প্রগতির পক্ষে সংগ্রামের আহ্বান জানানো, **ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতার বিচারে** নিঃসন্দেহে অগ্রগামী ভূমিকা। যে সময়ে হিন্দু কলেজের কৃতিছাত্র হওয়া মানেই আইনজীবী বা উচ্চ সরকারী পদে নিযুক্ত হয়ে 'রায় সাহেব' ধরণের খেতাব অর্জন করা, সেই সময়ে বোম্বাইয়ের রুস্তমজীর মত জাতীয় শিল্প-বাণিজ্য গড়ার আগ্রহেও অক্ষয় দত্তের প্রকৃতিবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যার প্রেরণায় একাধারে সাহিত্যসেবী ও ব্যবসায়ী ভোলানাথ চন্দ্র ১৮৭৪ সালে 'মুখার্জ্জীস ম্যাগাজিন'এ দেশের নিজস্ব কারিগরি শিল্পে ঐতিহ্য গড়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন: "....let us always remember that the progress of India rests with the people themselves and that her material prosperities must spring more from their own energy, persevere-nce and self reliance than from the modification of the existing laws...the increased knowledge, energy and wealth of the Indians of the 2oth and 21st centnry would enable them to follow both agriculture and manufactures to develop the subterranean resources to open mine and set up mills, to launch ships upon the ocean and carry goods to the doors of consur-mers in England and America." এই বুর্জোয়া ধনতন্ত্রের ধ্যান-ধারণা মানুষের মুখকে পরলোক থেকে ইহলোকের দিকে ফিরিয়ে দেয়, জাতধর্মের ভেদ ঘোচানোর পথ করে, ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনে বস্তুবাদী চিন্তা-দর্শনের বিকাশ ঘটায়। অথচ এই বুর্জোয়া বস্তুবাদের বিরোধী শক্তির অন্যতম মুখপাত্র

মনোমোহন বসু ১৮৭২ সালে হিন্দুমেলার অধিবেশনে বললেন: 'কলের গাড়ী, কলের জাহাজ; কলের তারে সংবাদ যাতায়াত, বাণিজ্য কুঠি, নীল, চা কত কী হচ্ছে; এ সবে আমাদের কী অধিকার? ওহে অহংবাদী সভ্যতাভিমানী নববঙ্গ! তোমরা কিসের বড়াই কর? তোমরা পূর্বপুরুষ অপেক্ষা বড় হইয়াছ একথা কোন্ সাহসে ব্যক্ত কর?'

দেখা যাচ্ছে, যে সমাজে 'লেসে-ফেয়ার'-এর সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকে, রেল-টেলিগ্রাফ বসলেও সেচ-ব্যবস্থা যায়, সেই **উনিবেশতন্ত্রের ভিত্তিতে** মধ্যস্বত্ব-ভোগীদের সামন্ততান্ত্রিক রক্ষণশীলতা তাঁদের শ্রেণীস্বার্থেরই সাংস্কৃতিক হাতিয়ার; তার জোর কম নয়। এই কারণেই তারা, যেমন কৃষকদের মেরুদণ্ড সোজা হোক চায় না, নারীর সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক চায় না, তেমনি কল-কারখানার প্রসার হোক, শিল্প-পুঁজিবাদের প্রয়োজনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ হোক, সেটাও চায় না।

'আনন্দমঠ'-এর শেষে সত্যানন্দের হাত ধরলেন মহাপুরুষ; বঙ্কিমচন্দ্র বললেন: কে কাহার হাত ধরিয়াছে? জ্ঞান আসিয়া ভক্তির হাত ধরিয়াছে; ধর্ম আসিয়া কর্মকে ধরিয়াছে।' একদিকে সৈয়দ আহ্মদের উগ্র ইসলামী ভক্তিবাদ, অপরদিকে রাজনারায়ণ-শশধর তর্কচূড়ামণি-বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদীদের উগ্র সাম্প্রদায়িক ভক্তিবাদ—এই দুই গোঁড়ামির চাপ যেমন জ্ঞান ও কর্মের বস্তুবাদী চিন্তা-দর্শনের ধারাকে ঘাড় ধরে থামিয়ে রাখতে চেয়েছে, তেমনি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষ সঞ্চারে আদাজল খেয়ে নেমে পড়েছে। বঙ্কিম যে তাঁর 'বঙ্গদর্শন'-এ ১৮৭৩ সালে 'নীলদর্পণ'-এর সমাজচেতনাকে লঘু ও কটাক্ষ করেছেন, পাবনার কৃষকবিদ্রোহের ঘটনায় আহত হয়েছেন, মীর মোসারফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ'কে 'জলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া নিষ্প্রয়োজন' বিবেচনায় ব্রিটিশ সরকারের কাছে নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করেছেন, এ সবের মধ্যে কৃষক জাগরণ, হিন্দু মুসলমান ঐক্য ও বস্তুবাদী চিন্তা ও গণচেতনা সম্পর্কে তাঁর বীতরাগই প্রকাশ পেয়েছে। বলাবাহুল্য, রামমোহন, বিদ্যাসাগর অক্ষয় দত্ত ডিরোজিও ডেভিড হেয়ার প্রমুখ 'আলোকপ্রাপ্ত'দের যুক্তিবাদী সামাজিক আন্দোলন, নীলদর্পণ-জমিদার দর্পণ' প্রভৃতি কৃষকসংগ্রামের গণ-নাটক এবং হিন্দুমেলা বা বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্ব-কৃষ্ণচরিত্র-আনন্দমঠ-দেবী চৌধুরাণী প্রভৃতি সৃষ্টি কোন ব্যক্তির বা কয়েকজন ব্যক্তির 'বিশুদ্ধ ইচ্ছা' প্রসূত ছিল না। তা ছিল **সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা ও সম্পর্কগত বিরোধ-সংঘাতের** ইতি-নেতির প্রতিফলন। গুপ্তকবি

যখন বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে ব্যঙ্গ করে গান ধরেন 'আমাদের দিতে নাগর এলেন গুণের বিদ্যাসাগরী' তখন নাস্তিক বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রবিচারের (এঙ্গেল্‌স যাকে 'হেরেসি' বা 'প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদ' বলেছেন) উল্লেখ করে বঙ্কিমের 'কপট' বলে কটাক্ষ করার মানে বোঝা যায়। অবশ্য বঙ্কিম সম্পর্কে রক্ষনশীল উগ্র হিন্দুত্বের প্রশ্নটা গোড়ার দিকে ছিল না; দেশীয় বুর্জোয়া বিকাশের অপেক্ষাকৃত অপরিণত স্তরে, হিন্দুমেলারই পর্বে আমরা দেখেছি, তিনি বঙ্গদর্শন-এ 'ভারতের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা' (১৮৭৩), 'বাঙ্গলার ইতিহাস' (১৮৭৪), এবং মীর মশারফ হোসেনের 'গৌরীসেতু' কাব্যবিচার প্রসঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ অতীত ভারতকেই বড় করেছেন এবং এই সময়েই 'আর্যদর্শন'-এর সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণও সম্প্রদায়নিরপেক্ষ ভারতবোধ গড়ার আবেদন রেখেছেন।

যতদিন পর্যন্ত নিম্ন-মধ্যবিত্ত শিক্ষিত অংশের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ বা 'ভারতসভা' (১৮৭৬, ২৬ জুলাই) স্থাপিত হয়নি, জাতীয় বুর্জোয়া শিল্পপতি ও শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুদয় হয়নি, ততদিন পর্যন্তই জমিদার ও মধ্যস্বত্ব-ভোগীদের মধ্যে, ব্রিটিশ সহযোগিতার প্রশ্নে মতাদর্শগত বিরোধের কারণগুলি সাহিত্য ও পত্র-পত্রিকায়, চিন্তায় ও অনুভবে প্রকাশ পেয়েছে। এই বিরোধই হিন্দুমেলার পুনরুজ্জীবনবাদী ও সৈয়দ আহমদের উগ্র মুসলিম আন্দোলনের মাঝে আর্যদর্শন ও বঙ্গদর্শন-এর মধ্যপন্থা গড়ে ওঠার কারণ। ১৮৫৭ সালের পর ব্রিটিশ শাসক, হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে সমৃদ্ধ জাতীয় বিদ্রোহের ঘটনায় আতঙ্কিত হওয়ায়, জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ ও গণ-বিক্ষোভ দমানোর প্রশ্ন ছাড়াও, আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে আর্থিক সঙ্কট ও বাজার দখলের সমস্যার কারণে ক্রমশঃ, এদেশের শাসন-শোষণকে দীর্ঘস্থায়ী করার বাসনায়, প্রতিক্রিয়ার শিবিরকে জাগিয়ে তুলতে ও নানাভাবে মদত দিতে নেমে পড়ে। রজনীপাম দত্ত তাঁর 'ইণ্ডিয়া টু ডে' গ্রন্থে বলছেন: "The path of social reform was no longer actively pursued, but gave place more and more markedly to zealous protection of every reactionary religious survival and custom. The Queen's Proclamation of 1858, while making a show of granting racial equality between Indians and English (with regard to which the subsequent viceroy, Lord Lytton frankly declared that 'these claims and expectations can never be fulfilled'), emphasised the determination of the

Government to abstain from all interference with religious belief or worship and gave the pledge to the consevative forces of Indian society that due regard will be paid to the ancient rites, usages and customs of India." একই শতাব্দীর প্রথম ও শেষের মধ্যে **ব্রিটিশ ধনতন্ত্রের চরিত্র ও গতি বদলেছে**; শেষ কয়েক দশকের মধ্যে গোটা ইউরোপীয় ধনতন্ত্রের সঙ্গে ব্রিটেনের ধনতন্ত্রও ক্রমে পচনশীল ও পরজীবী সাম্রাজ্যবাদী স্তরে রূপান্তরিত হয়ে, স্বভাবতই প্রথম দিককার গঠন ও সংস্কারমূলক প্রগতিশীল ভূমিকা ছেড়ে পীড়নমূলক ও প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকায় নেমে এসেছিল; ব্রিটেন নিজেই তখন বেকন-লক-হব্‌স থেকে সরে এসে সাম্রাজ্যবাদের সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতার দর্শন বানিয়ে ফেলেছে এবং তখন প্রাধান্য নিয়েছে হার্বার্ট স্পেনসার, মিল ও কোঁৎ-এ প্রমুখ ভাববাদীদের দার্শনিক লাইন। বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্ব ও কৃষ্ণচরিত এরই ফলশ্রুতি এবং কালীকে মাতৃশক্তির প্রতীকে ব্যাখ্যা করা, ভৈরবী-চণ্ডীর বিশ্বতত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে বিপিন পাল, অরবিন্দ-অনুশীলন সমিতির হিন্দু বিপ্লবের রণনীতি, 'শিখের বলিদান' ও 'শিবাজী-চরিত' প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক বইয়ের ব্যাপক প্রচার প্রভৃতি ঘটনা এই পর্বের বৈশিষ্ট্য।

১৮৫৩ সালে বোম্বাইয়ে প্রথম সূতাকল স্থাপিত হওয়ার পর ১৮৮০ সালের মধ্যে বহু কল-কারখানা হয়েছে ও শ্রমিকের সংখ্যা বিপুলভাবে বেড়েছে। গ্রামবাংলায় শতাব্দীর প্রথমার্ধে যেখানে সাতটি দুর্ভিক্ষের ঘটনা হয়েছে, দ্বিতীয়ার্ধে সেখানে চব্বিশটি হয়েছে এবং এরই মধ্যে শেষ কয়েক দশকে হয়েছে আঠার বার। দুর্ভিক্ষ বাড়লে বিদ্রোহের ঘটনাও, সেই অনুপাতে না হলেও, বাড়ে। অতঃপর যে সময়ে 'ভারতবর্ষ বিপ্লবী অভ্যুত্থানের দ্বারপ্রান্তে' এসেছিল, সেই সময়ে ব্রিটিশ আমলাদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের (১৮৮৫) প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সমাজ ও রাজনীতির এই পালাবদলের সঙ্গে জাতীয় সংস্কৃতির দিকস্থিতিও ক্রমে বদলে গেছে। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশশক্তির সঙ্গে দেশীয় বুর্জোয়াশক্তির বিরোধও যেমন বেড়েছে, শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর বিক্ষোভ-আন্দোলনের বিপরীতে বার বার সমবেত হয়েছে ব্রিটিশ শাসক, দেশীয় বুর্জোয়াগোষ্ঠী ও জমিদার-মহাজনের দল। এই রাজনৈতিক দিকস্থিতির ফলেই, রাজনীতির সঙ্গে সমাজচেতনা যাতে মিলতে না পারে, সেজন্য 'বন্দে মাতরম্' 'বন্দে হরিচরণারবিন্দ', 'শিবাজী উৎসব' 'ভবানী মন্দির' 'কৃষ্ণচরিত্র', 'ধর্মতত্ত্ব' প্রভৃতি ঘটনা দিয়ে হিন্দু-ভক্তির সঙ্গে স্বদেশপ্রেমকে মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

ইতিমধ্যে পাশ্চাত্য যুক্তিবিজ্ঞানের শিক্ষা, সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে হলেও, ক্রমে বেড়েছে; জাতীয় বুর্জোয়াচেতনার সূত্রপাত হয়েছে; শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুর্দশা ও বিক্ষোভ বেড়েছে। স্বভাবতই শতাব্দীর প্রথম দিককার প্রগতিশীল যুক্তিবাদী মানবতার ধারা ঐতিহ্যসূত্রে এসে সমকালের সংকটে ও বিরোধে কাজ করতে শুরু করেছে। তাই দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের যখন ষোল বছর বয়স, হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদের যখন রমরমা বাজার, তখন ১৮৭৭ সালে বঙ্কিমেরই 'বঙ্গদর্শন'-এ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'সমাজ পরিবর্ত কয় প্রকার' প্রবন্ধে বললেন:

"বাড়িটি যখন সম্পূর্ণরূপে জরাজীর্ণ হইয়াছে, যখন একটু বাতাসেই বনিয়াদ শুদ্ধ নড়ে, যখন নোনা লাগিয়া সব ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, অশ্বত্থ গাছের শিকড় যখন তেতলা হইতে নামিয়া মাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সেই বাড়ীটি ভাঙিয়া ফেলাই ভাল নয়কি?....হিন্দু সমাজ কতকেলে সমাজ যে তাহার ঠিকানা হয় না। ইহার বনিয়াদ অতি সংকীর্ণ মনুর সংহিতায় দেখিতে পাই। ভারতবর্ষ যখন অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল, যখন এলাহাবাদের এদিকে আর্যদের নাম ছিল না, যখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বৈ জাতি ছিল না, তখন এই সমাজ ছিল। তাহার পর কত ধর্ম, কত বিপ্লব হইয়া গিয়াছে, কত নূতন শাসন-প্রণালী হইয়া গিয়াছে, এখন ২০০০ জাতি হইয়াছে। ভারতের অর্ধেক মুসলমান হইয়াছে। ইংরাজরা সর্বশক্তিময়ী ডানা বিস্তার করিয়া সকলকে চাপা দিয়া রাখিয়াছে; হিন্দু সমাজের জাঁকটুকু ছাড়া আর কি বা আছে? এখনো কিনা আমরা হিন্দুসমাজকে ভারতসমাজের সঙ্গে এক করিয়া ধরি! কী ভুল! এমন হিন্দুসমাজের যত শীঘ্র সম্ভব বিলোপ হয়, ততোই ভাল।"

দেখা যাচ্ছে, ধর্মগত স্বাদেশিকতার পাল্টা আর একটা ধারাও গড়ে উঠেছে; তা হল, সাধারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে জাতীয়তা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের রাজনীতিবোধ; তাছাড়া **ধনতন্ত্র কেবলই সম্ভ্রান্ত কুলীন ও অনভিজাত ব্রাত্যদের প্রায় একই দারিদ্র্যরেখায় দাঁড় করায় না,** মিলমিশ খাইয়ে কাঁধে কাঁধ দিয়ে দাঁড়াতেও বাধ্য করে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও এদেশের রক্ষণশীল শক্তি ধনতন্ত্রের পূর্ণ ও অবাধ বিকাশে বাধা দিলেও, ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতন্ত্রবোধে উদ্দীপিত স্বদেশ-চেতনার জোয়ারকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি এবং এই কারণেই, এনলাইটেনমেণ্ট-এর প্রভাব, রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র ঐতিহাসিক আবির্ভাব ও বিবেকানন্দের বাণী ও বক্তৃতার সমাজ বাস্তবতার ধারাও অব্যাহত থেকেছে।

জাতীয় কংগ্রেস তখন ভারতীয় রাজনীতি, সংস্কৃতি ও স্বদেশচেতনার নেতৃত্ব

দিতে শুরু করেছে; এর মধ্যে সমাজের দুটো শক্তির সমাবেশ হয়েছিল—জাতীয় বুর্জোয়া ও জমিদার-মহাজনদের শ্রেণীস্বার্থ। প্রথম দিকে মডারেট অংশ সরকারের উচ্চতর প্রশাসনে স্থান পাওয়ার ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের মধ্য দিয়ে সকল রকম মধ্যযুগীয় পশ্চাৎপদতার বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম করার প্রশ্নেই ব্রিটিশ সহযোগিতার নীতি নিয়েছিল; কারণ তারা বুঝেছিল, রাজ–নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার শক্তি তাঁদের নেই। । কিন্তু **ক্ষয়রোগে আক্রান্ত সাম্রাজ্যবাদ,** শ্রমিক–কৃষকদের তো দূরের কথা, উপনিবেশের বুর্জোয়া শ্রেণীরও শক্তি, সচেনতা ও সমৃদ্ধিকে ভয় করে; সুতরাং অচিরেই মডারেট কংগ্রেস নেতাদের আশাভঙ্গ হল। গোখেল বললেন: 'the British bureaucracy was growing frankly selfish and openly hostile to national aspirations. It was not so in the past.' এরই ঠেলায় গড়ে উঠল মহারাষ্ট্রের তিলক, বাংলার বিপিন পাল, অরবিন্দ ও পাঞ্জাবের লাজপৎ রায়ের নেতৃত্বে ব্রিটিশ–বিরোধী 'ন্যাশনালিস্ট' বা এক্সট্রিমিষ্ট অংশের উগ্র-হিন্দুয়ানি ও আর্যামির ধারা, যা হিন্দুমেলার পর মডারেট নেতাদের প্রাধান্যে কিছুটা স্তিমিত হয়েছিল। এই পর্বের 'ন্যাশনালিস্ট' আন্দোলনের উগ্রতার প্রভাবে মেহনতি মানুষের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জোর যেমন বেড়েছিল, তেমনি এর প্রতিক্রিয়ায় মুসলিম-সাম্প্রদায়িকতাও উগ্র এবং ব্যাপক হয়েছিল। ১৮৯২ সালে ভারত সংস্কার আইনে যে বীজ উপ্ত হয়, তার সঙ্গে এইসব হিন্দু ন্যাশনালিস্টদের গণেশ, ভবানী ও কালী মিশে ১৯০৬ সালের "মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠাকে প্রায় সুনিশ্চিত করে।

এই পর্বে জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা সম্পর্কে রজনীপাম দত্ত তাঁর গ্রন্থে বলেছেন: "Against the overhelming flood of British bourgeois culture and ideology, which they saw complelely conquering the Indian bourgeois and intelligenteia, they songht to hold forward the feeble shield of a reconstructcd Hindu ideology which had no longer any natural basis for its existence in actual life conditons. All social and scientific development was condemned by the more extreme devotees of this gospel as the conquerors' culture; every form of antiquated tradition, even abuse, privilege and obscurantism, were treated with respect

and veneration.” জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা সম্পর্কে এই মন্তব্য সাধারণভাবে সত্য হলেও জমিদারী-জোতদারী ও মহাজনী কৃষি-অর্থনীতির বাস্তবভূমিতে সামন্ততান্ত্রিক ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদ ও মধ্যযুগীয় প্রথা-সংস্কারের আগাছা গজাবে না, এটা হতেই পারে না; তবে ভারতীয় সমাজ ও জাতীয়তাবোধের ঐতিহ্যে শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মাদর্শের কোন বাস্তবভিত্তি নেই, এই অর্থে কথাটা সত্য।

“....স্ফীতকায় অপমান অক্ষমের বক্ষ হতে / রক্ত শুষি করিতেছে পান / লক্ষ মুখ দিয়া।”

আফ্রিকার বোয়ার যুদ্ধে, চীনের পল্লীতে পল্লীতে ব্রিটিশ বর্বরতাকে এবং স্বদেশের সাম্রাজ্যবাদী ও জমিদার মহাজনী রক্তচোষাদের নৃশংসতাকে ধিক্কার জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ ১৮৯৩ সালে যখন ‘এবার ফিরাও মোরে’ কবিতা লিখলেন, সেই সময়ে জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম নেতা ফিরোজ শাহ মেটার অক্ষম ও ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা গেল: ‘The Congress was indeed not the voice of the masses, but it was the duty of their educated compatriots to interpret their grievanes and other suggestions for their redress.” কিন্তু বুর্জোয়া-জমিদার মধ্যস্বত্বভোগী ও মহাজনদের প্রতিনিধিরা দুর্দশাক্লিন্ন জনগণের মধ্যে থাকবেন কি করে? তাদের দারিদ্র্য ও দুর্দশার মোচনের সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার ঘোষণা প্রকৃতপক্ষে ভণ্ডামি ও প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়। কারণ আর্যমি, হিন্দুয়ানি ও সাম্প্রদায়িক ভেদের দাওয়াই দিয়ে নিপীড়িত জনগণের ঐক্যের মেরুদণ্ড ভেঙে রাখা ও ঘুম পাড়িয়ে অতীত ও দৈবনির্ভর করে রাখাই যে জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক তথা সাংস্কৃতিক কর্মসূচী। রবীন্দ্রনাথ তখন প্রকৃত কবির সামাজিক ভূমিকায় উদ্দীপিত হয়ে আহ্বান জানালেন—

কবি, তবে উঠে এসো—যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহো সাথে, তবে তাই করো আজি দান।
বড়ো দুঃখ বড়ো ব্যথা—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র শূন্য বড়ো ক্ষুদ্র বদ্ধ অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু
চাই বল চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট।

এই সময়ে, ১৮৯৮ সালে তিলকের গ্রেপ্তারের ও সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের বিরুদ্ধে যে ‘কণ্ঠরোধ’ প্রবন্ধ লেখেন; তা তিলকের ‘ন্যাশনালিস্ট’ হিন্দুয়ানির জন্য নয়,

কবির গণতান্ত্রিক বিবেকের সাড়াতেই ঘটেছিল। আবার তখনকার 'ছিন্নপত্রাবলী'তে গ্রামের কৃষকজীবনের প্রতি যে মমত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছে, 'সোনার-তরী'র 'বসুন্ধরা' কবিতায় যে বিশ্বজনীন মানবতা, জীবনমুখীনতা ও গতি-বৈচিত্র্যের প্রতি অনুরাগের প্রতিফলন হয়েছে, তা ভাববাদী হলেও, গোটা জাতির জীবন ও সমাজবিকাশের চিন্তাচেতনায় মূল্যবান অবদান রেখেছে। যে সময়ে জাতির রাজনৈতিক নেতৃত্ব ধর্ম-শাস্ত্রীয় অচল অবরোধে সমাজকে বাঁধতে লেগেছে, জাতির প্রাণশক্তিকে, সমাজবিকাশের সমস্ত শক্তিকে খণ্ড-খণ্ড করে দুর্বল করে দিচ্ছে, সেই সময়ে কবি 'বসুন্ধরা' কবিতায় 'সর্বলোক সনে দেশে দেশান্তরে' মিলে যাওয়ার আকুতি প্রকাশ করলেন :

'নাহি কোন ধর্মাধর্ম, নাহি কোনো প্রথা
নাহি কোনো বাধাবন্ধ ; নাই চিন্তাজ্বর
নাহি কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব, নাই ঘর পর,
উন্মুক্ত জীবনস্রোত বহে দিনরাত
সম্মুখে আঘাত করি সহিয়া আঘাত
অকাতরে ; পরিতাপ জর্জর পরাণে
বৃথা ক্ষোভে নাহি চায় অতীতের পানে।'

জমি ও গ্রাম থেকে বিতাড়িত হয়ে অতীতের মোহ, আব্রুর জাল ও ঘরমুখো বিষাদ কাটিয়ে গফুর-এর (শরৎচন্দ্রের 'মহেশ') শহরের চটকলে কাজ করতে যাওয়া, নতুন জীবন ও সংঘাতের মধ্যে এগিয়ে যাওয়ার পটভূমি তো এখান থেকেই গড়ে উঠছিল! অবশ্য সার্ভেন্তিসের ডন কুইকজোটের মত অতীতের হারিয়ে-যাওয়ার প্রতি মোহমুক্ত মেজাজ এবং 'গোরা'র মত বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব যেমন এই পর্বেই ফুটেছে, তেমনি 'দুই বিঘা জমি'র উপেনের সন্ন্যাসীবেশে দেশে-দেশে ফেরা'ও, এই পর্বের অপূর্ণ বুর্জোয়া-বিকাশের ফল।

সমাজের এই রকম স্ববিরোধী গড়ন্ত অবস্থায় জাতীয় আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার জন্য ১৯০৫ সালে উগ্র সামাজ্যবাদের ঝানু প্রতিনিধি লর্ড কার্জন, অতঃপর দ্বিজাতিতত্ত্বের শ্লোগানকে সরকারী স্বীকৃতি দিলেন ; যার ফল, বঙ্গভঙ্গ ; গোটা জাতির ভাষা সংস্কৃতির ঐতিহ্যের ও রাজনৈতিক আশা–আকাঙ্ক্ষার মূলে এই রকম বর্বর আঘাত হানার বিরুদ্ধে জাতীয় কংগ্রেসের মডারেঠ অংশ তো বটেই, এমনকি হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার অন্ধকূপ থেকে 'অতি-বিপ্লবী' ন্যাশনালিস্টরের একাংশ প্রায় নীরব ভূমিকা নিয়ে প্রকারান্তরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের, একদিকে

১৯০৬ সালে 'মুসলীম লীগ' গঠনে অপরদিকে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন দমনে, ১৯০৭ সালে সভাসমিতি ও সংবাদপত্রের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারিতে সহযোগিতাই করল। উল্লেখযোগ্য, ১৮৭৮ সালে এই রকম কণ্ঠরোধ চালু হয়েছিল এবং যা ১৮৮২ সালে উদারপন্থী রিপনসাহেব তুলে নিয়েছিলেন।

অবশ্য বাংলার চরমপন্থী ন্যাশনালিস্টরা বিপিন পালের নেতৃত্বে অংশ নিয়ে এই সর্বভারতীয় চরিত্রের বঙ্গভঙ্গ-এর বিরুদ্ধে আন্দোলনকে দুর্বার করে তুলেছিলেন, যার দরুণ চরমে ও নরমে কংগ্রেস ভাগই হয়ে গেল (সুরাট; ১৯০৭)। এই পর্যায়ে বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের অগ্রণী ভূমিকা অবিস্মরনীয়। 'সুপ্রভাত' কবিতায় নির্যাতীত হিন্দু-মুসলমানজনগণের ঐক্যবোধ জাগাতে ঘোষণা করলেন—'মিলনযজ্ঞে অগ্নি জ্বালাবে বজ্রশিখার দাহনে' এবং জমিদার মহাজনদের সতর্ক করে বললেন: "তোমার শ্মশান কিংকরদল দীর্ঘ নিশায় ভূখারী / শুষ্ক অধর লোহিয়া লোহিয়া উঠিবে ফুকারি ফুকারি।"
এই বঙ্গভঙ্গের পটভূমিকাতে রচিত হয়েছে বর্বর ধর্মশাস্ত্রীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধে, হিন্দু-মুসলমানের সর্বভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবোধের মহান উপন্যাস 'গোরা', 'অচলায়তন' নাটক, 'অপমান'-এর মত কবিতা ও অজস্র স্বদেশী গান। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর 'Indian Nationalism—its principles and personalities' গ্রন্থে এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সম্পর্কে বলেছেন: 'It was Rabindranath who had first preaehd the duty of eschewing all voluntary associations with official activities; in a public meeting assembled in the Town Hall of Calcutta, it was Rabindranath who first propounded an elaborate scheme for the practical boycott of the administration of the furthest limits that the laws of the land allow us to do. The idea of Rakhi celebrations, first inaugurated on 10th october, 1905, the day when the partition was formaily efleeted, as a standing protest aganist the official attempt to divide the Bengalee race, originated with Rabindranath."
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রশাসন ও প্রতারণামূলক শুভেচ্ছার উপর নির্ভরতা ছেড়ে গোটা জাতিকে, অর্থনীতি ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে (গ্রাম-পঞ্চায়েত ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন) স্বনির্ভরতা ও আত্মশক্তি অর্জন করাই এই সংকট পরিস্থিতি

থেকে উত্তরণের পথ বলে কবি নির্দেশ করেছেন। উল্লেখযোগ্য যে, পরবর্ত্তীকালে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন ও শভিনিস্ট পশ্চাৎপদতা দেখে নিজেরই এই রকম নেতিবাচক প্রতিবাদের পথ পরিবর্তন করেছিলেন; তবে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর বিকাশের মুখে, **বিশ্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ইতিবাচক ও গঠনমূলক** শক্তির জাতীয় গুরুত্ব বেশী করে উপলব্ধি করার পরই, প্রকৃত অর্থে তিনি গান্ধীর পশ্চাৎপদ মতাদর্শ সম্পর্কে ক্রিটিক্যাল হয়েছিলেন।

বিংশ শতকের প্রথম দশকে অর্থাৎ প্রথম সামাজ্যবাদী যুদ্ধের পটভূমিকায় যে সময়ে সাম্রাজ্যবাদী শাসকরাই নিজেদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটে ক্ষতবিক্ষত ও বিভৎস হয়ে উঠেছে, সেই সময়ে তাদের প্রতি নির্ভর করে যে কোন জাতি নিজেদের দৈন্য ও দুর্দশার অবসান ঘটাতে পারে না এটা কবি উপলব্ধি করতে না পারলেও, চিন্তাধারাটা এর ধারেকাছে ছিল বলেই অনেকটা সঠিক জাতীয়তাবোধের সংগ্রামী প্রাণশক্তি জাগাতে 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' প্রভৃতি প্রবন্ধ, 'আমার সোনার বাংলা,' 'বাংলার মাটি বাংলার জল,' 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমনি শক্তিমান', 'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে' প্রভৃতি প্রাণ জাগানো স্বদেশী গান রচনা করেছেন। এই সময়েরই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা, ১৯০৬ সালে তিলকের ছয় বছরের কারাদণ্ডের প্রতিবাদে বোম্বাইয়ের সুতাকল শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট, যাকে লেনিন ভারতের শ্রমিকশ্রেণীব প্রথম রাজনৈতিক ধর্মঘট বলে অভিনন্দিত করেছেন। দেখা গেছে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন গোটা দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল, যা আবার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, ১৯১৭ সালের ঐতিহাসিক নভেম্বর বিপ্লবের পর নতুন বাঁক নেয়।

লক্ষ্য করার মত, রবীন্দ্রনাথের ঐ সব স্বদেশী গানে সরাসরি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য ও অত্যাচারের প্রশ্ন এসে পড়েছে। স্বদেশকে কোন পৌরাণিক বা হিন্দু ভাবাদর্শের দৈবপ্রতীকে বিমূর্তভাবে কল্পনা করা নয়; নিচে পড়ে থাকা মানুষের আত্মশক্তি জাগাতে, স্বদেশের ফুল-ফল, ক্ষেত-প্রান্তর সবকিছুই বাস্তব অনুভূতির সজীবতায় আত্মপ্রকাশ করেছে। আর যা প্রকাশ পেয়েছে, তা বর্বর শোষক ও শাসক শক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার চ্যালেঞ্জের সুর; কোন রকম করুণা কৃপা বা আবেদন নিবেদন নেই। এই ধারাতেই, অধিকতর বাস্তবভূমিতে সৃষ্টি হল, গোবিন্দদাসের স্বদেশী গান:

'এই যে দেশ শস্য ভরা
তোমার তো নয় একটি ছড়া

তোমার হলে তাদের দেশে চালান কেন হয়।
স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে এ দেশ তোমার নয়
তাদের কলে তোরাই কুলি, তারাই নিচ্ছে টাকার থলি
তোদের কেবল ভিক্ষা ঝুলি, ক্ষুধায় মৃত্যু ভয়
তারাই রাজা তারাই বণিক তারাই সমুদয়।'

যে কবির 'মগের মুলুক' কাহিনী কাব্য (সমকালের রাজনৈতিক ইতিহাসের দলিল) ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল, সেই গোবিন্দদাসের এই 'স্বদেশ'-এর গান ১৯০৫ সালে 'নবভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কবি মুকুন্দদাসও এই গানটি গেয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন বলে অনেকে মনে করেন এটি মুকুন্দদাসের গান। গোবিন্দদাসের আর একটি বিখ্যাত গান 'স্বাধীনতা,' ১৯০৯ সালে রচিত হয়েছে ;

'ও আমার স্বাধীনতা
তুই ছুঁলে তৃণকুটা সে যে হয় সোনা মুঠা
জাগুক দীনের দীন অধীন বাঙালী
রণ রণ ঝন ঝন ঘন করতালি।'

এই জাগরণ হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রতিরোধ চেতনার বিস্ফোরণ হোক—

'বজ্র পেলেম কই গো শুন বজ্র পেলেম কই ?
ভাই বলিয়া পরস্পরে ডাকি যখন স্নেহের ভরে
কণ্ঠে কণ্ঠে কণ্ঠে বজ্র গর্জে ওঠে ওই !' ('বজ্র পেলেম কই,' ১৯১১)

এই সময়ে যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের অপর নাম বিদ্রোহী চারণ মুকুন্দ দাসের লেখা 'হাসিতে খেলিতে আসিনি এ জগতে/করিতে হবে মোদের মায়েরই সাধনা' গানটি স্বদেশী আন্দোলনে গ্রাম-বাংলার মানুষকে দারুণ নাড়া দিয়েছিল। এইসব গানে ব্রিটিশ শাসন-বিরোধিতার জোয়ারে, তখনকার সামাজিক বিকাশের সীমাবদ্ধতার মধ্যেই, দাসত্বের গ্লানি ও জ্বালা সম্পর্কে তীব্র অনুভূতি ও স্বাধীনতার জন্য দুর্বার বাসনা প্রকাশ পেয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, এইসব গান, গ্রামে-গ্রামে অভিনীত নানা দেশাত্মবোধক যাত্রা-পালাতেও গীত হয়েছে। এ সবের মধ্যে 'মহাপূজা'র যাত্রাকার কুঞ্জ গাঙ্গুলী ও হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের স্বদেশাত্মক পালাগানের কথা উল্লেখ করার মত। এ সব গান অভিজাতদের আসরে 'অলীক কুনাট্য রঙ্গ' (মাইকেল) গান ছিল না, এগুলি ছিল গোটা জাতির প্রাণের ভাষায় চারণকবিদের গান এবং সেইভাবেই গেয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনকে সজীব করে রাখা হত।

ব্রিটিশরাজের বর্বর দমন-পীড়নের যন্ত্র কী ভয়ংকর ভাবে গোটা জাতির বুকে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছিল, কবি-শিল্পীর কণ্ঠ কী নির্মমভাবে রুদ্ধ করা হয়েছিল, তা মূর্ত হয়েছে কবি কামিনী ভট্টাচার্যের এই গানে : 'শাসন সংযত কণ্ঠ জননী / গাহিতে পারিনা গান....'

এই গানে মানুষের গান থামে না, আরো ছড়িয়ে পড়ে; সময়ের বাঁকে বাঁকে, যুগ হতে যুগান্তরে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ সুরু হওয়ার মাস পাঁচেকের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'এবার লড়াই বৈশ্যে ও শূদ্রে, যার পলিটিকাল তর্জমা করলে দাঁড়ায় ক্যাপিটালিজম ও সোশ্যালিজম-এর সংঘাতই হল যুগসংস্কৃতির প্রাণসত্য। কাজেই আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের এবং সমগ্র বিশ্ব-সংস্কৃতির উত্তরাধিকারে মানুষের মধ্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা বোঝার বা উপলব্ধি করার নিরিখটা কি হবে? তা হল, **ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ভিত্তিতে** যুগ হতে যুগান্তরের, এক সমাজ হতে উন্নততর সমাজের ধারায় অতীত সভ্যতাগুলির মূল্যায়ন; প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মানুষ তিলে তিলে মহত্ত্ব অর্জন করেছে, দেবতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মানুষ, হাজার হাজার বছরে নানা দুঃখ-যন্ত্রণাময় ও জটিল বাঁক পার হয়ে নিজের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে এসেছে। এরই মধ্যে পিছুটান, স্থিতাবস্থা ও অগ্রগামী ইতিবাচক শক্তির ধারাটি এবং পূর্বসূরীদের সাফল্যগুলি বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারি, তবে আমরা বর্তমান সমাজেও সুস্থ ও ইতিবাচক সংস্কৃতির মুখটি চিনে নিতে পারব, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উপযুক্ত পটভূমি গড়ে যেতে পারব।

কলম-সৈনিক প্রেমচন্দ

মুন্সী প্রেমচন্দ ছদ্মনাম। পরাধীন দেশে মানুষকে, বিশেষকরে নিচুতলার দুর্দশাজীর্ণ নিপীড়িত মানুষকে ভালবাসা ও মর্যাদা দেওয়া রাজনৈতিক অপরাধ, তাই ধনপত রায়কে কখনও নবাব রায়, কখনও প্রেমচন্দ হতে হয়। ১৮৮০ সালের ৩১শে জুলাই বেনারস থেকে চার মাইল দূরে সারনাথের কাছে লমহী গ্রামের এক কায়স্থ পরিবারে প্রেমচন্দের জন্ম। পিতামহের ছিল পাটোয়ারী ব্যবসা, পিতা ছিলেন ডাকঘরের কেরানী; নিজের ছিল শিক্ষকতার কাজ আর পাঁচ-ছয় বিঘা জমির চাষ। তাঁর কর্ম ও সৃষ্টির ক্ষেত্র ছিল মুঘল আমলের সামন্ত অবশেষের সঙ্গে দুর্বল পুঁজিবাদী বিকাশের মিশ্র সমাজ; বেনারস, কানপুর, এলাহাবাদ, লখ্‌নৌ ও গোরখপুরের প্রধানতঃ গ্রাম-সমাজ।

যে কোন দেশের যে কোন যুগের মহান স্রষ্টার মধ্যে কেবলই সমকালের বাস্তব পরিবেশজাত চিন্তা-চেতনা ও আবেগ-অনুভূতি কাজ করে না, তার সঙ্গে মিলেমিশে থাকে অতীত ঐতিহ্যের দ্বন্দ্বমূলক বিকাশের উপাদান। প্রেমচন্দের জীবনসীমা ১৯৩৬ সালের ৮ই অক্টোবর পর্যন্ত; যদিও পাশ্চাত্য রেনেসাঁস ও এনলাইটেনমেণ্ট হিন্দী সাহিত্যের জগতে বাংলার তুলনায় অনেক পরে এসেছে, তবু আধ্যায়নিক যোগসূত্রে ও সামাজিক উত্তরাধিকারে তিনি যেমন সুফীদর্শনে সমৃদ্ধ উর্দু ও ফারসী সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন, তেমনি ইতালির ম্যাৎসিনি-গ্যারিবল্ডি, রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, গান্ধী, ভগৎ সিং, গোর্কি ও বলশেভিক বিপ্লবের প্রভাবে গড়া মিশ্র ব্যক্তিত্ব অর্জন করেছিলেন।

প্রেমচন্দের কথা সাহিত্যের সবচেয়ে বড় অবদান হল, যে সময়ে গোটা সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে অবক্ষয় জনিত অলীক উদ্ভট ভোজবাজী ও ধর্মীয় কুসংস্কারের বান ডেকেছে, সেই সময়ের গর্ভ থেকে মানুষে মানুষে ভেদের রূপরেখা, গ্রামীন সমাজের সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচার, নতুন কল-কারখানার বুর্জোয়া ব্যবস্থার নীতিহীন ভ্রষ্টাচারের ছবি ও মানুষের মর্যাদাবোধের জাগরণ বাস্তবসম্মত শিল্পভঙ্গীতে নিজের অজস্র সৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করেছেন। প্রেমচন্দকে হিন্দী সাহিত্যের শরৎচন্দ্র বলার একটা ঝোঁক রয়েছে। কে বড়, কে ছোট, সাহিত্য বিচারে এই রকম নিক্তিতে ওজন হয় না; তবু চিরস্থায়ী; বন্দোবস্তের

গ্রাম বাংলার সমাজকে কেবলই বর্ণ কৌলিন্যের জালে বাঁধা মধ্যবিত্ত কাঠামোর মধ্যে দেখা ও তুলে ধরা এবং তার মধ্যেকার ভাঙ্গাগড়া ও টানাপোড়েন প্রতিফলিত করা এক জিনিস, আর উত্তর ভারতীয় তালুকদারী এবং নব উদ্ভূত বণিকী পুঁজির আশ্রয়ে পুষ্ট মহাজনী ছোবলে জর্জরিত **লক্ষ কোটি কিষান জনতার জমিহারা ক্ষেতমজুরে** পরিণত হওয়ার, জন্ম জন্মান্তরের ক্রীতদাসে পরিণত হওয়ার জীবন্ত দলিল রচনা গুণগত ভাবেই অন্য জিনিস। সময় ও সমাজের ভাঁজে ভাঁজে জীবন, আর সেই জীবনকে মেলে ধরা ও নতুন সম্ভাবনার রেশ রেখে যাওয়াই মহান স্রষ্টার সংজ্ঞা ; এই বিচারে প্রেমচন্দ্র ভারতের এক যুগ-সন্ধিক্ষনের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে মহান স্রষ্টা। কেউ বলেন, তিনি হিন্দী সাহিত্যের গোর্কি ছিলেন। প্রেমচন্দের জীবন ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ থেকেই এই অভিধা আসে সত্যি, কিন্তু 'গোদান'-এর মত উপন্যাস কিংবা 'কফন' ও 'ঈদগাহ'র মত কয়েকটি গল্প নিঃসন্দেহে গোর্কির রচনার সমতুল হলেও, প্রথমতঃ নতুন বুর্জোয়া ধনতন্ত্রের শিল্প কারখানার মধ্যে জীবন সংগ্রামের শরিক হয়ে সুখী ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতকে করায়ত্ত করতে পারে এই দ্বন্দ্বমূলক বিকাশের বোধ প্রেমচন্দের আসেনি, উপরন্তু এই বুর্জোয়া সমাজের নেতির দিকটাই দেখে ঘৃণায় বর্জন করেছেন ; দ্বিতীয়তঃ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি মানবিক মর্যাদার সন্ধানে ও প্রতিষ্ঠায় সাবেকী সামন্ত সমাজের সরল বন্ধন ও বিশ্বাসের আশ্রয়ে ফিরে যেতে চেয়েছেন ; কার্লমার্কস কথিত 'প্রাচ্য স্বৈরাচারের' বিভৎস সামাজিক প্রতারণার স্বরূপ বুঝতে না পারার দরুণই এটা হয়েছে। অবশ্য তিরিশের দশকে পৌছে **বলশেভিক বিপ্লব ও লেনিনের** কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আন্দাজ ও উপলব্ধি তাঁর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটিয়েছিল। ১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বরে লেখা 'মহাজনী সভ্যতা'—চিন্তার জগতে এই উত্তরণ তাঁর সৃষ্টির মধ্যেও প্রতিফলিত হতে পারত যদি আরও দু-পাঁচ বছর অন্ততঃ বাঁচতেন।

মহাভারতের সভাপর্বে রয়েছে, নারদমুনি রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করছেন : রাজ্যের কৃষক প্রজারা সন্তোষ সহ দিনযাপন করছে কি? তাদের ঘরে বীজ ও অন্নাদির অভাব নেই তো? রাজ্যের মধ্যে স্থানে স্থানে তড়াগ ও সরোবর খনন করা হয়েছে তো? কৃষিকাজ বৃষ্টিনিরপেক্ষ রাখার ব্যবস্থা হয়েছে তো?

হিন্দু ভারতে ভূমি রাজার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না; তা ছিল গ্রামীন প্রজাসাধারণের যৌথ সম্পত্তি। রামকমল মুখোপাধ্যায় তাঁর 'ভারতের ভূমি সমস্যা' বইতে বলেছেন: "কি রাজতান্ত্রিক কি সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় জমির স্বত্ব যৌথভাবে কৃষকেরা ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর ছিল না।" আকবরের মর্মর-মূর্তিতে খোদাই রয়েছে: হিন্দুস্থানের আগেকার রাজাদের উপঢৌকন ও কর হিসাবে উৎপন্ন শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ দেওয়া হত। মহামান্য সম্রাট কর্তৃক সমগ্র উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ খাজনা হিসাবে ধার্য হয়েছে। সপ্তদশ শতকের শেষার্ধ থেকে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সময়, বিশেষ করে ঔরঙ্গজেবের পর দিকে দিকে খাজনা আদায়কারী অফিসাররাই বেপরোয়াভাবে নিজেদের খুদে সামন্ত প্রধানের ভূমিকায় জাহির করে এবং প্রায় আধা-আধি ভাগ আদায় করতে থাকে।

ব্রিটিশ শক্তি এদেশে এসে এই পুরোন কাঠামোর গ্রামীন অর্থব্যবস্থা ভেঙে দেয়। অবশ্য যদিও অবাধ বাণিজ্যগত শিল্প-পুঁজিবাদের সঙ্গে অপরিহার্য শক্তিরূপে কিছু বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষারও প্রবর্তন হয়, তবু তা আদৌ বুর্জোয়া পুঁজিবাদের ব্যাপক সাংস্কৃতিক বিপ্লব ছিল না; কারণ তা ছিল গ্রামীণ ভারতের জমিদারী বা তালুকদারী বন্দোবস্তের সঙ্গে **মিশ্র-অর্থনীতির দুর্বল ও ধীরগতির বিকাশ**। এর সঙ্গে পুরোন সামন্ততান্ত্রিক উপরিথাকের জের তো ছিলই। তাই গোটা শতাব্দীর লেখক বুদ্ধিজীবী ও জনগণের একাংশ কখনও পুরান সমাজে ফিরে যেতে চেয়েছে; কোন অংশ বেরিয়ে এসেও সামনে নতুন কোন আশ্রয় পাচ্ছে না; অর্থাৎ দোটানায় ঠোকাঠুকি হচ্ছে; আর কিছু অংশ সামনে-পিছনে কোথাও স্বস্তি না পেয়ে বেপরোয়াভাবে নিজেদের ভেঙে খান-খান করেছে। আমরা দেখেছি, দেশী কুটিরশিল্প সহ গ্রামের যৌথ অর্থকাঠামোর উচ্ছেদ হলে, দেশের সোনা-দানা চালান হলে, দেশী মূলধন সৃষ্টির বাধা হলে দেশের বণিক ও কারিগরদের বিরাট অংশ শ্রেণীচ্যুত হয়েছে, সাবেকী জমিদারীগুলিও ভেঙে গেছে এবং তার উপর নির্ভরশীল এতদিনকার সুবিধাভোগী উচ্চবর্ণের সামাজিক কেতাবিশিষ্ট পরিবারগুলি বৃত্তিহীন হয়ে ক্রমেই সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে।

রমেশ দত্ত তাঁর 'ভারতীয় অর্থনীতির ইতিহাস' বইতে দেখিয়েছেন, খাজনা মেটাতে ঋণ, ঋণের দায়ে জমি বন্ধক, শেষে জমিদার ও তালুকদারের জমিতে বংশানুক্রমিক ক্রীতদাসত্ব। এই হল ব্রিটিশ ভারতের কৃষকজীবনের রূপরেখা।

"সর্বত্রই একটা অস্বস্তিকর অবক্ষয়ের পরিবেশ, কেউই নিজেকে স্বাভাবিক

ভাবতে পারছে না। দেশের ব্যবসা-বণিজ্য, শিল্প ও কৃষি ক্ষেত্রে কোন কিছুই হচ্ছে না। কৃষক, ব্যবসায়ী এবং কারিগররা রক্তচোষা সরকার ও অসৎ ব্যবসাবৃত্তির দ্বারা দ্বিমুখী চাপের মধ্যে পড়েছে....সব কিছু ছিঁড়ে যাচ্ছে, ভেঙে পড়ছে এবং অতিক্রুত তলিয়ে যাচ্ছে; কিন্তু কোথাও কোন বিন্দুমাত্র উপযোগী পরিবর্তনের রেশ পাওয়া যাচ্ছে না।" ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) সময়ে থেকে ১৮১৫ সালের মধ্যে জার্মানীর অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে **এঙ্গেলস তাঁর জার্মানীর অবস্থা সংক্রান্ত** রচনায় যে চিত্র আঁকলেন, ভারতের ইতিহাসে ১৭৬৫ সাল থেকে প্রায় দেড়শ' বছরের অর্থ নৈতিক-রাজনৈতিক পটভূমিকা ও অবক্ষয়ের ছবিও বিকাশের স্তরের হেরফের সত্ত্বেও, অনেকটা এই রকমই।

দিল্লীর মোগলাই ভাঙনের ভয়ংকর গর্ভ থেকে উদ্ভূত মির্জা গালীব ভারতীয় সাহিত্যে যে মানবিক মর্যাদার ঐতিহ্য রেখে গেছেন, পূর্বতন কবি সাদী-ইরাকীও হাফেজের ধর্মের গোঁড়ামী ও আচার-বিরোধী ঐতিহ্যের যে ধারা অব্যাহত থেকেছে, তারই উত্তরসাধনার ক্রমপরিণতি প্রেমচন্দের সমাজসচেতন ও মানবিক মূল্য-বোধের কথা-সাহিত্য।

সমাজ-সংসারে যা কিছু মানুষে মানুষে ভেদ আনে প্রেমচন্দ তার বিরোধী ছিলেন; তাই নির্যাতীত অবদমিত শ্রেণীর প্রতি দরদ এবং অত্যাচারী ভণ্ড শয়তানের প্রতি ঘৃণা তাঁর সংবেদনশীল শিল্পী-ব্যক্তিত্বকে জ্যামুক্ত তীরে পরিণত করেছিল। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্যচেতনার ধারা সুফী দর্শনে সমৃদ্ধ পূর্বোক্ত উর্দ্দু ও ফার্সী কাব্য সম্পদের (ইকবাল সহ) মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টিপ্রেরণায় সঞ্চারিত হয়েছিল। অবশ্য এর সঙ্গে তাঁকে টেনেছিল **রামমোহন-রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দের** উদার ও আন্তর্জাতিক মানবতার ঐতিহ্য।

প্রেমচন্দ্র প্রায় বারখানি উপন্যাস লিখেছেন, নাটকও লিখেছেন দুতিনটি; সারা জীবনে পাঁচ ছয়টি পত্র পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন এবং প্রায় আড়াইশ' গল্প লিখেছেন। খুব অল্প বয়সেই (১৯০১) সাহিত্য রচনার সুরু হয় এবং তাঁর কাঁচা বয়সের 'কজাকী' 'হোলী' এবং 'চোরী' প্রভৃতি গল্পে তাঁর বালককালের স্মৃতি ছড়িয়ে রয়েছে, অনেকটা শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত (১ম ও ২য়) উপন্যাসের মতো। যখন মাত্র আট বছর বয়স তখন মা মারা যান। তাঁর অনেক গল্পে মাতৃহীন ছেলের চরিত্র পাওয়া যায়, 'দুধ কা দাম' এমনই অপূর্ব গল্প। মাত্র পনের বছর বয়সে

তিনি পিতৃহীন হন। তার দু বছর পরে ১৮৯৭ সাল নাগাদ তিনি বেনারসের স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পাশ করেন। বরাবরই তাঁর পড়ায় ঝোঁক ছিল প্রবল। উর্দু ফার্সী ভাষায় নানা ধরণের বীরত্বের কাহিনী ও নভেল অল্প বয়সেই পড়ে ছিলেন। কলেজের পাঠ শেষ করে তিনি পুনা, চুনার, এলাহাবাদ ও কানপুর অঞ্চলে শিক্ষকতা ও সরকারী চাকরী করেছেন। নিজের সাদামাটা জীবন সম্পর্কে নিজেই আত্মজীবনীমূলক কাহিনীতে বলেছেন, 'আমার জীবনটা সমতল জমির মত। খানাখন্দ যে একেবারেই নেই, তা নয়। তবে পাহাড়, অরণ্য, টিলা, দেউল মন্দিরের ভগ্নাবশেষ কিছুই নেই।'

যেমন নিজের সরল ও সাধারণ জীবন, তেমনি তাঁর চারিদিকের সমাজ ও মানুষজনকে, সরল ও সাধারণ কৃষকজীবনকে, সরল বিশ্বাস, উদার মানবতাবোধ ও বস্তুনিষ্ঠ খোলা মন নিয়ে খুব কাছাকাছি থেকে দেখেছেন এবং সেই দু-বেলার সমাজ সংসারের সঙ্গে খুব সহজভাবে মিশেছেন। তাই তাঁর গল্প উপন্যাসের মধ্যে প্রকাশভঙ্গীর কৃত্রিমতা বা কষ্টকল্পিত ষ্টাইলের কেরামতি আদৌ পাওয়া যাবেনা; যে অজ্ঞ মূর্খ ও দুর্দ্দশাক্লিষ্ট কৃষকজীবন ও গ্রামসমাজ তিনি শব্দের ছবি এঁকে ফুটিয়েছেন, তা সকলেরই বোধগম্য বলেই, তথাকথিত ভঙ্গীসর্বস্ব শিক্ষিত লেখক বুদ্ধিজীবিদের পক্ষে নিতান্তই কঠিন কাজ। প্রেমচন্দ চেয়েছিলেন পিছিয়ে পড়া মানুষকে তুলেও ধরতে; তাই তাঁর ভাষায় সারল্য ও আবেগ বেশী, লজিক কম। তিনিই প্রথম হিন্দী সাহিত্যিক যিনি অশ্লীল ও অবাস্তব ক্ষেত্র থেকে **সাহিত্যকে বাস্তব জীবনমুখী** করেন সমাজ সচেতন দৃষ্টির সম্পাতে। তিনি বাস্তবের তীক্ষ্ণ দিককে মোলায়েম করেন নি, অথবা ক্ষমার অযোগ্য যা কিছু, তার প্রতি ক্ষমা দেখিয়ে দুর্বলতার পরিচয় দেননি।

প্রথম উপন্যাস 'মন্দিরের রহস্য' (১৯০৩)-তেই প্রেমচন্দ ধর্মশাস্ত্র, মন্দির ও পাণ্ডাগিরির মুখোশ খুলে দিয়েছেন, সমাজের কুশ্রীতা ও ভণ্ডামীকে তিনি কখনই সহ্য করতে পারেন নি। তাঁর এই ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান ও ভেদাভেদ-বিরোধী মানসিকতা এসেছে সুফী দর্শন ও লোক-কবিতার ঐতিহ্য সূত্রে; উর্দু কবি হাফিজ-গালীবের উত্তরাধিকারে সমৃদ্ধ ইকবাল তাঁর প্রিয় কবি। এছাড়া বাংলার 'আলোকপ্রাপ্ত' সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব তাঁকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। বিশেষ করে রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ। পরাধীন দেশের লেখক-শিল্পী হিসাবে স্বভাবতই তিনি সমকালের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের রাজনৈতিক মতাদর্শের শরিক হয়েছিলেন। যৌবনকালে তিনি গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থক

থাকলেও মনে মনে তিনি ছিলেন বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী। তিনি অসহযোগ আন্দোলনে সরকারী চাকরী ছেড়ে দেন ; কিন্তু তাঁর সাহিত্য কীর্তির জন্য সরকার যখন তাঁকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি দিয়ে কিনে নিতে চান, তখন তিনি খেতাবের প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। তাঁর সামনে তখন ১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লবের খবর। তিনি বুঝেছিলেন, দুনিয়ায় এখন থেকে নিচের লোক উপরে আসা স্বরু করেছে, সামাজিক ভূমিকম্প স্বরু হয়েছে। ১৯১৯ সালের পর তিনি গান্ধী-দর্শনের সমর্থক থেকেও 'কংগ্রেস জনতার প্রতি সহানুভূতিশীল নয়' এটা বুঝতে শুরু করেন এবং নানা পত্রে বন্ধুদের বলতেন : জমিদাররাই তো নেতা, ওরা গদিতে বসে জুলুম করে ; ওরাই অত্যাচারী ইংরাজদের সাহায্যকারী। তিনি ইতালির ম্যাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডিরও প্রচণ্ড ভক্ত ছিলেন। স্বাধীনতা রক্ত দিয়ে আনতে হয়, চেয়ে পাওয়া যায় না—এই মতে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে সংস্কারবাদী ধারায় থেকেও সমাজ ও জীবনকে শিল্পী হিসাবে বাস্তব-বাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার ও অনুভব করেছিলেন এবং ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যে 'রঙ্গভূমি', 'সেবাসদন', 'কর্মভূমি' ও 'গোদান'-এর মত দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-বিদ্রোহের কাহিনী সৃষ্টি করেছেন। এইসব রাজনৈতিক উপন্যাসে একাধারে সমকালের অসহযোগ আন্দোলন, **সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন** (ভগৎ সিং ও চন্দ্রশেখর আজাদ প্রমুখের) এবং চৌরী-চৌরা মালাবার ও তরাই বিদ্রোহের বলিষ্ঠ ছাপ রয়ে গেছে। তাঁর 'কর্মভূমি' উপন্যাসে কৃষকবিদ্রোহের পাশাপাশি শ্রমিক আন্দোলনের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও পুঁজিবাদী শোষণ বিরোধী ভূমিকা গৌরবের সঙ্গে স্থান পেয়েছে। প্রায় একই সময়ে ভারতের আর এক প্রান্তে শরৎচন্দ্র তখন লিখেছেন 'পথের দাবী', নজরুল লিখেছেন 'কুহেলিকা' ও 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস এবং প্রকাশিত হয়েছে গোর্কির 'মা'-এর অনুবাদ। প্রেমচন্দ্র সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাজনৈতিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে **শরৎচন্দ্রকেও ছাড়িয়ে গিয়ে** ভারতীয় সাহিত্যে পথিকৃৎ হয়ে রইলেন। তাঁর 'কর্ম্মভূমি' পড়তে গিয়ে গোর্কির 'মা' উপন্যাসের কথা বার বার মনে পড়ে। তাঁর 'গোদান' বিশ্ব-সাহিত্যের একটি মূল্যবান সংযোজন। এটি ১৯৩২ সালে লেখা স্বরু করেন এবং প্রকাশিত হয় মৃত্যু বছরে ১৯৩৬ সালে। ১৯২১ সালে মোপালা বা মালাবার বিদ্রোহকে সমর্থন জানিয়ে প্রেমচন্দ্র বলেছিলেন, বিদেশী শাসকদের চেয়ে দেশী তালুকদার ও ধনীক শ্রেণীর সঙ্গে লড়া শক্ত। এতে দেখিয়েছেন গ্রাম-শহরে শ্রমিক-কৃষক হিন্দু-মুসলমান উঁচু-নীচু ভেদ ভুলে সংগ্রামের জন্য

সচেতন হচ্ছে। গোদান-এ আমরা দেখেছি, সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদের পাপ ও ভণ্ডামিকে আক্রমণ করেছেন, ক্ষেতে কারখানায় মেহনতি মানুষ দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করছে, গ্রাম-শহরে ধনিয়া, মুন্সিয়া, মেহতা ও মালতীরা অস্থির হয়ে উঠছে, পাপ ও অন্যায় প্রতিহত করে 'ইনকিলাবী মহিমা' প্রকাশ করতে চাইছে, নয়া জমানার জন্য তৈয়ার হচ্ছে, কৃষক নেতা হোরী শহীদের মৃত্যুবরণ করেছে। গ্রামীণ ভারতের ছবি এভাবে আর কেউ আঁকতে পারেন নি। এ উপন্যাস বিদ্রোহী ভারতের, দুনিয়া বদলানোর মহাকাব্য। হোরী নিপীড়িত ও সংগ্রামী কৃষকশ্রেণীর প্রতিনিধি প্রতীকী চরিত্র, যেমন টলষ্টয়ের আনা কারেনিনার লেভিন।

প্রেমচন্দের সামাজিক ও পারিবারিক গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে যেমন রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ ও ইকবালের উদার মানবতাবাদের প্রভাব পড়েছে, তেমনি গান্ধীবাদের প্রভাবে প্রাচীন স্বনির্ভর যৌথ বন্ধনের গ্রাম-সমাজের, পুরোন সরল বিশ্বাস ও মূল্য বোধের যুগে ফিরে যাওয়ারও একটা প্রবণতা র'য়ে গেছে। তাঁর 'গল্পগুচ্ছ'-এর অনেক পাতায় এর পরিচয় ফুটেছে। পুরোন গ্রাম-সমাজ ভেঙ্গে যাচ্ছে, একান্নবর্তী পরিবারও বনিকী ও মহাজনী পুঁজির কালো ছায়ায়, নতুন বুর্জোয়া সমাজের নীতিহীন মূল্যবোধহীন স্বার্থপরতার চাপে ভাগ হয়ে যাচ্ছে—এর জন্য প্রেমচন্দের দেহ মন টনটন করে ওঠে। 'ভেন্ন', 'নেমকের দারোগা', 'অমাবস্যার রাত' ও 'অনল সমাধি' প্রভৃতি গল্পে এইসব উপাদান ও প্রবণতার সঙ্গে সাবেকী সামন্ত সমাজের (ব্রিটিশ প্রবর্ত্তিত জমিদারী বা তালুকদারী ব্যবস্থা নয়) সরল মানবতার আশ্রয়ে ফিরে যাওয়া রয়েছে। তাঁর 'দুধের দাম', 'ঈদগাহ', 'সওয়া সের গেঁহু' এবং 'কফন' গল্পগুলি নয়া তালুকদারী ও মহাজনী শোষণের ও ধর্ম্মশাস্ত্রীয় অত্যাচারের কাহিনী, সমাজ-বাস্তবতার পরিণত শিল্পভঙ্গীতে রচিত। ১৯৩৬ সালের ৯ই এপ্রিল লখনৌতে অনুষ্ঠিত Indian Progressive Writers' Conference'-এ সভাপতির ভাষণের একস্থানে বলেছেন: 'জীবনের নানা সংগ্রামের মধ্যে যে পরম সৌন্দর্য বিরাজ করছে সেই অন্তর্দৃষ্টি আমাদের এখনো হয়নি।" প্রেমচন্দের সৃজনশীল রচনাগুলির মধ্যে যে দ্বিধা ও সীমাবদ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে, উপরোক্ত বক্তব্য যেন তারই স্বীকৃতি। তিনি নিপীড়িত কৃষকশ্রেণীর জীবনযন্ত্রণার শরিক হয়েছেন, সামন্ততান্ত্রিক মহাজনী অত্যাচারের প্রতি ঘৃণা ও তার বিরুদ্ধে

প্রতিবাদও বেরিয়ে এসেছে ; কিন্তু নবাগত বুর্জোয়া ধনতন্ত্রকে (তার নীতিহীন ভ্রষ্টাচারের কারণেই) মেনে নিতে পারেননি ; তাই বার বার পুরোন সমাজের মূল্যবোধের দিকে ফিরে যেতে চেয়েছেন। বলাবাহুল্য, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ ও ধনতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ না হওয়ার দরুণই এমনটা ঘটেছে।

প্রেমচন্দ সাবেকী মানবিক মূল্যবোধ ও শুভবুদ্ধিকে মহিমান্বিত করলেও, ধর্মশাস্ত্রের ভণ্ডামীকে তীব্র শ্লেষের চাবুকে আক্রমণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কালান্তর' গ্রন্থে ও অন্যান্য রচনায় যেমন পুঁজিবাদী সভ্যতাকে অমানবিক 'প্রকাণ্ড একটা প্ল্যান' ও সাম্রাজ্যবাদী ঐক্যকে 'অজগরের ঐক্য' বলেছেন, প্রেমচন্দও তেমনি মেশিনকে রাক্ষসের সঙ্গে এবং **পুঁজিবাদী সমাজকে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত শরীরে রঙিন কাপড় ঢাকা** বলে বর্ণনা করেছেন ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও তাঁর বস্তুশক্তির মহিমা উপলব্ধি করে, তার নিয়ম জেনে তাকে দখল করার মধ্যেই মানুষের মুক্তি এ কথাও ঘোষণা করেছেন। প্রেমচন্দ এই উপলব্ধিতে পৌঁছেছেন একেবারে শেষের দিকে ; বস্তুচেনার বিকাশ ও বলশেভিক বিপ্লবের আদর্শই যে মেনতি মানুষের মুক্তির পথ, ১৯৩৬ সালের Conference-এ সভাপতির ভাষণে এবং শেষ রচনা 'মহাজনী সভ্যতা' প্রবন্ধে এই বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন। 'কাব্যে ও গদ্য রচনায় জার্মান সমাজতন্ত্র' রচনায় এঙ্গেলস সেই সময়ের গর্ভে (১৭৮৯—১৯১৫) আবির্ভূত গ্যেটে সম্পর্কে বলেছেন, "In his works Goethe's attitude to contemporary Garman society is a dual one. Sometimes he is hostile towards it, he attempts to escape from what he finds repulsive in it, he rebels against it, he lashes it with his brilliant satire. But then sometimes he is on friendly terms with it, accommodates himself to it, he celebrates it, even defends it against the oncoming movements of history". প্রেমচন্দ সম্পর্কেও একথা খাটে ; তবে তিনি স্থিতাবস্থার অবক্ষয়, ভণ্ডামী ও অত্যাচারে গা ভাসান নি। ফিরে গেছেন পুরোন গ্রামীণ ভারতের সরল বিশ্বাস ও মানবিক বন্ধনের যুগে, শুধুমাত্র **মানুষের নৈতিক মূল্য ও মর্য্যাদাকে** রক্ষা করার জন্যে।

প্রেমচন্দের মৃত্যুর পঁচিশ বছর পরে ১৯৭৪ সালে ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া তাঁর গল্পের একটি বাংলা অনুবাদ সংকলন বের করেন। এর আগে ইতস্ততঃ দু-একটি কাহিনীর অনুবাদ হয়েছে ব্যক্তিগত আগ্রহে।

প্রেমচন্দের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হবে। আমরা আশা করব ভারত ও রাজ্য সরকারগুলি বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় তাঁর সমগ্র রচনাবলীর সুলভ সংস্করণ প্রকাশে উদ্যোগ নেবেন।

কবিয়াল রমেশ শীল

বাংলার লোককবি-শিল্পীদের সৃষ্টির মধ্যে, যেখানে ধর্মের গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িক ভেদের বিরুদ্ধে মনোভাব কাজ করেছে ও বিশ্বজনীন মানবতার মহিমা প্রচারিত হয়েছে, তা গ্রামীন লোকধর্মের ও কৃষকবিদ্রোহের ঐতিহ্য এবং বাস্তবের ঘা লাগার কারণেই ঘটেছে।

গ্রাম-সমাজে ব্রিটিশ আগমনের অবদান কেবলই ভাঙন আর লুঠ; কাজেই গ্রামীন কারিগর ও কৃষকশ্রেণীর সর্বনাশের মুখে যা হবার তাই হয়েছে; অবিরাম দুর্ভিক্ষ ও কৃষকবিদ্রোহ।

দুর্ভিক্ষের মুখেও শাসকগোষ্ঠী 'নষ্ট পরমায়ু কবির দল' দিয়ে পচাগলা ইন্দ্রিয়সর্বস্ব কবিগান, তরজা, আফ-আখড়াই প্রচারে ইন্ধন যুগিয়েছে; আর বিদ্রোহগুলির প্রেরণা দিয়েছে লৌকিক ধর্ম-সংস্কৃতির ঐতিহ্য। উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথ এই পর্বে কেবল 'নষ্ট পরমায়ু কবির দল' দেখেছেন, বিদ্রোহ ও লোককবিদের জীবনমুখী উজ্জ্বলতা দেখতে পাননি। কিন্তু ঘটনা হল, এই পর্বের নাগরিক সংস্কৃতিতে যেমন রামমোহন বিদ্যাসাগর মধুসূদনের 'আলোকপ্রাপ্ত' মননচিন্তার পাশাপাশি রাধাকান্তদেব, বঙ্কিমচন্দ্র ও শশধর তর্কচূড়ামনিদের পশ্চাৎপদ প্রতিক্রিয়ার ধারা ছিল, তেমনি লোক-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অশ্লীল কবি-তরজার পাশাপাশি লালন ফকির, রমেশ শীল, শেখ গোমহানী ও নিবারণ পণ্ডিতদের মত জীবনমুখী ও উত্তরণকামী কবিদেরও দেখা পেয়েছি।

১৮৭৭ সালে চট্টগ্রামের বোয়াখালি থানার গোমদণ্ডী গ্রামে কবিয়াল রমেশ শীলের জন্ম; পিতা চণ্ডীচরণ পেশায় ক্ষৌরকার ছিলেন। বালককাল থেকেই সারি, জারি, গাজী, ভাটিয়ালী ও কবিগানের প্রতি রমেশের ঝোঁক ছিল প্রবল। তখন চিন্তাহরণ ও মোহনবাঁশীর গান তাকে খুব টানত। এজিজ হোসেন, রাম-রাবণ, কুরু-পাণ্ডব কাহিনীর ট্রাডিশনেই এইসব গান বাঁধা হত; তবে রমেশকে আকৃষ্ট করত গানের তাৎক্ষনিক সৃজনশীলতা বা গণ-স্বভাব এবং লোকজীবনের বেদনা ও বাসনা প্রকাশকারী ক্ষমতা।

রমেশ যে কবি ও গায়ক হবেন তা বাল্যকাল থেকেই ঠিক হয়েছিল বলা যায়; কিন্তু মাত্র এগার বছরে পিতৃহীন হওয়ার ফলে, নিদারুণ দারিদ্র ও বড় পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে চেপে বসার দরুণ রীতি ও পদ্ধতিমত অনুশীলন হয়ে ওঠেনি।

প্রধানতঃ সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিরোধী লোক-সংস্কৃতির দিকেই তাঁর টান ছিল বেশী; এই টানেই তিনি বিশের দশক থেকে একটানা সাত-আট বছর চট্টগ্রামের ফটিকছড়ী গ্রামে 'মাইজভাণ্ডার শরীফ' গড়ে সুফীবাদী বিশ্বজনীন মানবতার প্রেমভক্তি উজাড় করে অজস্র গান লেখেন:

'মন অহংকারে দিন কাটালি
মানুষ হবি কেমন করে
তোর সাধনভজন নষ্ট হইল
হিংসা নিন্দা অহংকারে
জেলে ধোপা মুচি জাতি
এই সকল ব্যবসার খ্যাতি
মূলে সকল মানবজাতি
আর জাতি নাই এ সংসারে।'

লালন ফকিরের বাউল গানেও এই রকম একই অভিমান ও বিশ্বাস ফুটেছে। ভেদের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামী লোক-সংস্কৃতির উত্তরসাধনায়, এই বিশের দশকেও কবি নজরুল যেমন লিখেছেন 'জাতের নামে বজ্জাতি তোর জাত-জালিয়াত খেলছ জুয়া' এবং সেই গান মুকুন্দদাস যেমন তাঁর স্বদেশী যাত্রায় গেয়েছেন গ্রামে গ্রামে, তেমনি চট্টগ্রামের গ্রাম্য কবিয়াল রমেশ শীলও বুঝেছিলেন জাতভেদের কথা কোন ধর্মগ্রন্থে নেই, সমাজের প্রভাবশালী স্বার্থান্বেষী চক্রই এইসব বানিয়েছে; আসলে 'হিন্দু মুসলমানের দ্বন্দ্ব কোন্ কথায় সাধনায়?'

কোন মহান কবি ও শিল্পীর মূল্যায়নে, স্মরণ রাখা দরকার, ঐতিহাসিক পালাবদলের বাঁকে সেই স্রষ্টা নিজেকে ভেঙে ভেঙে বদলাচ্ছেন কি না; এই বিচারে রমেশ শীল সত্যিকারের কবি। হিন্দু-মুসলমান ভেদের প্রশ্নে যে কবি প্রথমে বিশ্বজনীন ধর্মচেতনার কথা বলেছেন, পরে ১৯২৬ সাল নাগাদ তিনিই শ্রেণী বৈষম্যের নিরিখে প্রশ্নটি তুলে ধরলেন:

'হিন্দু মুসলিম মারামারি দেশে এল কি ঘটনা
যত কুলি মজুর গরীব মরে নেতারা কেউ মরে না
বাঘে ছাগে সাপে ভেকে সম্বন্ধ কি ভেবে পাওনা
গরীব আর বড়লোক দোঁহে সেই সম্বন্ধ ভুল হবে না।'

কবিয়াল রমেশ শীল দুটি বিশ্বযুদ্ধের কালসীমায় শাসকশ্রেণীর দমন-পীড়ন, জনগণের দুর্দশা ও দারিদ্র এবং সংগ্রামকে আপন সৃষ্টির মধ্যে যে ভাবে প্রতিফলিত করেছেন তাতে তাঁর সুগভীর সমাজচেতনা ও নিপীড়িত শ্রেণীর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ পেয়েছে। ১৯১৪-১৮ সালের মধ্যে লেখা :

'পাঁচ গজ ধুতি সাত টাকা
দেহ টেঁকা হয়েছে কঠিন
রমেশ কয় আঁধারে মরি
পাই না কেরোসিন।'

সাম্রাজ্যবাদী বাজার ভাগাভাগির যুদ্ধ ও তার অর্থনৈতিক সংকটের বোঝা কিভাবে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের ঘাড়ে চাপে, প্রচলিত ধারার কবিয়াল হয়েও রমেশ শীল এই সামাজিক দায় এড়িয়ে যাননি, এখানেই তাঁর কবিত্বের মূল্য ও সৌন্দর্য। এই বিশ্বযুদ্ধের পর্বেই চট্টগ্রামের আসাম-বেঙ্গল রেল ধর্মঘট, প্রভৃতি রাজনৈতিক প্রতিরোধের ঘটনাও তাঁর বহু কবিগানে প্রতিফলিত হয়েছে।

'ব্যবসার ছলে বণিক এল
ডাকাত সেজে লুঠ করিল
মাল কোঠার ধন হরে নিল
আমারে সাজায়ে বোকা
কৃষক মজদুর এক যোগেতে
হাত মিলালে হাতে হাতে
শ্বেতাঙ্গ দুশমনের হাতে
তবেই যাবে জীবন রাখা।'

উল্লেখযোগ্য যে, ১৯২১ সালের আগেই, কম্যুনিস্ট পার্টি ও ওয়ার্কার্স এ্যাণ্ড পেজেণ্ট পার্টি গড়ার আগেই রমেশ শীল তাঁর স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা ও সংগ্রামী ঐতিহ্যর তাগিদেই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অভ্যুত্থানে **শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর রাজনৈতিক গুরুত্বের** কথা প্রকাশ করেছেন তাঁর কবিগানের আসরে। বলা-বাহুল্য, গণআন্দোলনের সাময়িক ব্যর্থতা ও বিজয়ের সম্ভাবনার অভিজ্ঞতাগুলির পাশাপাশি গণসংস্কৃতির এই ধারাই এদেশে কম্যুনিষ্ট পার্টি গড়ার পটভূমি রচনায় মূল্যবান অবদান রেখেছে।

১৯২৪ সালের পর আরবের খলিফার পদ নিয়ে এদেশেও যে খিলাফৎ আন্দোলন তথা ধর্মীয় ভাবাবেগের রাজনৈতিক আন্দোলন উঠেছিল তা

অল্পদিনের মধ্যেই থিতিয়ে যায়; এর আগে ১৯২১ সালে আহমেদাবাদ অধিবেশনে মৌলানা হসরৎ মোহানী যে **'পূর্ণ স্বাধীনতা'র** দাবী তোলেন, ১৯২২ সালে নজরুলের 'ধূমকেতু' যে দাবীকে আরও প্রসারিত করেন, তা জাতীয় কংগ্রেসের প্রধান নেতা গান্ধীর আপোষকামী ভূমিকার জোরে সাময়িকভাবে সরে গেলেও, কংগ্রেসেরই বামপন্থী শক্তি অবশেষে এই লেজুড়-ধর্মী রাজনীতি ছেড়ে 'স্বরাজ্য দল' হয়ে বেরিয়ে আসে এবং তখনই রাশ টেনে রাখার দায়ে ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে গান্ধী পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য হন।

দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অফিসিয়াল খাতে যখন এই সব চলেছে, তখন চট্টগ্রামের রাজনীতি প্রায় প্রত্যক্ষ ও সশস্ত্র সংগ্রামে রূপ নিয়েছে। ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঐতিহাসিক ঘটনার পিছনে কতদিনের বারুদ ও সাংগঠনিক শক্তি জমা হয়েছিল, প্রায় চার দিন ধরে মুক্তাঞ্চল গড়ে জালালাবাদ পাহাড়ে বীর বিপ্লবীদের সঙ্গে ব্রিটিশ ফৌজের লড়াইয়ের মধ্যে তার প্রমাণ রয়েছে। কবিয়াল রমেশের নিজস্ব চট্টলাভূমিতে এই সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ যুব অভ্যুত্থান পূর্বতন গোপন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের কাজকর্ম থেকে আলাদা ছিল। জেলের মধ্যে এইসব বিপ্লবীদের অধিকাংশই **মার্কসবাদ** অধ্যয়ন করেছিলেন এবং বেরিয়ে এসে পুরোপুরি কম্যুনিষ্ট হয়েছিলেন।

কবিয়াল রমেশ যেমন ক্ষুদিরাম-কানাইলালদের জয়গান গেয়ে আসর করেছেন, তেমনি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন কাহিনী নিয়েও গান বেঁধেছেন:

'বাজিয়া উঠিল মনের ভেরী
দিগ্ দিগন্ত উজলা
কোটি কণ্ঠে ধ্বনিত হইল
বীর প্রসবিনী চট্টলা।'

এই ঘটনার পর ব্রিটিশ শাসক 'বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল' এ্যামেণ্ডমেণ্ট এ্যাক্ট' আবার অর্ডিন্যান্স রূপে চালু করে এবং চট্টগ্রাম সহ সারা দেশে নতুন করে সন্ত্রাস ও সামরিক রাজত্ব কায়েম করে। কবিয়াল রমেশ এই দমন-পীড়ন ও অবক্ষয়ের গর্ভ থেকেই বিপ্লবীদের কারাজীবনের দুর্দশা ও মহত্ব স্মরণ করে বহু গান বেঁধেছেন। অতঃপর ১৮৩৮ সালে লোকজীবনে সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে 'উদ্বোধনী কবি সংঘ' গড়েন। উল্লেখযোগ্য যে, যে-সময়ে শহর কলকাতায় জীবনবাদী সংগ্রামী কবি-শিল্পীদের নেতৃত্বে 'ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ' যৌনসর্বস্ব অবক্ষয়ী

সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন, সুদূর চট্টগ্রামের গ্রামাঞ্চলে তখন কবিয়াল রমেশের নেতৃত্বে লোককবিগণ সংস্কৃতির সংগ্রামী ঐতিহ্য এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

১৯৪১ সালের ২২শে জুন ফাসিষ্ট হিটলার সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করলে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ সারা বিশ্বের গণতান্ত্রিক মানুষের কাছে 'জনযুদ্ধে' পরিণত হল। এর আগে, যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রে সারা দেশে প্রধানতঃ বোম্বাই, কলকাতা, উত্তরপ্রদেশ ও অন্ধ্রে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের যে জোয়ার বহেছিল, জনযুদ্ধ-এর পর্বে এসে সেটা থমকে গেল; কারণ, 'দেওলি দলিল'-এ ব্রিটিশ যুদ্ধ প্রয়াসকে সমর্থন জানানো হলে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে আন্দোলন পরিচালনায় এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির অভ্যন্তরে দ্বিধা, সংকট ও সমালোচনা দেখা দেয়। ১৯৪১ সালের জুলাই পলিট ব্যুরো ঘোষণা করলেন: সোভিয়েত ইউনিয়নকে আমরা স্বাধীন মানুষ হিসাবেই কার্যকর সাহায্য দিতে পারব। অক্টোবরে পার্টির মধ্য থেকেই সমালোচনা বেরিয়ে এল: সাম্রাজ্যবাদীদের উপর নয়, জনগণ ও শ্রমিকশ্রেণীর উপর আস্থাই এই পরিস্থিতির উপযুক্ত ব্যবহার। এই আত্ম-সমালোচনা কাটিয়ে ওঠার জন্য ১৫ই ডিসেম্বর পলিট ব্যুরো বিবৃতি দিয়ে আহ্বান জানালেন: জনযুদ্ধে ভারতীয় জনগণকে জনগণের ভূমিকা পালন করাও; তবু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ও জাপানী ফ্যাসিস্টদের প্রশ্নে সমর্থন ও বিরোধিতা নিয়ে যে সংকট দেখা দিল, তা কাটিয়ে ওঠা খুবই কঠিন হয়েছিল।

যখন ব্রিটেনের সরকার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জার্মানি, ইতালি ও জাপানের অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হল, তখন সারা ভারত কৃষকসভা, শ্রমিক ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সদস্যরা তাঁদের যুদ্ধ-সম্পর্কিত পূর্বতন দৃষ্টিভঙ্গী বদলে নিলেন। তাঁদের এই দৃষ্টিভঙ্গীকে সোভিয়েত ইউনিয়নের ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামের পক্ষে আন্তর্জাতিক দায়িত্ব এবং বিশ্ব গণতন্ত্রের জন্য; সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় স্বার্থের জন্য জরুরী বলে ব্যাখ্যা করলেন (হিস্ট্রি অব অল ইণ্ডিয়া কিষাণ সভা—এম. এ. রসুল)।

সেই সময়ে ভিয়েতনামের ক্ষেত্রে দেখা গেল, প্রথম দিকে (১৯৪২-৪৫) ওয়ার্কার্স পার্টি একই সঙ্গে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী ও জাপানী সমরবাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়েছেন; দ্বিতীয় পর্বে (১৯৪৫ সালের ৯ মার্চের পর) জাপানী ফ্যাসিস্ট বাহিনী আকস্মিক ভাবে সারা ইন্দোচীন জুড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে ভিয়েতনামের ওয়ার্কাস পার্টি জাপানী পশুশক্তিকেই একমাত্র শত্রুরূপে ঘোষণা করে। সম্ভবতঃ, সারা ইউরোপ ফ্যাসিষ্ট আতঙ্কের চেহারা দেখে, এশিয়ায় জাপানী শক্তির তাণ্ডব

দেখে ও বাংলার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একাধিকবার বোম্বারী হওয়ার ঘটনায় এই রকম মারাত্মক পরিকল্পনার কথা। (হিটলারও ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিল) মাথায় রেখেই ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি তাঁদের রণনীতি নির্ধারণ করেছিল। দেখা গেছে, আক্রান্ত চট্টগ্রামের জনগণ 'পিপ্‌ল্‌স্‌ ওয়ার'কে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪২ সালের ৮ই মার্চ যেদিন জাপানী শক্তির হাতে রেঙ্গুনের পতন হল, সেদিনই ঢাকার মৈশণ্ডীপাড়ায় ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলনে রেল শ্রমিকদের মিছিল নিয়ে যাওয়ার পথে কম্যুনিস্ট লেখক ও শ্রমিক নেতা সোমেন চন্দ ফ্যাসিস্ট ঘাতকের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন। পরে সুকান্ত এই ঘটনার স্মরণেই 'ছুরি' কবিতায় লিখেছে: 'বিদেশীর চর ছুরিকা হানে দেশের হৃদ্‌বৃন্তে/ সংস্কৃতির শত্রুদের পেরেছি আজ চিন্তে।' কবিয়াল রমেশ শীলও এই ঘটনার বিপ্লবী তাৎপর্য উপলব্ধি করে সংকল্প ঘোষণা করেন: 'দেশের কথায়, সংগ্রামী সংস্কৃতির কথায় গান বেঁধে, গ্রামে গ্রামে সেই গান গেয়ে মানুষ জাগাব।' উল্লেখযোগ্য যে, এই সময়ে ১৯৪২ সালের জুলাই পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞা উঠে যায় এবং জেল থেকে কম্যুনিস্টরা মুক্তি পান; তাঁদের অনেকের সঙ্গে বঙ্কিম মুখার্জ্জী, কল্পনা দত্ত (পি. সি. যোশী) প্রমুখ নেতৃবৃন্দের রমেশ শীল ও তাঁর সহযোগী রাইগোপাল দাস ও ফণী বড়ুয়ার যোগাযোগ হয়েছিল।

এরপর এল ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ। হাজার হাজার চাষীদের সঙ্গে কবিয়াল রমেশও ভূমিহীন ক্ষেতমজুরে পরিণত হলেন। ১৯৪৫ সালে যোশী তাঁর 'বাংলার বীর বন্দীরা' বইয়ে লিখেছেন: 'সে চট্টগ্রাম আর নাই। যে চট্টগ্রামের মা-বোনেরা দেশভক্ত ছেলেদের মুক্তির জন্য একদিন শিবের মাথায় জল বেলপাতা দিত, সেখানে আজ অসহায় মেয়ের দল নিজেদের দেহ তুলে দিচ্ছে মিলিটারী আর কনট্রাক্টরদের হাতে।' ভূমিহীনদের সঙ্গে রমেশ কবিয়াল এই ভয়ঙ্কর মহাশ্মশানে দাঁড়িয়ে জীবনের গান শোনালেন:

'দেশ জ্বলে যায় দুর্ভিক্ষের আগুনে
এখনো লোক জাগিল না কেনে।
দিন মজুরে ঘরজা যারা
গত সনে মরেছে তারা
ঘরের ছানি দিব আজ কেমনে
দুইটি বেলা খায় না কেহ
কারো পানে চায়না

ভিক্ষা পায়না অন্ধ আতুর গণে
পুত্র কন্যা বেচে পিতা
ছেলের আহার খাচ্ছে মাতা
দয়া নাইকো কাহারো পরাণে
এখনো লোক জাগিল না কেনে।'

আর একটি গানে সংগ্রামের আহ্বান :

'জেগে ওঠো জনগণ থেকো না আর অচেতন
উঠিয়া দাঁড়াও সবে নিজের কল্যাণে'

এই জাগরণ তুই ফ্রণ্টের লড়াইয়ের ক্ষেত্রে কাঙ্খিত ছিল ; এই সময়ে গণনাট্য সঙ্ঘের প্রথম সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে তুই ফ্রণ্টের লড়াইকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল ; "জনগণের সামনে আশু সমস্যা হচ্ছে—বহিঃ ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও সংস্কৃতির জঘন্যতম শত্রু ফ্যাসিষ্ট দস্যুদের আক্রমণ, এবং আভ্যন্তরিণ ক্ষেত্রে বিদেশী সরকারের নির্যাতন যারা জনগণকে চিরকাল বেঁধে রাখতে চায় এবং মাতৃভূমির কার্যকর প্রতি রক্ষায় সংগঠিত হতে দিতে চায় না।" এই 'জনযুদ্ধ' পর্বে 'পিপ্‌লস ওয়ার'-এর প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় প্রবন্ধেও বলা হয়েছিল : "সাফল্যপূর্ণভাবে আমাদের দেশরক্ষা ও আমাদের স্বাধীনতা লাভের জন্য জনসাধারণের মুল দাবী জাতীয় সরকার যে একান্ত প্রয়োজন এ বিষয়ে আমরা দেশপ্রেমিক জনসাধারণের সহিত একমত।" কমরেড যোশী তাঁর 'ফরওয়ার্ড টু ফ্রিডম' বইয়ে ব্যাখ্যা করে বলেছেন : সাম্রাজ্যবাদী শাসক অবশ্যই সাম্রাজবাদী উদ্দেশ্য নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে ; তারা চায় হিটলারের কাছে আত্মসমর্পণ এড়াতে, এই পর্যন্তই ; কিন্তু এই জনযুদ্ধ পর্বে সারা দুনিয়ার গণতান্ত্রিক ও স্বাধীনতাকামী জনগণের যে অভূতপূর্ব সমাবেশ ও শক্তির প্রকাশ ঘটছে, ভারতবাসী তাতে যোগ দিলে, যুদ্ধের ভার নিজেরা নিলে মুক্তির পথ ত্বরান্বিত হবে ; মনে রাখতে হবে, ব্রিটিশের কাছে এ দেশ উপনিবেশ ; কিন্তু আমাদের কাছে এ দেশ মাতৃভূমি।

এ কথা ঠিক, মজুর-কিষাণ আন্দোলন ও সভা-সংগঠনের সহযোগী প্রেরণারূপে গণসংস্কৃতির ব্যাপক প্রয়াস, দুর্ভিক্ষ, ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-আন্দোলনে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা দেওয়ার বাস্তব প্রয়োজনে **ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা** এবং ফ্যাসিস্ট আক্রমণ প্রতিরোধ করে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য লেখক-শিল্পীদের সামিল হওয়ার জন্য কম্যুনিষ্ট পার্টির গুরুত্বপূর্ণ

সাকু´লার প্রচার প্রভৃতি ঘটনা এই পর্বের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য হলেও, দ্বিজাতি সত্তার তত্ত্ব, কংগ্রেস-লীগ সম্পর্ক, ধর্ম-সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে গড়া মুসলিম লীগের আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন ইত্যাদি ব্যাপারে যে জটিলতা ও ভ্রান্তির সংকট দেখা দিয়েছিল, তার প্রতিফলন স্বভাবতই সাহিত্য শিল্প ফ্রণ্টেও পড়েছিল। কংগ্রেস লীগ মিলন এবং দ্বিজাতি সত্তার তত্ত্ব নিয়ে গান ও পোষ্টার নাটক গণনাট্য মঞ্চেও যেমন হয়েছিল, রমেশ শীলের নেতৃত্বে কবিগানের আসরেও তেমনি হয়েছিল। শ্রদ্ধেয় মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল তাঁর 'কৃষক সভার ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন: '১৯৪৪ সালের ১৪ মার্চ অন্ধ্রের বিজয়ওয়াড়ায় কৃষক সভার ৮ম অধিবেশনে প্রস্তাব নিয়ে বলা হয় —"The Kishan Sobha took up the stand that 'the bureaucracy can be effectively faught only by the unity of the Hindu-Muslim masses through which alone Congress–League Unity can be aclaimed and a national defence and solvation won."

অতঃপর ১৯৪৫ সালে সোভিয়েত লাল ফৌজের হাতে ফ্যাসিস্ট হিটলারের পতন ঘটলে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কম্যুনিষ্টদের ভূমিকার জট খুলে যায়। এই ঘটনায় বাংলার প্রগতিশীল লেখক-শিল্পীরা তো বটেই, এমনকি হিন্দী ও উর্দু ভাষার সুমিত্রা নন্দন ও যোশ মালিহাবাদী প্রমুখ বুর্জোয়া মানবতাবাদী লেখকরাও ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের নৈতিক শক্তি ও দেশপ্রেমকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। পুণা থেকে প্রকাশিত 'শের-ই-ইনকিলাব' পত্রিকায় ১৯৪৫ সালের ১৫ নভেম্বর প্রখ্যাত উর্দু কবি যোশ মালিহাবাদী এক রচনায় বলেন: "আজ নানা দিক হতে আপনাদের পার্টির উপর আক্রমণ আসছে। কিন্তু আক্রমণকারীদের নৈতিক ও মানসিক স্তর ঠিক ততখানি নিচে যতখানি উঁচুতে আপনাদের লক্ষ্য ও আদর্শ; দুরন্ত ঝড়ের মধ্যে আপনাদের যাত্রা।" এই পর্বে আজাদ হিন্দ বন্দীমুক্তি আন্দোলন, ৪৬-এর ফেব্রুয়ারীতে রশীদ আলি দিবস, শহীদ রামেশ্বর দিবস, দাঙ্গা-বিরোধী আন্দোলন, নৌ বিদ্রোহ প্রভৃতি ঘটনা অবশ্যই ব্যাপক জনগণের শ্রদ্ধা ও সমর্থন আকর্ষণে কম্যুনিষ্ট পার্টিকে সুযোগ করে দিয়েছিল; কারণ এইসব ঘটনায় অতিক্রান্ত কংগ্রেস ও লীগের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র নতুন করে উন্মোচিত হয়েছে এবং ব্রিটিশ স্বৈরতন্ত্রের বর্বরতা ও দমন-পীড়ন স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণের উপর আছড়ে পড়েছে।

নৌবিদ্রোহের বীর নাবিকরা যখন তাঁদের ইস্তাহারে ঘোষণা করেছেন:

এই প্রথম সমর বিভাগের ভারতীয় কর্মী ও ভারতীয় জনগণের রক্ত এক লক্ষ্য এক খাতে মিশলো, তখন কবিয়াল রমেশ গান গেয়ে গ্রামের কৃষকদের গণ-সংগ্রামের ইতিকথা শোনালেন :

'মুছে নাই তো প্রাণের দাগ
পাঞ্জাব জালিয়ান বাগ
ভুলেছ কি তুরস্কের খেলাফত আন্দোলন
ভুলেছ কি বোম্বাইয়ের নৌ বিদ্রোহীগণ
ভুলেছ কি আজাদ হিন্দ ফৌজ মুক্তি বিবরণ
দেখতে দেখতে ভুলে গেলে
এই সেদিন তো রক্ত দিলে
ছাত্র জনতা কেপটেন রশীদ আলি মুক্ত করিবার কারণ
ভুলেছ কি সেই কথাটি ছাত্র রক্তে ভিজে মাটি
কদম রসুল রামেশ্বরের যেদিন শাহাদত বরণ !'

প্রায় একই সঙ্গে সুরু হয় ঐতিহাসিক **তেভাগা-তেলেঙ্গানার** কৃষক আন্দোলন। তেলেঙ্গানার বীর কৃষকরা ১৯৪৬ সালের জুন মাসে প্রথম জমিদার ও ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মশাল তুলে ধরেন এবং এক বছরের মধ্যে শত শত গ্রামে তা ছড়িয়ে পড়ে। তেভাগা আন্দোলনও গোড়ার দিকে জমিদার মহাজনদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক দাবী দাওয়ার অভ্যুত্থান হলেও তা ক্রমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। কবিয়াল রমেশ শীলের চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও পাটিয়া গ্রামেও তেভাগার স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে; কবিয়াল গান গেয়ে কৃষক জাগাতে নামেন :

"ওঠো জাগো কৃষক ভাই থেকো না ঘুমে
বীর সন্তান যত আছ তোমরা ভারতভূমে
পরাধীন পরাশ্রিতা জননী আমার
তোল রক্ত পতাকা সবে করিয়া হুংকার
শৃঙ্খল টুক্‌রো কর সিংহ বিক্রমে
ধ্বংস কর যত শোষণ জুলুমে।"

এই সময়ে ওয়াভেল দৌত্য চলছে এবং কংগ্রেস ও লীগের বুর্জোয়া-জমিদার-দের নেতৃত্ব দ্বিজাতি তত্বের ভিত্তিতে, ধর্ম-সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে দেশ ভাগের প্রস্তাব নিয়ে অনেকটা এগিয়ে গেছে; এরই পটভূমি রচনার চক্রান্ত কার্যকর করতে

বাধানো হয় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। এই সময়ে কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রভাবে, শ্রেণী-সচেতন কবিয়াল রমেশ গান ধরলেন:

'হুঁশিয়ার খুব হুঁশিয়ার
বিভেদকারী কাছে আসি বন্ধুর ভাব দেখায়
আছে যত শ্রমিক ভাই
শ্রমিকের দরদী শ্রমিক, আর কেহ নাই
জমিদার মালিক রাজা
বিভেদ মন্ত্র কানে ঢুকায়
উস্কানি দেয় বারংবার
দেশবাসী হিন্দু মুসলমান
এই দুশমন হতে সবে থাক সাবধান।'

দেশ ভাগ হলেও রমেশ শীল বুঝেছিলেন, দুই দেশের স্বাধীনতা ও দেশীয় শাসকশ্রেণীর চরিত্র প্রায় একই রকম। এই ভেবে তিনি পূর্ব বাংলা ছাড়েননি। তথাকথিত স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই ১৯৪৮ সাল থেকে ভারতের মত পাকিস্তানেও প্রেস সেন্সরশিপ ও 'জননিরাপত্তা আইন' চালু হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে জমিদারী উচ্ছেদের আন্দোলন তীব্রতর হয়েছিল। এ পারে যখন কম্যুনিষ্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে ঘোষিত হচ্ছে 'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়', ও পারে তখন কবিয়াল রমেশ কবিগানের আসরে আহ্বান জানাচ্ছেন:

'ব্রিটিশ এত রক্ত মাংস শোষিয়া নিয়াছে
এখন আবার দেশী শোষক জাঁকিয়া বসেছে
এই ধ্বংসের মূলেতে কি যদি টের পাও
গরীব এক জোট হয়ে ভাগ্য বদল করে নাও।'

রমেশ শীল ১৯৪৮ সালে গণ-সংগ্রামের সহযোগী সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট গড়ার উদ্দেশ্যে 'চট্টগ্রাম কবি-সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর সম্পাদক হন তাঁরই সুযোগ্য শিষ্য রাইগোপাল দাস; আয়ুবের আমলে আপোষে রাজী না হওয়ায় রাইগোপালকে কবি-সমিতি ছাড়তে হয়। কবি-সমিতির 'শিল্পীরা' বেতারে সাম্প্রদায়িক গান গাইতে থাকে। উগ্র স্বদেশীরাই এইভাবেই নষ্ট হয়।

রমেশ কবিয়াল ১৯৫২ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারীর **ভাষা-শহীদ স্মরণে** যে কয়টি গান রচনা করেন তা আজও ও পারের কৃষকরা মাঠের মধ্যে ঘাম মুছতে মুছতে গুণ গুণ করে গায়—

'বাংলার জন্য জীবন গেলে হব স্বর্গবাসী
আমার ঠিক থাকিবে বাংলার দাবী
যদিও হয় জেল ফাঁসী।'

কবিয়ালের জেলও হয়েছিল। ১৯৫৪ সালে আইন সভার নির্বাচনে গরীবদের দরদী বন্ধুদের ভোট দেওয়ার গান গাইলে পাক সরকার আতঙ্কিত হয়ে ৭৭ বছরের কবিয়ালকে 'জন নিরাপত্তা আইন'-এ ধরে বিনা বিচারে জেলে ভরে; কবিয়াল জেলখানাতে বসেই রচনা করেন :

'আমাদের খুনেতে যারা তুলেছে বড় মিনার
রক্ত মাংস চুষে খেয়ে করেছে কংকাল সার
আর যে সময় নাই ত্বরায় ছুটে এসো ভাই.
বেদনার প্রতিকারে সময় এসেছে
শুন সর্বহারা ভাই এবার মোদের শেষ লড়াই
দুনিয়াময়—গণডঙ্কা বেজে উঠেছে।'

দুঃখের হলেও বলতে হচ্ছে, কবিয়াল রমেশ শীলের 'জন্মশতবর্ষ' এ-পার ও-পার কোন বাংলাতেই তেমন উৎসাহের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হল না। আজ নিপীড়িত ও সংগ্রামী শ্রমিক-কৃষক জনগণ যেমন রবীন্দ্রনাথকেও তাঁদের সম্পদ বলে মনে করতে শেখেনি ও জানেনি, তেমনি বিপ্লবী লোককবিদের মহান অবদানও তাঁদের সংস্কৃতির ধারায় আজও সঠিক ভাবে পরিবাহিত হয়নি; দুই দিক থেকেই এর কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে; প্রথমতঃ, অবক্ষয়ী সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া ও ঔপনিবেশিক শিক্ষা-সংস্কৃতির যুগসঞ্চিত অভিশাপ, সুপরিকল্পিত ভাবে জাতীয় ইতিহাসের বিকৃতি সাধন, গণশিক্ষা প্রচারের দৈন্য এবং দ্বিতীয়তঃ, বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে প্রসারিত ও মজবুত করার কর্মকাণ্ডে সীমাবদ্ধতা, বিভেদ ও মন্থর গতি। আজ দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রামীরা জুলু ভাষায় ও সুরে 'মেইবুই ইয়াফ্রিকা' (ফিরে আসুক আফ্রিকা) গাইছেন। আজ সারা বিশ্বে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগে, বুর্জোয়া-জমিদারদের চাপিয়ে দেওয়া প্রচলিত বাজারী শিল্প সাহিত্যের হীন দাসত্ব থেকে জনগণের শিল্প-সংস্কৃতির ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার সংগ্রাম করে চলেছেন মানুষের স্বপক্ষে উদ্দীপিত বিপ্লবী প্রলে তারিয়েত শ্রেণী। তাই, আমরা যেন না ভুলি রমেশ কবিয়ালের অপূর্ব কবিত্বময় সংগ্রামী গান :

'অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়া নাই বা হবে
আমার পরে আসবে যারা তারাই নেবে
সারা জীবন ধরে তারই চেষ্টা করে যাব
মনের কোণে সুর উঠিবে কলম দিয়ে তাল বাজাব।'

এই সেদিন ইন্দিরাশাহী বর্বরতা রবীন্দ্রনাথের 'আগুন জ্বালো' গানও সেন্সর করেছিল। সংগ্রামী কবি নিবারণ পণ্ডিত গাইলেন :

'হামার গান তোমরা ভাইরে; সাঙ্গ করি নিও
সময় এলে আগুনে গান, হাজার কণ্ঠে গাইও।'

জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম
ও বিদ্রোহী নজরুল ইসলাম

'ভাল হোক মন্দ হোক—আমার দেশ আমার জাতি'—মানুষকে এই পাশবিক নেশায় বুঁদ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তার সাম্রাজ্যবাদী তাণ্ডব করল। পুঁজির সঙ্গে ইউরোপের সকল নাগরিক জীবনের সামরিকীকরণ হওয়ায় ফ্রান্সের রলাঁকেও যোগ দিতে হোল; কিন্তু রুগ্নতার কারণে রেডক্রশে রইলেন এবং ১৯১৫ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়ে তার সব টাকা আন্তর্জাতিক রেডক্রশকে দান করলেন। এই পুরো ঘটনা যে-কোন একটি বিপ্লবী কবিতা, নাটক বা গল্প-উপন্যাসের বিষয় হতে পারে। রলাঁ তখন দেশেরও ইউরোপের অন্যান্য দেশের সোস্যাল ডেমোক্র্যাট সুবিধাবাদীদের বিশ্বাসঘাতকতা ও সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া শাসনের শ্মশানভূমিতে একা দাঁড়িয়ে; কিন্তু তিনি খবর পাননি, জানতে পারেননি, রাশিয়ায় লেনিন এবং জার্মানিতে লুক্সামবুর্গ ও লীবক্লেট কিভাবে শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত মানুষকে যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লবী সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। তবু তাঁর 'যুদ্ধের উর্ধে' ও 'অগ্রণী'র (১৯১৫) মত আত্মিক প্রতিরোধের বইও নিষিদ্ধ হল, তাঁর যুদ্ধ ও জাতিবিদ্বেষ-বিরোধী 'জাঁ-ক্রিসতফ্'-এর সব কপি আটক হল এবং তিনি 'জাতিপ্রেমিক'দের কাছে 'ফ্রান্সের শত্রু' বনে গেলেন। এই সময়েই রলাঁ। এক পত্রের জবাবে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন লিখলেন: "গত আট মাস ধরে বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতরা এমনকি মনীষীরা পর্যন্ত এমন ব্যবহার করছেন, যা দেখে মনে হচ্ছে তাদের মস্তিষ্কগুলিকে কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে।"

কিন্তু দেশে দেশে এই নিদারুণ ক্ষয় ও পচনের মধ্যেও মানুষের বিবেক ও বিপ্লবী চেতনা অপরাহত থাকে; তাই জার্মানিতে কবি এরিখ উইনার্ট পাথরে বাঁধাই শহীদস্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে গেয়েছেন:

'পুরো একশ' হাজার বছর আমরা ঘুমিয়েছিলাম
বরফের মত ঠাণ্ডা গ্রানাইট পাথর যেন
শেষে ডিনামাইট বিস্ফোরণে আমরা জেগে উঠলাম
এবং হয়ে গেলাম বাণিজ্যপোত।'

কিন্তু ধনতন্ত্রের শোষণ ও অত্যাচার শেষ কথা নয়। শত শত নদীর মত রক্তের মূল্যে অর্জিত এই বিজয়স্মারক কথা বলে বিপ্লবী সংগ্রামের ভাষায়—

'শ্রমিকের রক্তে জমাট এই স্তম্ভ পাথর নয়
বুকের গভীরে বহে বীর্যদীপ্ত স্রোত ;
সোজা দাঁড়িয়েছি বিজয়স্মারকের সামনে
আমাদের কমরেডদের সমাধিস্থলে।'

জার্মানির বিপ্লবী কবি-শিল্পীরা যখন এই গাথা রচনা করছেন, তখন তার সাম্রাজ্যবাদী বর্বর শাসকচক্র ছোট্ট দেশ বেলজিয়াম গ্রাসের উদ্দেশ্যে আক্রমণ করলে, জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামকে অভিনন্দিত করে আমাদের মহান কবি রবীন্দ্রনাথ গাইলেন :

'বাধা দিলে বাধবে লড়াই মরতে হবে
পথ জুড়ে কে করবি বড়াই সরতে হবে
লুঠ করা ধন করে জড়ো
কে হতে চাস সবার বড়ো
এক নিমেষে পথের ধূলায় পড়তে হবে।'

সারা ইউরোপে লোভ ও বর্বরতার বাজপাখিরা ডানা ঝাপটাচ্ছে, রুশ দেশে তখন কবি ভেরা ইনবার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বুকে বিপ্লবের খবর পৌছে দিচ্ছেন :

'পাথরের সিঁড়ির উপর ছোট্ট শিশুকে তুলে ধরে
মা দেখছেন সূর্যের ঝলমলে ঢেউ
তার উপর ঘনিষ্ট হয়ে নরম স্বরে বললেন, সোনা আমার
এই হলেন আমাদের লেনিন।'

আর আমাদের প্রতিবেশী চীনের মহান লেখক ল্যু স্যুন তখন 'ভুলে যাওয়া স্মৃতির জন্য' কলম উঁচিয়ে বললেন :

'দুঃখের গভীরে দেখি বন্ধুরা প্রেত হয়ে নাচে
তীব্র রাগে কান পাতি বেয়নেট ঝোপে
কোথাও কি লোকগাথা বাজে ?'

যুদ্ধের ট্রেঞ্চে বসে ফ্রান্সের বিপ্লবী লেখক আঁরি বারবুস 'লে ফ্যু'-এর মত বিপ্লবী কাহিনী রচনা করেছেন ; আমাদের কবি নজরুল ইসলামও ১৯১৭ সালে ব্রিটিশের বেঙ্গলী পল্টনে যোগ দিয়ে করাচী ও পেশোয়ার অঞ্চলে গিয়েছিলেন এবং আফগান সীমান্তে জারের প্রতি-বিপ্লবী বাহিনীর বিরুদ্ধে রুশী লাল ফৌজের

বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের অভিজ্ঞতায় ১৯১৯ সালে 'ব্যথার দান' রচনা করেন। সেই সময়ে ফ্রান্স ও জার্মানিতে যেমন সামরিক কাজ বাধ্যতামূলক ছিল, এখানে তা না থাকা সত্বেও নজরুল কেন যুদ্ধে গিয়েছিলেন সে সম্পর্কে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় মুজফ্‌ফর আহমদ তাঁর নজরুল স্মৃতিকথায় বলেন : "আমি নজরুল ইসলামের নিকট জানতে চাইলাম সে রাজনীতিতে যোগ দেবে কিনা। জওয়াবে নজরুল বললেন, 'তাই যদি না দোব তবে ফৌজে গিয়েছিলাম কিসের জন্য?' দেশের অবস্থা তখন খুবই গরম। তাপের উপর চড়ালে জল যেমন টগ্‌বগ্‌ করে ফোটে, দেশের বিক্ষুব্ধ মানুষও সেই রকম ফুটছিল। পাঞ্জাবে যে নিষ্ঠুর অত্যাচার হয়েছিল সেই কথা দেশের জনসাধারণ তখনও ভোলেননি। ১৯১৯ সালের শাসন সংস্কার আইন দেশের লোকেরা মেনে নিতে চাইছেন না কিছুতেই ; আবার বড় বড় নেতারা এই আইনকে কাজে লাগাতে চাইছেন। পর্বত ও সমুদ্রের বাধা কাটিয়ে রুশ দেশের মজুরশ্রেণীর বিপ্লবের খানিকটা ঢেউ এদেশেও পৌঁছেচে। মজুরশ্রেণী চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ধর্মঘটের পর ধর্মঘট চলেছে নানা যায়গায়।" এ কথাটা যে কত সত্য তা ১৯২০ সালে প্রকাশিত 'দৈনিক নবযুগ'-এ লেখা নজরুলের 'ধর্মঘট' নিবন্ধে তার ব্যাখ্যা ও নজির রয়েছে এবং তাঁর রাজনৈতিক আবেগ কোন্ দিকে, তারও প্রতিফলন ঘটেছে—"দেশে একটা প্রবাদ আছে, 'যে এলো চষে সে রইল বসে, নাড়া-কাটাকে ভাত দাও একথালা কষে।' হুলের দংশন জ্বালা যথেষ্ট থাকলেও কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।.... দেশের সমস্ত কল-কারখানায় আড়তে গুদামে ভাবিয়া চিন্তিয়া মানুষ হত্যার এইরূপ শত শত বিভৎস নগ্নতা দেখিতে পাইবেন।....সবারই অন্তরে একটা বিদ্রোহের ভাব আত্মসম্মানের সংস্করণরূপে নিহিত থাকে, যেটা খোঁচা খাইয়া খাইয়া জর্জরিত না হইলে মরণ-কামড় কামড়াইতে আসে না। কিন্তু ইহাতে এই মনুষ্যত্ব-বিহীন ভোগ-বিলাসী কর্তার দল ভয়ানক রুষ্ট হইয়া উঠেন ; তাঁহারা তখনও বুঝিতে পারেন না যে, অভাগাদের বেদনার বোঝা নেহাৎ অসহ্য হওয়াতেই তাহাদের এই বিদ্রোহের মাথা-ঝাঁকানি।"

দেখা গেছে, সারা বিশ্বে ধনতন্ত্রের সঙ্গে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের সম্পর্ক একেই সঙ্গে বৈপরীত্যের ও ঐক্যের সম্পর্ক। ধনতন্ত্রই তার বিকাশের চূড়ান্ত স্তরে ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী যুগের সূচনা ও সর্বগ্রাসী ব্যাপ্তি ঘটিয়েছে ; এ ক্ষেত্রে পরাধীন ও ঔপনিবেশিক দেশগুলির মুক্তির তাগিদ ও বিকাশ বাস্তব পরিস্থিতির বৈপরীত্য (Contradiction) থেকেই উৎসারিত হয়েছে এবং এই

ধনতন্ত্রই গোটা জাতির সামন্ততান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতা খতম হওয়ার সুযোগ এনে ঐক্যের ও যুক্তিবাদী মানবতার রাস্তা করে দিয়েছে। অবশ্য অন্য সব দেশের ঔপনিবেশিক দাসত্বের প্রথম পর্য্যায়ের মত আমাদের দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনও পরিচালিত হয়েছে স্বদেশী ধনীকশ্রেণী ও তাদের অনুচর মধ্যবিত্ত অংশের নেতৃত্বে; মার্কস, জন্মলগ্ন থেকে বিকাশশীল পর্বে, বুর্জোয়া সমাজের ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেছেন: "The bourgeoise has played a a most revolutionary role in history .... the bourgeoise, whatever it has got the upper-hand has put an end to all feudal, patriarchal, idyllic relations."

কিন্তু আমাদের মত ঔপনিবেশিক সমাজে বুর্জোয়া শক্তি স্বভাবতই 'upper-hand' পায়না, পায়নিও। সামন্তব্যবস্থায় বন্ধক থেকেই এই সমাজ ও তার উপরিথাকগুলি গড়ে উঠেছে। তাই আমাদের বুর্জোয়া-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জাতীয় আন্দোলন গোড়া থেকেই সংস্কারবাদী, আপোষমুখী এবং এই কারণেই স্ববিরোধী ও শভিনিজম্-এর রোমান্টিক আবেগে নিষিক্ত থেকেছে। আবার এরই মধ্যকার লৌকিক ও গণমুখী ঐতিহ্যই গোটা জাতির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতির ইন্ধন যুগিয়েছে। বলা যায়, আমাদের জাতীয় জাগরণের ঐতিহ্য জোয়ার ভাঁটার স্বভাব-শরীরেই গড়ে উঠেছে। তাই একই সিপাহী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, খিলাফৎ-অসহযোগ আন্দোলন অথবা আফ্রিকার বোয়ার যুদ্ধ, চীনের বক্সার আন্দোলন সম্পর্কে বাঙালী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টিকোন ও ভূমিকা দুই রকমের হয়েছে। রামমোহনের যথার্থ উত্তর সাধক রবীন্দ্রনাথ যে সময়ে ও যেসব ঘটনায় ব্রিটিশ শাসনের বর্বরতাকে ধিক্কার দিয়েছেন, সেই সময়ে একই ঘটনায় রক্ষণশীল পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবী অংশ ব্রিটিশ প্রভুদের বন্দনাগীত ও তাদের পক্ষে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করেছেন।

বিশের দশকে আলোচ্য বিপরীতমুখী ধারার সঙ্গে নতুন উপাদান ও বাস্তব পরিস্থিতি কার্যকর হয়েছে। একদিকে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-জনিত সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-পীড়নের ও তার প্রতিবাদী শক্তির তীব্রতা বেড়েছে, অপরদিকে রুশ দেশের **নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাবে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের** সীমাবদ্ধতা ভাঙতে ও শ্রমিক-কৃষকের ব্যাপক অংশগ্রহণে নতুন ইতিবাচক দিকে বাঁক নিতে সুরু করেছে। অবশ্য এই মোচড় লাগায় যাতনাও কম ছিল না; সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের 'গেল গেল রব' যতই সোচ্চার হয়েছে, তাদের বিশ্বাসঘাতী ক্লীব চরিত্র ততই উন্মোচিত হয়েছে। ঠোকর লাগার কারণে, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয়

সংগ্রামের পক্ষে এটা একদিকে কাজেরই হয়েছিল।

এই ঐতিহাসিক পর্বে রবীন্দ্রনাথ যেমন পাশ্চাত্য 'আলোকপ্রাপ্ত'দের (Enlightenment) যুক্তিবাদী উদার গণতন্ত্র ও মানবতার আদর্শকে ঊর্ধে তুলে 'লড়াইয়ের মূল', 'বাতায়নিকের পত্র,' 'শিক্ষায় মিলন,' 'সত্যের আহ্বান' প্রভৃতি মূল্যবান প্রবন্ধ ও 'বসুন্ধরা', 'বলাকা' ও 'ঝড়ের খেয়া' প্রভৃতি মহান কাব্য রচনা করেছেন, তেমনি অপরদিকে জমিদার-পুঁজিপতিদের প্রতিনিধি ও মধ্যযুগীয় মতার্শের কংগ্রেসী নেতা গান্ধী, জার আমলের রুশী 'নারোদনিক'দের মত, চরখাপূজা, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও শিল্পায়ন বর্জন ইত্যাদি পশ্চাৎপদ কর্মসূচীর সঙ্গে মিল রেখেই জালিয়ান-ওয়ালাবাগের ঘটনায় (১৯১৯) ও চৌরীচৌরা কৃষকবিদ্রোহে (১৯২২) জলছড়া দিয়েছেন। এই সময়ে 'বলশেভিকবাদ'কে আক্রমণ করে কলম আর মুখ চালিয়েছেন পণ্ডিচেরীর নলিনীকান্ত গুপ্ত, সুরেশ চক্রবর্ত্তী আর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শশাঙ্কমোহন সেনের দলবল।

পল্টন জীবনের আগে নজরুল চুরুলিয়া, রাণীগঞ্জ ও আসানসোল অঞ্চলের গায়ক-অভিনেতা ও লোক কবি ছিলেন। হাফেজ গালীব ও আউল-বাউলের বিশ্বজনীন মানবতার ঐতিহ্যে সজীব কবিমানসে যুদ্ধফ্রণ্টে লালফৌজের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের তাপ লেগে, **রুশ বিপ্লবের ইস্তাহার** ও অন্যান্য কাগজপত্র পড়ে স্বাধীনতাকামী দেশপ্রেমের বিদ্রোহী চেতনা নিয়েই ফিরেছিলেন দেশে; স্বভাবতই লোক-সংস্কৃতি ও বিপ্লবী যুদ্ধের সমীকরণে গড়া তাঁর সৃজনশীল ব্যক্তিত্বে দেশের শ্রমিক-কৃষক ও নিপীড়িত জনসাধারণের মুক্তিবাসনা চাঁদের টানে জোয়ারের মতই উত্তাল হয়ে উঠেছিল। আর একটি ঘটনা তাঁর গতিশীল কবিসত্তাকে আরও সমৃদ্ধ করেছিল, তা হল শ্রমিক-কৃষকের মহান নেতা ও কম্যুনিস্ট আন্দোলনের পথিকৃৎ **শ্রদ্ধেয় মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে তাঁর মিলন** যার ফল রাশিয়ায় গোর্কি ও লেনিনের মিলনের মত ঐতিহাসিক তাৎপর্য অর্জন করেছিল। মূলতঃ খাঁটি কবি হওয়ার কারণেই, তিনি সক্রিয় কল্পনা ও ইতিবাচক দেশপ্রেমের দিকে, ঐতিহাসিক ভবিষ্যতের রাজনৈতিক সংগ্রামের দিকে দ্রুত পা ফেলে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক কবিসত্তা কোন বিশেষ বাঁকে বা স্তরে সীমাবদ্ধ ও দ্বিধাগ্রস্ত থাকেনি; খুব অল্প সময়ের মধ্যেই একটি ক্রমবিকাশমান চেতনার আলোড়ন সৃষ্টি করে গোটা যুগের জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগামী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনকে ধারণ ও প্রকাশ করেছিলেন।

এই সময়কার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের আগুয়ান শক্তিগুলি

বোঝার জন্য 'নভেম্বর বিপ্লব'-এর (১৯১৭) তাৎপর্যটি জানা দরকার। নভেম্বর বিপ্লব কেবল জাতীয় সীমার মধ্যে একটি দেশের নিজস্ব ও বিচ্ছিন্ন কোন রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনা ছিল না; এটি ছিল সারা দুনিয়ার সমাজ ব্যবস্থার, মানব-জাতির বিশ্ব-ইতিহাসের একটি মৌলিক পালাবদলের বিপ্লব। যে কোন দেশের পুঁজিবাদী ও সামন্ত-পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা ও তার উপনিবেশিকের জীর্ণ ও ভয়ংকর পদ্ধতিকে শিকড়শুদ্ধ উপড়ানোর ও নতুন সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-পদ্ধতির দিকে মেহনতি মানুষকে নাড়িয়ে দেওয়া ও জাগিয়ে তোলার বিশ্বশক্তি হল এই নভেম্বর বিপ্লব।

দুনিয়ার ইতিহাসে এর আগে যে সব বিপ্লব হয়েছিল, তাতে শোষকদের এক শ্রেণীর বদলে আর এক শ্রেণীর ক্ষমতা পাওয়ার ঘটনা হয়েছে; একমাত্র ব্যতিক্রম প্যারী কমিউন (১৮৭১), যা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বৈপ্লবিক নীতি ও পদ্ধতির উপর অল্প কয়েকদিনের জন্য দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তার শক্তি মরেনি।

নভেম্বর বিপ্লবের নীতি ও লক্ষ্য হল : মানুষের দ্বারা মানুষকে শোষণ করার সমাজপদ্ধতি খতম করা, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা, এবং একটি নতুন শ্রেণীহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়া। স্বভাবতই চীন ও ভারতের মত ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশের নিপীড়িত জাতিগুলির মুক্তি সংগ্রামগুলিতে এই নভেম্বর বিপ্লবের মতাদর্শগত প্রভাব পড়েছে, গতি ও পরিবর্তন এনেছে।

আমাদের দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিস্থিতি বর্ণনা প্রসঙ্গে অযোধ্যা সিং তাঁর 'ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন: "আমেদাবাদ, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলের এবং কলকাতার চটকল শ্রমিকরা একে একে লড়াই সুরু করে, ১৯১৯ সালে প্রায় সারা বছর ধরেই হরতাল চলে; এ বছরের মার্চ-এপ্রিলে শ্রমিকশ্রেণী রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে হরতাল করে রাজনৈতিক চেতনার পরিচয় দেয়। ১৯২০ সালের প্রথমে সারা দেশের শ্রমিকশ্রেণীর লড়াই আরও বাড়ে। কানপুরের ১৭,০০০ কারখানা শ্রমিক, জামালপুরের ১৬,০০০ রেল-শ্রমিক, কলকাতার ৩৫,০০০ চটকল শ্রমিক, বোম্বাইয়ের বিভিন্ন কল-কারখানার ২,০০,০০০ শ্রমিক, শোলাপুরের ১৬,০০০ বস্ত্রকল শ্রমিক ও ২০,০০০ ডক শ্রমিক, টাটার ইস্পাত কারখানার ৪০,০০০ শ্রমিক, মাদ্রাজের ১৭,০০০ এবং আহমেদাবাদের ২৫,০০০ বস্ত্রকল শ্রমিক ধর্মঘটে সামিল হন, এইসব ধর্মঘটের পটভূমিকায় ১৯২০ সালে শেষ দিকে 'অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' এর (এ. আই. টি. ইউ. সি) জন্ম হয় এবং পরের বছরের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির জন্ম হয়।"

তখনকার অমৃতবাজার পত্রিকা, এমনকি ব্রিটিশ শ্রম-দপ্তর যে হিসাব দিয়েছে তাতে দেখা যায়, ১৯২১-২২ সালে সারা ভারতে ৬৭৪টি ধর্মঘট হয়েছে এবং তার মধ্যে বাংলা ও বোম্বাইতেই ৫৪০টি; শহরাঞ্চলের শ্রমিকদের এই জাগরণের ঢেউ লেগেছিল গ্রামের কৃষকদের বুকেও; মালাবারের মোপালা, পাঞ্জাবের আকালী, উত্তরপ্রদেশের ব্যাপক অঞ্চলের খাজনা বন্ধের কৃষক আন্দোলন তখনকার ব্রিটিশ শাসন ও সমাজের ভিৎ নাড়িয়ে দিয়েছিল। এই সঙ্গে নানা অঞ্চলে সংগঠিত কৃষক সভাও গড়ে উঠেছিল; মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল তাঁর 'কৃষকসভার ইতিহাস এ বলেছেন: "এই সকল বিভিন্ন ধরণের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ও সংঘাতের মধ্য দিয়েও কৃষকদের শ্রেণী-আন্দোলন অন্য কতকগুলি প্রদেশের মতো বাংলাতেও দানা বাঁধছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্রাথমিক ধরণের কাজ সুরু হয়েছিল। ১৯২১ সনে নদীয়া জেলার চুয়াডাঙ্গা মহকুমার কাপাসডাঙ্গা গ্রামে একজন স্থানীয় ইতালীয় মিশনারীর উদ্যোগে একটি কৃষক সমিতি গঠিত হয়েছিল এবং তার সম্মেলনও হয়েছিল। এই শতকের তৃতীয় দশকের আরও ব্যাপক ভিত্তিতে কয়েকটি জেলায় কৃষক সংগঠন তৈয়ার হয়েছিল। ১৯২৫-২৬ সনে হাওড়া, বীরভূম প্রভৃতি জেলায় রায়তসভা গঠন করা হয়েছিল।" দেখা গেছে রুশ বিপ্লব, শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন ও যুব জাগরণের সম্মিলিত আবেগকে আত্মস্থ ও উদ্দীপিত করে নজরুল কাব্য-সঙ্গীতের জলপ্রপাত ঘটিয়েছেন। অথচ 'বিশুদ্ধ নন্দনতত্ত্ব'-এর পূজারীরা তাঁর কাব্যকে 'ভাবালুতায় আবিল,' 'অচেতন বাগ্‌বিন্যাস' (বুদ্ধদেব বসু) 'অসহযোগ আন্দোলনের ভাঁটার মুখে অনেকটাই কোলাহল' (ডঃ দীপ্তি ত্রিপাঠি) এবং 'অন্তর্নিহিত শক্তি অল্প' (ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়) এইসব বলে বিশ্ববিদ্যালয়ী কেতাবী পণ্ডিতকুল তন্ত্রধর্মী ও ফ্রয়েডীয় শারীরিকতার রহস্যজাল বিস্তার ও আধ্যাত্মিক কল্পনাবিলাসকেই 'আধুনিক' কাব্যের শিল্প-লক্ষণ বলে ফতোয়া দিয়েছেন।

নজরুলের 'ব্যথার দান' (১৯১৯) গল্পের দারা ও সয়ফুল মুল্ক্ বেলুচিস্তান থেকে আফ্‌গানিস্তানের সীমানা পেরিয়ে তুর্কিস্তানে, ককেসাসে গিয়ে লালফৌজে যোগ দিয়েছিল এবং জারের প্রতিবিপ্লবী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়েছিল। মুজফ্‌ফর আহমদ তাঁর 'অক্টোবর বিপ্লব' নিবন্ধে বলেছেন:

"গৃহযুদ্ধের সময়ে রেড আর্মিতে আন্তর্জাতিক ব্রিগেড গঠিত হয়েছিল। তাতে ভারতীয় সৈন্যরাও ছিল। ১৯১৮ সালে ইরাণ হতে ব্রিটিশ দখলদার সৈন্য এসে ট্রান্স-ককেশাস দখল করেছিল। এই সৈন্যদের মধ্যে ভারতীয় সৈন্যরাও ছিলেন।

তাঁদের গায়ে রুশ বিপ্লবের কোন ছোঁয়াচ যাতে না লাগে, সেজন্য ব্রিটিশ অফিসারেরা কড়া নজর রেখেছিল। এমনকি স্থানীয় লোকেদের সঙ্গেও মেলামেশা বারণ ছিল। তা সত্ত্বেও ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। কিছু ভারতীয় সৈন্য ব্রিটিশ অফিসারদের নাকের ডগার উপর বেয়নেট তুলে লালফৌজে এসে যোগ দিলেন। তারাই দাগিস্তান ও কার্বালার পার্বত্য এলাকায় যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁদের অফিসার মুর্তজা আলীর সাহসিকতাপূর্ণ যুদ্ধের কথা ওদেশে প্রবাদে পরিণত হয়েছে। ইরাণের খুরাসন প্রদেশে বিশাল বাহিনী আড্ডা গেড়েছিল। এখান থেকেও অনেক পাঠান সৈন্য পালিয়ে গিয়ে লালফৌজের আন্তর্জাতিক ব্রিগেডে যোগ দেন....আজ ক্রুশ্চব ও তাঁর পরবর্তী নেতারা সোভিয়েত রাশিয়াকে যেখানেই এনে দাঁড় করান না কেন, আমি বলব যে অক্টোবর বিপ্লব আমাদেরও বিপ্লব।" (গণশক্তি, পঞ্চাশতম নভেম্বর বিপ্লব সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৬৭)। নজরুলের গল্পের সয়ফুল বলছে—'ঘুরতে ঘুরতে শেষে এই লালফৌজে যোগ দিলুম। এ পরদেশীকে তাদের দলে আসতে দেখে তারা খুব উৎফুল্ল হয়েছে। আমায় আদর করে এদের দলে নিয়ে এরা বুঝিয়ে দিলে, কত মহাপ্রাণতা আর পবিত্র নিঃস্বার্থপরতায় প্রণোদিত হয়ে তারা উৎপীড়িত বিশ্ববাসীর পক্ষে অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে এবং আমিও সেই মহান ব্যক্তি-সংঘের একজন।....দারা কোথা হতে এখানে এলো? সেদিন তাকে অনেক করে শুধোতে সে বললে—এর চেয়ে ভাল কাজ আর দুনিয়ায় খুঁজে পেলুম না, তাই এ দলে এসে যোগ দিলুম।'

কলকাতায় ফিরে ১৯২০ সালের ১২ই জুলাই মুজফ্‌ফর আহমদ ও নজরুলের যুগ্ম সম্পাদনায় 'নবযুগ' যখন বেরুল, তার বছর খানেক আগে, ১৯১৯, ১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগে ব্রিটিশ পুলিশ নৃশংসভাবে শ্রমিক হত্যা করেছে, গান্ধীর 'আইন শৃঙ্খলা রক্ষার' আহ্বান সত্ত্বেও সারা দেশে অসহযোগ আন্দোলন তীব্রতর হয়েছে। তখনকার এই আন্দোলনে, ভদ্রশ্রেণীর শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের নেতৃত্ব পছন্দ না করলেও, 'নবযুগ' শ্রমিক-কৃষকের কথা, তাঁদের বিদ্রোহী সত্তাকে জাগানোর কথা লিখে গেছে। ১৯২১ সালের ১৭ই নভেম্বর 'প্রিন্স অব ওয়েল্‌স'-এর ভারত আগমন উপলক্ষে বোম্বাই ও কলকাতায় হরতাল হয়েছিল; নজরুল কুমিল্লায় এই প্রতিবাদ দিবস পালন করেন 'জাগরণী' গান রচনা করে ও সেই গান কোরাসে পথে পথে গেয়ে; এই মাসেই কমরেড মুজফ্‌র আহমদের সঙ্গে রাজনৈতিক কর্মী নজরুল কমিউনিস্ট পার্টি গড়ায় সহায়ক হয়েছিলেন এবং

চিরবিদ্রোহী কবি নজরুল ডিসেম্বরে সৃষ্টি করলেন 'বিদ্রোহী', ১৯২২ সালের জানুয়ারীতে 'ভাঙার গান' ('কারার ঐ লৌহ কপাট, ভেঙে ফেল') এবং 'প্রলয়োল্লাস' ('ঐ নূতনের কেতন উড়ে....')।

নজরুল রবীন্দ্র-সমকালের উত্তরসূরীদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ ও মোহিতলালের মত স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন সত্য; কিন্তু, প্রথমতঃ এদের সঙ্গেও নজরুলের পার্থক্য ছিল, দ্বিতীয়তঃ রবীন্দ্রনাথের সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ত-সংস্কার বিরোধী ব্যক্তিচেতনার ঐতিহ্য তাঁর মধ্যে কাজ করেছিল; তবে যেহেতু তিনি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবেশে লালিত, সুফী-দর্শন ও যাত্রা-লেটোর প্রভাব, রুশ-বিপ্লবের আবেগ, নিবারণ ঘটকের মত দেশপ্রেমিক বিপ্লবী, মুজফ্ফর আহ্মদ ও আব্দুল হালিমের মত মার্কসবাদী গণ-সংগঠকের প্রভাব তাঁর মধ্যে প্রবলভাবে কাজ করেছে, তাই রবীন্দ্রনাথের ভাববাদ তাঁকে ভর করেনি। অপরদিকে ভাব ও মেজাজে রবীন্দ্র অনুসারী হয়েও, সত্যেন্দ্রনাথ ছন্দকলা, আঙ্গিক প্রকরণ ও কারুকৃতির বৈচিত্র্য এনে রবীন্দ্র-মণ্ডল থেকে খানিকটা সরে গেছেন। তবে তাঁর মধ্যেও দেশের স্বাধীনতা, ইতিহাস ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য, ও শ্রমিক দরদ মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে। আবার সত্যেন্দ্রনাথে যে জিনিসের অভাব ছিল তা পূরণ করতে গিয়ে, পাশ্চাত্য সাহিত্য-দর্শনের আঁচে শুকিয়ে মনন ও দার্শনিকতার গভীরে গিয়ে মোহিতলাল পৌঁছলেন তান্ত্রিক দেহবাদে, এবং যতীন্দ্র সেনগুপ্ত হারালেন দুঃখ আর নেতিবাদে। প্রথমজন আত্মার কথা ভুলতে গিয়ে দেহের সীমানায় আটক পড়েছেন; দ্বিতীয়জন প্রেম, ধর্ম ও অনন্তকে অস্বীকার করতে গিয়ে চৈত্রের শুকনো হাওয়ায় গরুর গাড়ীর ক্যাঁচ-ক্যাঁচ সুরে এলিয়ে পড়েছেন। নজরুল স্মৃতিকথায় মুজফ্ফর আহ্মদ লিখেছেন: 'নজরুল শুধু শিক্ষিত সমাজে কাব্যচর্চা করত না। তার পরিচয়ের পরিধিও সুবিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। আমি দেখেছি তার গান ও কবিতার আবৃত্তি শোনার জন্য চটকলের মজুরেরা পর্যন্ত তাকে ডেকেছে; পরে সে কৃষকদের মধ্যেও ঘুরেছে, বক্তৃতা দিয়েছে, অর্থাৎ শিক্ষিত সমাজের গণ্ডীর মধ্যে সে শুধু নিজেকে ধরে রাখেনি। সে পৌঁছেচে জনগণের মধ্যেও; এইজন্য বাংলাদেশের কবিদের মধ্যে নজরুল সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হতে পেরেছিল। আজও কারখানার মজুররা তাঁর জন্মদিবস পালন করে।" এই বিশের দশকে আদর্শবাদী শিক্ষিত, তরুণদের একাংশের মধ্যে রুশ বিপ্লব ও তলস্তয়-গোর্কি সম্পর্কে আকর্ষণ ও আবেগ কিছু দেখা দিলেও, যুগান্তর-অনুশীলনের সঙ্গে পাশ্চাত্যের ম্যাকসুইনি, কলিন্স ও আইরিশ বিদ্রোহের সন্ত্রাসবাদী ঝোঁক

মিশে অচিরেই তাঁরা শ্রমিক-কৃষকদের গণ-আন্দোলনের প্রয়োজনবোধ থেকে সরে গিয়েছিলেন। এঁদের অধিকাংশই অবশ্য ১৯২৯-৩০-এর মীরাট মামলার পর বন্দীদশায় মার্কসবাদে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

নজরুল কখনোই কবি-যশোপ্রার্থীর মোহে কবিতা ও গান সৃষ্টি করেননি; বিষয়ভাবনায়, রাজনৈতিক মতাদর্শে ও সাংগঠনিক প্রয়োজনের একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখেই তাঁর কবিতা ও গানের জন্ম হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রাথমিক প্রয়াস চালানোর সময়েও যেমন তিনি 'নবযুগ' পত্রিকাকে কাজে লাগিয়ে লেবার অ্যাণ্ড স্বরাজ পার্টিতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন, তেমনি ১৯২১ সালে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার সময়ে মুজফ্ফর আহমদ ও হেমন্ত সরকার প্রমুখ সাচ্চা দেশপ্রেমিকদের সঙ্গে থেকে কেবল সাংগঠনিক কাজই করেননি, এই কাজকে মহিমান্বিত ও অনুপ্রাণিত করার জন্য 'বিদ্রোহী' এবং 'প্রলয়োল্লাস' প্রভৃতি কাব্য সৃষ্টি করেছেন। 'বিদ্রোহী' কবিতার 'আমি' কোন বিচ্ছিন্ন তন্ত্রবাদী অহং-এর উপলব্ধি নয়। অথচ মোহিতলালের পরোক্ষ প্ররোচনায় রব উঠেছিল, এটি তাঁর 'আমি' নিবন্ধেরই কাব্যানুবাদ। নজরুলের 'প্রলয়োল্লাস'কেও অনেকে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি অভিনন্দন বলে ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন। এ সব ঘটনা, পরিশীলিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবিদের সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা ছাড়া কিছু নয়। এমনকি, তথাকথিত রবীন্দ্র-বিরোধীরা পর্যন্ত নজরুলের 'হেটো-মেঠো জনতার রণসঙ্গীত'গুলিকে অ-সাহিত্য বা সত্য-শিব-সুন্দরের অবমাননা বলে কান-ফুসলিয়ে রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত নজরুলের বিরুদ্ধে উত্যক্ত করে তুলেছিলেন, যার দরুণ সাময়িক ভাবে তিনি নজরুলের এইসব কবিতাকে 'যুগের হুজুগ' বা 'তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁচা' বলে ব্যঙ্গ করেছিলেন; পরে অবশ্য তাঁর 'ধূমকেতু' পত্রিকা ও কবিতাকে 'জাগিয়ে দে রে চমক মেরে/আছে যারা অর্ধচেতন' বলে অভিনন্দিত করেছেন এবং ১৯২২ সালে এই পত্রিকার শারদ-সংখ্যায় 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা লেখার কারণে, গ্রেপ্তার হয়ে ১৯২৩ সালে হুগলী জেলে থাকার সময়ে অনশন-আন্দোলনরত নজরুলকে তাঁর 'বসন্ত' কাব্যনাট্য উৎসর্গ করে সম্মানিত করেছেন। তিনি বুঝেছিলেন, নজরুলকে জাতির প্রয়োজন আছে। বলাবাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধি গণচেতনাপ্রসূত ছিল না; তিনি নজরুলের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যৌবনশক্তির বীর্যদীপ্ত চেতনাকেই অভিনন্দিত করেছিলেন।

১৯২১-২২ সালে কর্মী ও স্রষ্টা নজরুলের ব্যক্তিত্বে একাধারে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, রুশ বিপ্লব, কমিউনিষ্ট পার্টি ও শ্রমিক কৃষক সংগঠন কর্মের মিশ্র

অনুভূতি প্রচণ্ড বিস্ফোরণে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তাঁর 'বিদ্রোহী' ভৃগু যেমন ভগবান বুকে পদচিহ্ন এঁকে দেয়, তেমনি 'ধূমকেতু' কবিতায় শানিত তরবারির মত ঝল্সানো ঘোষণা—

'এ চিতাগ্নিতে জগদীশ্বর পুড়ে ছাই হবে, হে সৃষ্টি জান কি তা ?

কি বল ? কি বল ? ফের বল ভাই আমি শয়তান-মিতা।'

এতো এথেইস্ট শ্রেণীর প্রমেথিউস-এর মত আপোষহীন বিদ্রোহের লাভাস্রোত! অবশ্য নজরুলের 'বিদ্রোহী'তে যে রোমান্টিক ভাবোচ্ছ্বাসের প্রকাশ হয়েছে তাকে ব্যক্তিচৈতন্যের বাঁধভাঙা বিস্ফোরণ বলে মনে করলে ভুল হবে। তাঁর 'আমি' বিভিন্ন পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক রূপকল্পে গোটা যুগের শ্রমিক ও যুবসমাজের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের দুর্বার বাসনা ও সংকল্পকে প্রতিফলিত করেছে; সমগ্রভাবেই কবিতাটি হয়ে উঠেছে সমকালের রাজনৈতিক ও সামাজিক আবেগের প্রতীকিত প্রকাশ। বাংলা কাব্যের ইতিহাসে এ জাতীয় কবিতা অভূতপূর্ব ও আজও অনন্য। সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর 'Indian Struggle' গ্রন্থে লিখেছেন: During 1920-22 conflicts between Political prisoners and the Prison authorities took place in many Prisons in India. Matters came to a head in two Prisons in Bengal—at Barisal and Faridpur. Political prisoners demanded decent treatment at the hands of the authorities and refused to submit to humiliating treatment meted out to prisoners in Indian Jails." নজরুল কাব্যের রণধ্বনি তুলে যেমন হাজার হাজার শ্রমিক ও যুবকের সঙ্গে জেলে গেলেন, তেমনি সেই কাব্য-সঙ্গীতেরই হাতিয়ারে, নৈরাশ্যের বিরুদ্ধে তো বটেই মানবিক অধিকারের সপক্ষে কাব্য সঙ্গীতের দামামা বাজিয়ে আকাশ-মাটি মুখরিত করে তুললেন: 'কারার এই লৌহ কপাট / ভেঙে ফেল করবে লোপাট / শিকল পূজার পাষাণ বেদী' (ভাঙার গান), 'এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল,' 'বন্দীশালা মাঝে ঝঞ্ঝা পশেছে রে' (বন্দীর বন্দনা)। শুধু স্বদেশেই নয়, বিশ্বসাহিত্যে জেলখানার কবিতার যদি সংকলন বের হয়, তবে নজরুলের এই সঙ্গীতগুলি জ্বলজ্বল্ করবেই; কেবল বাংলায় কেন, ভারতীয় সাহিত্যে একই আধারে এই রকম সঙ্গীত ও কবিতা সত্যই দুর্লভ। এ সব গান কেবল জেলবন্দী দেশপ্রেমিকদের নয়, যে কোন পরাধীন ও ঔপনিবেশিক দাসত্বে নিপীড়িত মানুষের, এমনকি স্বাধীনদেশের পুঁজিবাদী জোয়ালে জর্জরিত ও শৃঙ্খলিত মানুষের ঘুম ভাঙার গান,

মানবিক বিবেকের অপরাহত চ্যালেঞ্জের রণ-সঙ্গীত। এ সব কেবলই ভাঙার জন্যই 'ভাঙার গান' নয়; সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি-বিপ্লবী বাহিনীর বিরুদ্ধে লাল-ফৌজের বিপ্লবী যুদ্ধ দেখে তিনি বুঝেছেন, বিপ্লবীরা নতুন সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ার জন্যই পুরোন ব্যবস্থা ভাঙে। কবি নিজেই বলেছেনঃ "নতুন করে গড়তে চাই বলেই তো ভাঙি; শুধু ভাঙার জন্যই ভাঙার গান আমার নয়। আর ঐ নতুন গড়ার আশাতেই যত শীঘ্র পারি ভাঙি—আঘাতের পর নির্মম আঘাত হেনে পচা-পুরাতনকে পাতিত করি।" বোঝা যায়, মোহিতলাল প্রমুখ রক্ষণশীল শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা সে সময় কেন স্থিতাবস্থা বেসামাল হবার উদ্বেগে চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। তখনকার সাহিত্য-সংস্কৃতির শিবিরে এই রকম সমাজবিমুখ আত্ম-কেন্দ্রীক প্রবণতা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। 'কৃষক কে' নিবন্ধে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেনঃ "বাঙ্গলায় বিপ্লবান্দোলন হইয়াছে; তাহাতে চাষীভূষি মুটে মজুরেরা ও পতিতেরা অবজ্ঞাত ও ঘৃণ্যই হইয়াছে। বাঙ্গলায় 'দাদাবাদ' আন্দোলন হইয়াছে এবং এখনও আছে; তাহা গরীবের উত্থানের ঘোরতর বিরোধী। বাঙ্গলায় গান্ধী পরিচালিত কংগ্রেস আন্দোলন আছে; তাহারা পতিতের কাছে যাইতে চায় বা যায়, কিন্তু তাহা কেবল বাবুদের কার্যে ছোটলোকদের লাগাইবার জন্য, তাহা কেবল ছোটলোকদের **exploit** করিবার জন্য। এই নিপীড়িত গণশ্রেণীর কেন এই দশা, কেন পতিত হইল, ইহারা কাহারা, ইহাদের সহিত আমাদের কি সম্পর্ক প্রভৃতি মৌলিক প্রশ্ন কাহারও মনে উদয় না।" সমাজ ও রাজনীতির এই পরিবেশ-প্রবণতার মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি গড়া (১৯২১), ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের লেবর স্বরাজ পার্টি (১৯২৫) গড়া এবং পরের বছর তাকে ওয়ার্কাস এ্যাণ্ড পেজাণ্ট পার্টিতে রূপান্তরিত করার মত ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে 'প্রলয়োল্লাস' কবিতা, 'শ্রমিকের গান' (১৯২৬, কৃষ্ণনগরের বঙ্গীয় প্রজা সম্মেলন এর উদ্বোধনী গান) এবং ১৯২৬-২৭ সালে 'লাঙল'কে শ্রমিক কৃষকের মৈত্রী-ভিত্তিক 'গণবাণী'তে পরিণত করা ও তার মে-দিবস সংখ্যায় 'ইণ্টারন্যাশনাল' সঙ্গীতের ও কমিউনিস্ট ইশতেহারের অনুবাদ প্রকাশ প্রভৃতি সাংগঠনিক ও সৃজনশীল কর্মধারার মধ্যে নজরুলের গতিশীল ও পরিণততর ভূমিকা ও ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন ঘটেছে।

এদেশে সর্বপ্রথম শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী রাজনীতির সংগঠন গড়ার স্তরে, রুশ দেশের নভেম্বর বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়ে মুক্তিমন্ত্রের চারণকবি গাইলেনঃ 'ওই নূতনের কেতন উড়ে কালবোশেখী ঝড়'। তাঁর সিন্ধু পারের 'আগল ভাঙা' হল রুশ বিপ্লব; 'প্রলয়' মানে বিপ্লব, আর 'নূতনের কেতন' উড়ানোর ডাক হল স্বদেশেও

সমাজবিপ্লবের জন্য সংগ্রামের ঘোষণা। এই একই ১৯২০-২১-এর 'নবযুগ' পর্বে সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখেছেন—'আবার দূরে সেই. সর্বনাশা বাণীর সুর বাজিয়া উঠিল। রুশিয়া বলিল মারো অত্যাচারীকে! উড়াও স্বাধীনতা বিরোধীর শির! ভাঙো দাসত্বের নিগড়! এ বিশ্বে সবাই স্বাধীন!' কবির এই সময়কার দেশ-প্রেমের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী আদর্শের ও লালফৌজের প্রতি অনুরাগের মিশ্র অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। এই মিশ্র-প্রবণতা পরবর্তী 'ধূমকেতু' (১৯২২) পর্ব পর্যন্ত ছিল। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা'র 'রণভেরী' কবিতায় যখন বললেন 'লাল পল্টন মোরা সাচ্চা,' তখন বোঝা যায়, রুশ দেশের 'লালফৌজ' তাঁর কাছে কত প্রিয় ছিল। নজরুল বুঝেছিলেন, স্বদেশভূমিতে এই সমাজবিপ্লব সেইদিনই সফল হবে, যেদিন 'উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে- বাতাসে ধ্বনিবে না' এবং সেই **পূর্ণ স্বাধীনতা কখনই ধামা-ধরা আপোষ কামীদের রাজ-নীতির পথে আসতে পারে না**। তবে কোন্ সে পথ? কবি শেষ পর্যন্ত তাঁর এতদিনকার প্রিয় সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবের পথেও তাঁর স্বপ্নের রাষ্ট্র দেখেননি। নিজেই তাঁর 'বর্তমান বিশ্বসাহিত্য' প্রবন্ধে বলেছেনঃ "যাঁরা ধ্বংসব্রতী তাঁরা ভৃগুর মত বিদ্রোহী। তাঁরা বলেন এ দুঃখ এ বেদনার একটা কিনারা হোক। এর রিফর্ম হবে ইভলিউশন দিয়ে নয়, একেবারে রক্তমাখা রিভলিউশন দিয়ে। এর খোল-নলচে দুই বদলে একেবারে নতুন করে সৃষ্টি করব....দূর সিন্ধুতীরে বসে ঋষি কার্লমার্কস যে মারণমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, তা এতদিনে তক্ষকের বেশে এসে প্রাসাদের লুক্কায়িত শত্রুকে দংশন করলে। জার গেল, জারের রাজ্য গেল। ধনতান্ত্রিকের প্রাসাদ হাতুড়ি-শাবলের খায়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল....পাথরের স্তূপ সুন্দর তাজমহলে পরিণত হয়েছে।"

নজরুলের 'লাঙল' পত্রিকা প্রকাশ ও তাতে 'সাম্যবাদী' ও 'কৃষকের গান' সৃষ্টি থেকে ১৯২৭ সালে ঐ পত্রিকার 'গণবাণী' নামে রূপান্তরের পিছনে যে সব তথ্য আমাদের কাছে আছে, তা থেকে সমকালের রাজনীতি ও সংস্কৃতিচেতনার একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক ও নজরুলের কবি ব্যক্তিত্বের গভীরতর পরিচয় ফুটে ওঠে। বাংলার তৎকালীন রাজনীতি ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত অংশের সীমাবদ্ধতা বোঝার সুবিধার জন্য, উদ্ধৃতিটি কিছু দীর্ঘ হলেও তুলে দিচ্ছি। শ্রদ্ধেয় মুজফ্ফর আহমদ তাঁর 'নজরুল ও মধ্যবিত্ত সমাজ' নিবন্ধে বলেছেন: 'ধূমকেতু'র নজরুল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকদের নিকট হতে বীরের মর্যাদা পেয়েছিল। তাতেও জনগণের স্বার্থের কথা যে একেবারই থাকত না তা নয়, তবু কৃষকের স্বার্থের কাগজ ছিল না

'ধূমকেতু'। কিন্তু নজরুল যে সাপ্তাহিক 'লাঙল' এর প্রধান পরিচালক হলো এটা শিক্ষিত অংশের যুবকদের ভাল লাগল না। 'লাঙল' নামটিই এমন যে ভূমির ছোট বড় মালিকরা তা পছন্দ করলেন না। দেশের মধ্যবিত্ত যুবকেরা ভূমির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ভূমি হতে পাওয়া আয় তাঁরা ভোগ করতেন, কিন্তু ভূমি হতে কোন উৎপাদন তাঁরা করতেন না। এই কাজটির জন্য (এই সিস্টেম রাখার জন্যে : লেখক) মধ্যবিত্ত যুবকেরা অকাতরে জেল খাটতে পারতেন, প্রাণ বিসর্জনও দিতে পারতেন, কিন্তু ভূমিতে ছিল তাঁদের স্বার্থ। আজকের অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে এটা বুঝতে হবে, উনিশশ' বিশের দশকের অবস্থাকে সামনে রেখে। অসহযোগ আন্দোলন নিবে যাওয়ার পরে কেউ কেউ প্রজা ও কৃষক আন্দোলনের দিকে ঝুঁকেছিলেন। এমন লোকেদের একজন ছিলেন শ্রীহেমন্তকুমার সরকার। তখন তাঁর পরম বন্ধু, জমীদার কংগ্রেস নেতা শ্রীকিরণশঙ্কর রায় সুকৌশলে রটিয়ে দিলেন যে তিনি একজন পুলিশের চর। সুভাষচন্দ্র বসুকে তিনিই ধরিয়ে দিয়েছেন। মনে আছে, হেমন্ত সরকার একদিন কথায় কথায় আমায় বলেছিলেন, যশোহরের এক সভায় তিনি যখন প্রজা ও কৃষকের স্বার্থের বিষয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন শ্রীবীরেন্দ্র শাসমল হঠাৎ 'ভুঁইফোড়! ভুঁইফোড়! (apstart ! apstart !) বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন। এমনই ছিল উনিশশ' বিশের দশকে ভূমি মালিক মধ্যবিত্তদের শ্রেণীচেতনা। এই অবস্থায় বের হয়েছিল 'লাঙ্গল'। তাতে ছাপা হয়েছিল কবি নজরুল ইসলামের 'সাম্যবাদী' ও 'কৃষকের গান' ইত্যাদি" (পুনর্মুদ্রন, নন্দন, নজরুল সংখ্যা, ১৩৮৩)। একই সময়ে কুষ্টিয়ায় হেমন্ত সরকার, নজরুল, মুজফ্‌ফর আহমদ, ফিলিপ স্পার্ট ও আব্দুল হালিম, দুই শ্রেণীভিত্তিক ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজাণ্ট পার্টি গঠনের জন্য কমিউনিস্ট ইণ্টার-ন্যাশনালের ৬ষ্ঠ কংগ্রেসে সমালোচনা হওয়ার কারণে, বঙ্গীয় কৃষক লীগ গঠনে উদ্যোগ নিয়েছিলেন ; কিন্তু 'এরই মধ্যে মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলার সূত্রে মুজফ্‌ফর আহমদ প্রমুখ গ্রেপ্তার হওয়ায় এই উদ্যোম আর বেশী এগোতে পারেনি।

এই সময়ে নজরুলের 'লাঙলে' ও কৃষকের গান' বা 'লাঙলের গান' নিয়ে 'বঙ্গবাণী' ও 'আত্মশক্তি'র শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সাহিত্য-সেবীরা জোর সোরগোল তুলেছিলেন, বিশেষ করে সদ্য-প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসের শশী

কবি ও ডাক্তার (সব্যসাচী)-এর কথাবার্তায় চাষির জন্য অন্নসত্র খোলা যেতে পারে, তাদের জন্য লাঙলের গান দেওয়া যাবে কিনা—এই নিয়ে তোলা বিতর্কে ভূমিস্বার্থে বাঁধা মধ্যবিত্ত (তখন বিত্তে তাঁরা যথেষ্ট সম্পন্ন ছিলেন) সাহিত্যিকরা আসর সরগরম্ করছেন। শশী কবি যখন ঠিক করেছে, এবার সে কুলি-মজুর আর চাষাভুষো নিয়ে গান বাঁধবে আর গেয়ে বেড়াবে, তখন সব্যসাচী তাকে 'লাঙলের গান লাঙলধারীর গীতিকাব্য হবে না' বলে নিষেধ করেছে এবং সব্যসাচীর (সন্ত্রাসবাদের) বিপ্লবের গান গাওয়ার জন্য, জন্ম-স্তর বা 'শিক্ষিত ভদ্র জাতের জন্যেই' গান করার আহ্বান জানিয়েছে। এই চিত্রে শরৎচন্দ্র নজরুলকে 'আচ্ছা একহাত নিয়েছেন'—এই বলে 'আত্মশক্তি'র তারারা বা শ্রীতারানাথ রায় (যিনি 'দেশ-প্রাণতার অবতার' অভিধায় মুসোলিনীর জীবনী লিখেছিলেন) গরীব কৃষকদের জন্য দরদ বা সঙ্গীতসৃষ্টির বিরুদ্ধে, নজরুলের 'লাঙল'-এর বিরুদ্ধে 'জ্বালাময়ী' প্রবন্ধই লিখে ফেলেন। অবশ্য শরৎচন্দ্র যে ঐ অংশটি উদ্দেশ্যমূলকভাবেই জুড়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া গেল, যখন তিনি এই আক্রমণের জবাবে কোন রা কাটলেন না। জবাব দিলেন নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 'গণবাণী'তে (তখন 'লাঙল'-এর নাম বদলে 'গণবাণী' হয়েছে) 'লাঙলের গান' প্রবন্ধ লিখে। উল্লেখযোগ্য যে, চিত্তরঞ্জন তখন জেলে, বাসন্তী দেবী 'বঙ্গবাণী'র পরিচালিকা; ছাপা হয়েছে 'পথের দাবী', যাতে শিক্ষিত ভদ্র অংশের বিপ্লব-প্রয়াসে মুসলমান চরিত্রও থাকে না, কৃষকও অবজ্ঞাত। ১৯২৭ সালের ২৫শে আগস্ট 'গণবাণী'তে 'কৃষক ও শ্রমিক এবং শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়' নামে কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; তাতে তিনি বীর-পূজক, ধর্মভিত্তিক ও ত্রাস-মূলক যুব আন্দোলনের ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতার কথা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে বলেন: "বর্তমান শতাব্দীর সুরুতে প্রথমে বাংলায় এবং পরে সমগ্র ভারতে যে ত্রাস-নীতি-মূলক বিপ্লব মাথা তুলিয়াছিল তাহাতে শিক্ষিত হিন্দু যুবকগণই যোগদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতে হিন্দু রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। দুইটি বিপ্লবী দলই (অনুশীলন ও যুগান্তর—লেখক) ধর্মের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ওহাবী মুসলমানগণ তাঁহাদের প্রেরণা পাইয়াছিলেন কোর্-আন্ ও হাদিস্ হইতে আর হিন্দু যুবকগণ তাঁহাদের প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন গীতা ও উপনিষদ হইতে। স্বাধীনতা যদি যুবকগণের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু হয় তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ধনাভিজাত্য, জ্ঞানাভিজাত্য, ভূম্যাভিজাত্য ও বর্ণাভিজাত্য প্রভৃতি পরিহার করিয়া কৃষক ও শ্রমিকগণের ভিতরে তাহাদেরই লোক হইয়া কাজে লাগিতে হইবে। কৃষকগণের

নিরক্ষরতা তিরোহিত করিবার জন্য চীনে চল্লিশ হাজার যুবক আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা নিরক্ষরত্বকে বিদূরিত করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে কৃষকগণকে নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিতেছেন" (ঢাকায় যুব সম্মেলনের শ্রমিক ও কৃষক শাখার সভাপতিরূপে প্রদত্ত ভাষণ হইতে)। এই পর্বে, ১৯২৬, ১৮ই জানুয়ারী মৈমনসিংহ জেলা কৃষক সম্মেলনে বাণী পাঠিয়ে নজরুল জানালেন—"এত ভালবাসায় ভেজা যাদের মাটি, এত বুকের খুনে উর্বর শস্য শ্যামল মাঠ, আপনারা কিষাণ ভাইরা ছাড়া অন্য অধিকারী কেহ নাই; এই মাঠকে জিজ্ঞাসা কর—মাঠে ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইবে—এ মাঠ চাষীর, এ ফুল-ফল কৃষক বধূর।" পরের মাসেই কৃষ্ণনগরে নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনীর ২য় অধিবেশন হয়; এতেই 'বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল' গড়া হয়। নজরুল নিজের কণ্ঠে তাঁর 'শ্রমিকের গান' উদ্বোধনী সঙ্গীতরূপে গাইলেন—'ওরে ধ্বংস পথের যাত্রীদল / ধর হাতুড়ি তোল্ কাঁধে শাবল / ও ভাই আমাদেরই শক্তি বলে / পাহাড় টলে তুষার গলে / মরুভূমে সোনার ফসল ফলে রে'। এর আগেই কৃষক লীগ গঠনের সময়ে, 'লাঙল'-এ প্রকাশ করেছেন 'কৃষকের গান'—'ওঠরে চাষী জগদ্বাসী ধর কষে লাঙল / আমরা মরতে আছি ভাল করে মরব এবার চল।' বোঝা যায়, ১৯২৫-২৬ সালে বাংলা স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যাপক শ্রমিক-কৃষকের অংশগ্রহণে প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে ব্রিটিশ শাসন ও কায়েমী স্বার্থের উপর তীব্র আঘাত হানছিল। স্বভাবতই, ব্রিটিশ সরকার স্বদেশের কল-মালিক ও ভূমি-মালিক রক্ষণশীল অংশের সহায়তায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধিয়ে জাতীয় সংগ্রামের মূলশক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে ও ভেঙে দুর্বল করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

ডঃ মহাদেবপ্রসাদ সাহার মূল্যবান ভূমিকা ও নোট সম্বলিত হোরেস উইলিয়ামসনের 'ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড কমিউনিজম' গ্রন্থে যে তথ্য রয়েছে তাতে দেখা যায়, এই সময়ে (১৯২৬-২৮) বোম্বে, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ ও বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টির অগ্রণী ভূমিকায় হাজার হাজার পরিবহন, শিল্প, খনি ও কৃষি শ্রমিক এবং কর্মচারী ও নাবিকরা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসন, মালিক ও জমিদারদের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভে ফেটে পড়েন; এরই টানে জাতীয় কংগ্রেস গান্ধীবাদী অসহযোগ আন্দোলন ছেড়ে, জননিরাপত্তা বিল, বাণিজ্য-বিরোধ বিল-কে সামনে রেখে শ্রমিক-কৃষকদের নিয়ে জঙ্গী প্রতিবাদ আন্দোলনের কর্মসূচী নিয়েছে। এই সময় শ্রেণীভিত্তিক যুব-আন্দোলন গড়ায় ফিলিফ স্প্রাট, ধরণী গোস্বামী ও পুরণচাঁদ যোশী প্রমুখ প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দ উদ্যোগ নিলে, তারই জের হিসাবে ১৯২৮ সালে

ডিসেম্বরে পুনায় অনুষ্ঠিত 'বোম্বাই প্রদেশ যুব সম্মেলন'-এ জহরলাল নেহেরু বলেন : 'আমরা সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসের জন্য সব রকম চেষ্টা করে যাব এবং সমাজকে অন্য ভিত্তিতে গড়ে তুলব।' অবশ্য 'অন্য ভিত্তি'র প্রশ্নে তিনি সমাজতন্ত্র শব্দটি উচ্চারণ করলেও, জাতীয় ক্ষেত্রে 'সহযোগিতামূলক সমাজতান্ত্রিক কমনওয়েলথ' এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 'সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের বিশ্ব ফেডারেশন'-এর শ্রেণী-সমঝওতার লাইনই দিয়েছেন। জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের উল্লেখ করে উইলিয়ামসন বলছেন: **"While the Calcutta Congress was sitting, a huge demonstration of some 30,000 labourers marched in procession with red banners and took possession of the enclosure in spite of the protest of the Congress leaders. The incident was symbolic, not only of the communists hostility to mere non-violent nationalism, but also of the enormous increase in the influence and powers of organisation of the working classes under communist direction."** স্বভাবতই প্রচণ্ড কমিউনিস্ট ও গণপীড়নের সঙ্গে এই সময়ে দেশীয় প্রতিক্রিয়াচক্রের আগ্রহে ও সাহায্যে ব্রিটিশ শাসক যথারীতি ভয়ংকর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে দেয়।

নজরুল তখন সাম্প্রদায়িক বিভেদপন্থীদের মুখের উপর, কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে গাইলেন—'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' গান, হিন্দু-মুসলমান ধর্মে আলাদা হলেও, জাতিতে সংস্কৃতিতে এক, এই ঐতিহ্যবোধ জাগিয়ে গাইলেন—'মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান / মুসলিম তার নয়নমণি হিন্দু তার প্রাণ।' যে সময়ে 'পথের দাবী' বেরিয়েছে, সেই সময়ে নজরুলের 'কুহেলিকা' ও 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস দুটিও প্রকাশিত হয়েছে। নজরুল দেখিয়েছেন গ্রামীন সংস্কৃতির ধারায়, এমনকি সমকালের (প্রথম বিশ্বযুদ্ধজনিত অর্থনৈতিক সংকটে) ভয়ংকর ধনতান্ত্রিক শোষণে একাকার থেকেই হিন্দু-মুসলমান শ্রমিক ও কৃষক ঐক্যবদ্ধ। 'কুহেলিকা'য় সন্ত্রাসবাদী দেশপ্রেমিক প্রমত্‌দা রয়েছেন; তবে তিনি সব্যসাচীর মত অবাস্তব ও নাটকীয় নন। প্রমত্‌দার মধ্যে কোন বীর-পূজার ইমেজ নেই; অতি সাধারণ কর্মীদের খুবই ঘনিষ্ঠ। তাঁর কাছে হিন্দু-মুসলমান ভাই-ভাই এবং তাঁর দেশ গরীব নিরক্ষর কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষ। দেশ-প্রেমিক মুসলমান যুবক বিপ্লবী প্রমত্‌দার আদর্শে অনুপ্রাণিত এই কারণেই যে, প্রমত্‌দা বলেন—'আমার ভারতবর্ষ আর মানচিত্রের ভারতবর্ষ এক নয়। আমার

দেশ—ভারতের এই মূক দরিদ্র নিরন্ন পর-পদ-দলিত তেত্রিশ কোটি মানুষের ভারতবর্ষ। তা কোন মন্দির বা মসজিদের ভারতবর্ষ নয়—মহান মানুষের মহাভারত।' নজরুলের 'মৃত্যুক্ষুধা'তে কেবলই মৃত্যু ও ক্ষুধা নেই। কৃষ্ণনগরের এক দরিদ্র পরিবার ক্ষুধার জ্বালায় কিভাবে প্রচলিত ধর্ম-সংস্কার ভেঙে ফেলল এবং সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী যুবক কিভাবে সেই অভিজ্ঞতার উত্তাপে গণবিক্ষোভের ভাষা অর্জন করল তারই বাস্তবসম্মত ছবি এই কাহিনীর মর্মবস্তু। 'কুহেলিকা'র জাহাঙ্গীরের মত 'মৃত্যুক্ষুধা'র আনসার মানুষের সকল রকম দুঃখ-দুর্দশার বিরুদ্ধে, সামাজিক ও রাজনৈতিক অপশাসনের বিরুদ্ধে জীবন্ত প্রতিবাদ। জনগণের রিক্ততা, বঞ্চনা ও কান্না স্বাভাবিক সত্য নয়, তা শ্রেণীসমাজের চাপানো ব্যবস্থার ফল; মেহনতি মানুষের জীবনসত্য তাদের জাগরণ, তাদের স্বাধিকারের স্বর্গরচনা; তাই মানুষ সুন্দর। আনসার 'মানুষের জন্য সর্বত্যাগী হবে, সকল দুঃখ মাথা পেতে নেবে; তারা দুঃখী বলে নয়, তারা সুন্দর বলে।' এই সুন্দরের সাধনাতেই, এই দুঃখজয়ী সংগ্রামের সাধনাতেই **নজরুলের কথাসাহিত্য**, অঙ্গকলার শৈথিল্য ও সারল্য সত্ত্বেও, আমাদের গণ-সংগ্রাম ও সংস্কৃতির ধারায় মূল্যবান অবদান রেখেছে। উল্লেখযোগ্য যে, ১৯২৯-৩৩ সালে মীরাট মামলার দলিল, ডেভিড প্যাট্রি, গঙ্গাধর অধিকারী ও সুবোধ রায় প্রমুখ গবেষক-লেখকদের 'ভারতে কমিউনিজম'এর ইতিহাস থেকেও জানা যায়, জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনে, এই সময় থেকেই, কমিউনিস্ট কর্মধারা একটা মৌলিক ও গুণগত পরিবর্তন এনেছিল এবং সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা এরই প্রভাবে (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক) শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের গুরুত্ব বুঝেছিলেন এবং সামিল হয়েছিলেন।

নজরুল আমাদের সাহিত্য সঙ্গীত ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে **অনেক বিষয়েই পথিকৃৎ** হয়ে রয়েছেন। তাঁর মধ্যে দেশীয় রণসঙ্গীত বা রায়বেশের রেশ তো ছিলই, তার সঙ্গে পল্টন জীবন থেকে নিয়ে এসেছেন পাশ্চাত্য সিম্ফনিতে, ব্যাণ্ডে বাজানো সামরিক কুচকাওয়াজের সুর। ডি. এল. রায়ের কোরাসে চার্চ সঙ্গীতের প্রভাব রয়েছে; নজরুল আনলেন পাশ্চাত্য দেশের ফৌজী কুচকাওয়াজের ছন্দে ও সুরের কাঠামোয় ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সুর। তাঁর 'চল চল চল ঊর্ধ গগনে বাজে মাদল' এবং 'টলমল টলমল পদভরে / বীরদল চলে সমরে' গানগুলি যদি না হত, তবে ভারত ও বাংলাদেশের ফৌজী কুচকাওয়াজে এমন লাগসই সুর পাওয়া দুর্লভ হত। নজরুল এদেশের মুক্তিযুদ্ধের গণসঙ্গীতের মত ফৌজী রণসঙ্গীতেরও ভগীরথ। বলাবাহুল্য, এইসব রণসঙ্গীত পেশাদারী সৈন্যদের গান ছিল না। এগুলি

হল, ফৌজী সঙ্গীতের গড়নে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে যৌবনের জোস ও সৌন্দর্য সঞ্চারের গান। প্রখ্যাত সঙ্গীত-সমালোচক ও সংস্কৃতি আন্দোলনের অন্যতম প্রবীণ নেতা শ্রীনারায়ণ চৌধুরী তাঁর 'কাজি নজরুলের গান' গ্রন্থে বলেছেন: "নজরুলের কোরাস গানের প্রসঙ্গ মাত্র জাতীয়তাবাদেই নিবদ্ধ নয়; তিনি বাংলায় প্রথম শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলনমুখী গান লিখেছেন, যুবছাত্র ও নারী জাগরণের গানও লিখেছেন। পরাধীনতার মর্মজ্বালার সঙ্গে বিদেশী অপশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভীপ্সা সম্মিলিত হয়ে তাঁর কোরাস গানগুলিকে অবিস্মরণীয় করে রেখেছে।"

বাংলা সাহিত্যে শ্রমিক-কৃষকের কণ্ঠে নজরুলই প্রথম, কেবলই যে শ্রেণী-সংগ্রামের গান দিয়েছেন তা নয়, শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী মতাদর্শের 'আন্তর্জাতিক' এর (ইউজেন পতিয়েরের) বাংলা অনুবাদ গান ও তার সুর দিয়েছেন, মেহনতি জনগণের বিপ্লবী যুদ্ধের 'রক্ত পতাকার গান' (১৯২৮) দিয়েছেন। এইসব মহান সৃষ্টিকর্মে ভারতীয় সাহিত্যেও তিনি পথিকৃৎ। উল্লেখযোগ্য যে, এইসব সৃজনশীল কাজে কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সাহচর্য তাঁকে উৎসাহিত করেছিল এবং তিনি নিজেও কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের সঙ্গে, বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট পত্রপত্রিকার মাধ্যমে সংযোগ রাখতেন।

নজরুল, শ্রমিক-কৃষকের বিপ্লবী ভূমিকাকে উদ্দীপিত করে ধর্ম-সম্প্রদায়ের ভেদনীতির চক্রান্তের বিরুদ্ধে, বক্তৃতা ও গান নিয়ে, শ্রমিক-কৃষকদের পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে সাম্রাজ্যবাদী সরকার ও কায়েমী স্বার্থের মুখোশ খুলতে বারে বারেই নেমেছেন। এর জন্য তাঁকে নিন্দা লাঞ্ছনার মূল্যও দিতে হয়েছে। 'আমার কৈফিয়ৎ'-এ তার নজির রেখেছেন। হিন্দু দেব-দেবীর নাম মুখে আনার অপরাধে 'মৌ-লোভী যত মৌলবী আর মোল্‌লারা কন্ হাত নেড়ে'—'দাও পাজীটার জাত মেরে।' আবার ফার্সী শব্দে কবিতা লেখার জন্য হিন্দুরা তাঁকে 'পাত-নেড়ে' বলে গাল পেড়েছেন। এটা ছিল উভয় সম্প্রদায়ের রক্ষণশীল ও সাম্প্রদায়িক কায়েমী স্বার্থবাদীদের আক্রমণ। সাচ্চা মুক্তবুদ্ধির মানুষেরও অভাব ছিল না। নজরুলের প্রভাব ও পরামর্শে ১৯২৬ সালে ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর মুখপত্র 'শিখা' বের হয়। এই পত্রিকা মধ্যযুগের সুফী কবি সাদী, কামাল আতাতুর্ক, রবীন্দ্রনাথ ও রঁমা রঁলার বিশ্বজনীন মানবতার র‍্যাশনাল দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। দাঙ্গার বছরেই 'গণবাণী'তে নজরুলের 'মন্দির ও মসজিদ' ও 'হিন্দ-মুসলমান' প্রবন্ধ দুটি প্রকাশিত হয়। "একদিন গুরুদেব

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল আমার, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে। গুরুদেব বললেন, দেখ যে ন্যাজ বাইরে তাকে কাটা যায়, কিন্তু যে ন্যাজ ভিতরে গজায় তাকে কাটবে কে ?....এর আদি উদ্ভব কোথায় ? আমার মনে হয় টিকিতে ও দাড়িতে।" (হিন্দু-মুসলমান)। "....শুধু নির্বোধ মানুষের রক্তে তাহাদের বেদী চির কলঙ্কিত রহিয়া গেল। ভূতে পাওয়ার মত ইহাদের মন্দিরে পাইয়াছে, মসজিদে পাইয়াছে....মানুষের পশু প্রবৃত্তির সুবিধা লইয়া কত কাপুরুষই না আজ মহাপুরুষ হইয়া গেল" (মন্দির-মসজিদ)। এই দুটি প্রবন্ধ একত্রে 'দুর্দিনের যাত্রী' নামে বই হয়ে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করে। এর পিছনে কি স্বদেশের রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়াচক্রেরও কালো হাত ছিল না ? নজরুলের অনেক বই বাজেয়াপ্ত হয়েছিল ; তা নিয়ে 'ভদ্র' শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সাহিত্যসেবী মহলে তেমন কিছুই সোরগোল পড়েনি, যতটা হয়েছিল 'পথের দাবী'র জন্য, যা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী হলেও, সাম্প্রদায়িক ও পাতি-বুর্জোয়া অ্যাডভেঞ্চারিজম-এর বই ছাড়া কিছু নয়। এ বই সন্ত্রাসবাদী মধ্যবিত্ত বিপ্লবীদের খুব ভাল লেগেছিল, যেমন ভাল লাগত বিবেকানন্দের হিন্দুধর্ম ও তাঁর বাণী। বিবেকানন্দের কোন বই ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেনি ; কারণ ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার জারকে মেশানো তাঁর বাণী। তিনি ক্ষুধার্ত ও অচ্ছুৎ চণ্ডালকে 'ভাই' বলে ডেকেছেন, সে সময়ে এটাও কম কথা নয়। কিন্তু তাঁর কণ্ঠে মুসলমান পতিতের কথা ফোটেনি ; অথচ নজরুল তাঁর 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন'-এ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল পতিত ও চণ্ডালকে ভাই বলে আপন করে নিয়েছিলেন এবং মানুষকে তার সকল গণ্ডি ও সঙ্কীর্ণতা ভেঙে সেই পথে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। এই নিরিখে নজরুল আরও প্রগতিশীল।

অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খানের এক পত্রের উত্তরে নজরুলে লিখেছিলেন—"আমার দেশসেবার অপরাধের জন্য শ্রীমৎ সরকার বাবাজির আমার উপর দৃষ্টি অতিমাত্রায় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে, আমার সবচেয়ে চলতি বইগুলোই গেল বন্ধ হয়ে। এই সেদিনও পুলিশ আবার আমায় জানিয়ে দিয়েছে, আমার নব প্রাশিত 'রুদ্রমঙ্গল' আর বিক্রী করলে আমাকে রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত করা হবে।" কেন রাজদ্রোহ ? কারণ তিনি অসাম্প্রদায়িক **সাম্যবাদী মানবতার আদর্শে** তামাম মেহনতি জনতাকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন : 'জাগো জনশক্তি! হে আমার অবহেলিত পদপিষ্ট কৃষক, আমার মুটে-মজুর ভাইরা। তোমার হাতের ঐ লাঙল আজ বলরাম-স্কন্ধে হলের মত ক্ষিপ্ততেজে গগনের মাঝে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠুক, এই

অত্যাচারীর বিশ্ব উপড়ে ফেলুক। ছোঁড়ো হাতুড়ি, চালাও লাঙল, উচ্চে তুলে ধরো তোমার বুকের রক্তমাখা লালে লাল ঝাণ্ডা।"

ত্রিশের দশকের সুরু থেকে নজরুলের জীবনে প্রচণ্ড আঘাত, বিচ্ছিন্নতা ও সেই রন্ধ্রপথে অবক্ষয়ের অপদেবতার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। জীবনের পরমতম আদর্শগত বন্ধু মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার সূত্রে দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদ, কমিউনিষ্ট পার্টি (বেআইনী) ও অন্যান্য গণসংঠন থেকে সরে যাওয়া, প্রাণপ্রতিম পুত্র বুলবুলের বসন্ত রোগে মৃত্যু, স্ত্রী প্রমিলার দীর্ঘস্থায়ী রোগে সর্বস্বান্ত হওয়া—সব মিলিয়ে নজরুল এমনই মানসিক অবসন্নতা ও দুর্বলতায় ভেঙে পড়লেন যে, সেই বিচ্ছিন্নতার সুযোগে জুটে গেল কিছু অধ্যাত্মবাদী সাহিত্যিক বন্ধু ও অর্থ-লিপ্সু গ্রামাফোন কোম্পানী। ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত তাঁর 'নজরুল চরিত-মানস' গ্রন্থে এই সময়কার বন্ধু শ্রীনলিনীকান্ত সরকারের লেখা উল্লেখ করে বলেছেন: "বরদাচরণের যোগশক্তির প্রভাবে নজরুল তাঁর মৃত পুত্র বুলবুলকে একবার স্থূলদেহে দেখতে সমর্থ হন।" শ্রদ্ধেয় মুজফ্‌ফর আহ্মদ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন: "....শোকাতুর পিতার মনে যে দুর্বলতা প্রবেশ করেছিল তার নিকট সে ধরা দিল। সে গেল লালগোলা হাই স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মজুমদারের নিকটে। আগেই সে বারীন্দ্রকুমার ঘোষের নিকট শুনেছিল যে ত্যাগী যোগী শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সাধনায় তার কাছাকাছি গেছেন....যে বুলবুলের স্থূলদেহ মাটির তলায় পচে গিয়েছিল সে কি করে স্থূল দেহ নিয়ে বাবার সামনে হাজির হতে পারল? নিছক একটা ভ্রান্তির ব্যাপ্যার! এখান হতেই নজরুলের সর্বনাশের সুরু হয়েছিল।" নজরুলকে এই রকম সর্বনাশের পথে নামানোয় শ্রীকালিপদ গুহরায়, জনাব জুলফ্‌কার হায়দার ও শ্রীঅমলেন্দু দাশগুপ্তের 'অবদান' যথেষ্ট ছিল। প্রথম দুজনের একজন শেষ জীবনে কাশীর সাধু হয়েছিলেন, অপরজন ঢাকায় বসে তসবীহ্ (মালা) জপেছিলেন।

'কল্লোল যুগ'-এর লেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, নজরুলকে সাহিত্যিক মোহিতলাল গজেন ঘোষের আড্ডা থেকে কুড়িয়ে পান বলে উল্লেখ করেছেন। পল্টন-ফিরত নজরুল কলকাতায় এসে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের 'মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র আশ্রয় ও সান্নিধ্য পান, এবং তার রজত-জয়ন্তী হয়েছিল ১৯৪১ সালে কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে; আমন্ত্রিত নজরুল তাঁর জীবনের

শেষ ভাষণে বলেছেন: "সেদিন যদি সাহিত্য সমিতি আমাকে আশ্রয় না দিত, তবে হয়ত কোথায় ভেসে যেতাম জানিনা। এত ভালবাসার বন্ধনে প্রথম আমি নীড় বেঁধেছিলাম, এ আশ্রয় না পেলে, আমার কবি হওয়া সম্ভব হত কিনা জানি না" (স্মৃতিকথা, পৃঃ ৮৮)। শ্রদ্ধেয় মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ নজরুলের কাছে কেমন ছিলেন? ১৯২৬ সালে লেখা 'দুর্গম গিরি' গান নিয়ে, 'আত্মশক্তি'র তারারা গণবাণীর 'কর্ণধার' কে ও কেমন—এই প্রশ্নে ব্যঙ্গ করে চিঠি লিখলে, নজরুল তার জবাবে (১৩৩৩, ৮ই ভাদ্র) বলেছেন: "এমন সর্বত্যাগী আত্মভোলা মৌনী কর্মী, এমন ধ্যানীর দূরদৃষ্টি, এমন উজ্জ্বল প্রতিভা—সবচেয়ে এমন উদার বিরাট মন নিয়ে সে কি করে জন্মাল গোঁড়া মৌলবীর দেশ নোয়াখালীতে, এই মোল্লা মোলবীর দেশ বাংলায়, তা ভেবে পাইনে। ও যেন আগুনের শিখা, ওকে মেরে নিবৃত্ত করা যায় না। ও যেন পোকায় কাটা ফুল, পোকায় কাটছে তবু সুগন্ধ দিচ্ছে।" উল্লেখযোগ্য, ১৯২৪ সালে কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দী হয়ে, ক্ষয় রোগ ধরার কারণেই তিনি ছাড়া পেয়েছিলেন। এই সব তথ্য থেকে আমরা কি এই সিদ্ধান্ত করতে পারি না যে, অচিন্ত্যকুমারের বক্তব্য উদ্দেশ্যমূলক? আমরা বিভ্রান্তি বলতেও নারাজ এই কারণে, আমরা জানি, শ্রদ্ধেয় মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ তাঁকে ভুল তথ্য সংশোধনের অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও (নজরুল স্মৃতি, পৃঃ ২৫০), 'কল্লোল যুগ'-এর ৫ম সংস্করণে যথারীতি একই বক্তব্য রেখেছেন। তিনি ও তাঁর সমধর্মী ডঃ রমা চৌধুরী ও কাজি আবদুল ওদুদ প্রমুখ রক্ষণশীল ভাববাদী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবিরা অধ্যাত্মলোকে যাওয়ার সিঁড়ি পেতে পারেন, কিন্তু নজরুল সম্পর্কে বিকৃত তথ্য প্রচারের, তাঁর স্ব-বিরোধিতা ও সাময়িক দুর্বলতাজনিত বিচ্যুতিকেই তাঁর সমগ্র সৃষ্টি ও জীবনকর্মের একমাত্র পরিচয় বলে ব্যাখ্যা করার কোন অধিকারই তাঁদের নেই। তাছাড়া জাতির মুক্তি-সংগ্রামে, সুস্থ ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশে যাঁদের কিছুমাত্র ইতিবাচক ভূমিকা নেই, নজরুলের মত মহান কবি-ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তাঁদের মনগড়া আত্মগত মূল্যায়ন আবর্জনার মতই পরিত্যজ্য। ১৯৩৮ সালেও, পূর্বোক্ত 'শিখা' পত্রিকায় 'শিখা' নামের কবিতায় লিখেছেন: "হায়রে ভারত, হায় যৌবন তাহার / দাসত্ব করিতেছে অতীত জরার / জরাগ্রস্ত বুদ্ধিজীবি বৃদ্ধ জরদ্গব / দেখায়ে গলিত মাংস চাকুরীর মোহ / যৌবনের টীকা পরা তরুণের দলে / আনিয়াছে একেবারে ভাগাড়ে শ্মশানে।" এটি তাঁর আত্মদর্শন অথবা নির্মম আত্ম-সমালোচনাও বটে। একই বছরে তাঁর প্রিয় কিষাণ ভাইদের ঝাঁকানি দিয়ে লিখেছেন: 'তোর ছাওয়াল কেন খাওয়ার বেলা হুন

লঙ্কা মাগে / তোর তরকারিতে সরকারী কোন্ ট্যাক্সো বুঝি বসে / তোর ইক্ষু এত মিষ্টি কি হয় চক্ষু জলের রসে?' (ওঠরে চাষী)। ১৯৪২ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী তাঁর দুরারোগ্য ব্যাধিতে বাকশক্তি রহিত হওয়ার আগে, কমিউনিস্ট-বিদ্বেষী ব্রিটিশ অনুচর চীনের চিয়াং কাইশেক দিল্লী ও কলকাতায় সফরে এসেছিলেন। এই উপলক্ষ্যে ব্রিটিশ গ্রামাফোন কোম্পানী সাম্রাজ্যবাদীদের দোসর মাননীয় অতিথির বন্দনামূলক একটি গান রচনার জন্য নজরুলকে অনুরোধ করেন; তিনি ব্যক্তি-প্রশস্তির ধারে কাছে না গিয়ে রচনা করলেন:

চীন ও ভারতে মিলেছি আবার মোরা শতকোটি লোক
চীন ভারতের জয় হোক! ঐক্যের জয় হোক! সাম্যের জয় হোক!"
ধরার অর্ধ নরনারী মোরা বহি এই দুই দেশে
কেন আমাদের এত দুর্ভোগ নিত্য দৈন্য ক্লেশে
সহিব না আর এই অবিচার খুলিয়াছে আজি চোখ
চীন ভারতের জয় হোক! ঐক্যের জয় হোক।
সাম্যের জয় হোক।
প্রাচীন চীনের প্রাচীর মহাভারতের হিমালয়
(আজ) এই কথা যেন কয়
মোরা সভ্যতা শিখায়েছি পৃথিবীরে
ইহা কি সত্য নয়?
হইব সর্বজয়ী আমরাই সর্বহারার দল
সুন্দর হবে শান্তি লভিবে নিপীড়িতা ধরাতল
আমরা আনিব অভেদ ধর্ম নব বেদগাথা শ্লোক
চীন ভারতের জয় হোক! ঐক্যের জয় হোক!
সাম্যের জয় হোক।

কোন্ পটভূমিকায় নজরুল এই গান রচনা করলেন? ব্রিটিশ কোম্পানীর উদ্দেশ্য বুঝে, তাদের মনোমত চিয়াং-প্রশস্তি করলেন না, অথবা সেই সময়ে (১৯৪১-এর ২২শে জুন থেকে হিটলার সোভিয়েত দেশ ও সমরবাদী জাপান চীন-ভারত আক্রমণ চালাচ্ছে) সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের জাপান বিরোধী ভূমিকার মহিমা-কীর্তনও করলেন না, একেবারে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের গভীরতম তল থেকে **সর্বহারার মানবতা ও কমিউনিজমের বিজয়গাথা** রচনা করলেন। শ্রীজগন্ময় মিত্রের সুরে ও কণ্ঠে গ্রামাফোন কোম্পানী এই গান রেকর্ড করেছিল। কিন্তু নষ্ট করল কারা? ১৯৪৫ সালে স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত লালফৌজের জয়লাভের পর ব্রিটিশ সরকারই? না ১৯৪৯ সালে চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর, স্বাধীন ভারতের আতঙ্কিত কংগ্রেস সরকার?

‘কবি সুকান্ত ঃ সমকালের অগ্নিশলাকা’

সন্ত্রাসবাদী ও জাতীয়তাবাদী রাজনীতির গতিমুখে, রুশ বিপ্লবের সংবাদ ও কম্যুনিস্ট পার্টি গড়ার আঁতুর ঘর থেকে শ্রমিক-কৃষকদের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে কল্‌জের জোর আসছিল বিশের দশকে প্রথম দু-তিন বছরে; আর ১৯২৫-২৭ সালের মধ্যে জাতীয় রাজনীতির চাল-চলন অনেকটা বদলে গেল। সাম্রাজ্যবাদী সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে বোম্বাই, কানপুর, নাগপুর ও বিহার-অঞ্চলে শ্রমিক-শ্রেণীর অপেক্ষাকৃত বেশী সচেতন ও সংগঠিত বিক্ষোভ আন্দোলনের সময়ে, কানপুর ষড়যন্ত্র মামলার পর্বে, একদিকে মস্কো প্রেরিত ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট জর্জ অ্যালিসন ওরফে ডোনাল্ড ক্যামবেল (১৯২৫), লণ্ডনের লেবর রিসার্চ ইনস্টি-টিউটের প্রতিনিধি ও ব্রিটিশ কমিউনিস্ট ফিলিপ স্প্রার্ট (১৯২৬) ও বেঞ্জামিন ফ্রান্সিস ব্রাডলি (১৯২৭), অস্ট্রেলিয়ার কমিউনিস্ট রেয়ান (১৯২৮) এবং মার্কিন কমিউনিস্ট জনস্টোন প্রমুখ বিদেশী বন্ধুদের সাংগঠনিক নেতৃত্বে, অপরদিকে শ্রদ্ধেয় মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, আবদুল হালিম, শওকত ওসমানী প্রমুখ দেশীয় কমিউনিস্ট-দের নেতৃত্বে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে ও শ্রমিক-কৃষক পার্টির কর্মধারা যে আরও শক্তি অর্জন করেছিল তার প্রমাণ: ১৯৩০ সালে প্রকাশিত **Draft Platform of Action of the CP of India** এবং মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার ঐতিহাসিক আদালত-মঞ্চ, যেখানে দাঁড়িয়ে মহান দেশপ্রেমিক মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ প্রমুখ কমিউ-নিস্ট নেতাদের ভারতীয় রাজনীতিতে শ্রেণী-সংগ্রাম ও পূর্ণ স্বাধীনতার বলিষ্ঠ ঘোষণা রেখেছেন।

এই সময়ে জাতীয় রাজনীতির গুণগত পরিবর্তন সম্পর্কে আলোকপাত করে মীরাট মামলার অন্যতম ‘আসামী’ বেঞ্জামিন ব্রাডলি তাঁর আত্মকথায় বলেছেন, মীরাটের যে জেলে রাখা হয়েছিল সেখানে ১৯৩০ সালের কংগ্রেসী আইন অমান্যকারী বহু কৃষক, দোকানদার ও ছোট ব্যবসায়ীরাও কয়েদ হয়েছিল। তারা প্রথমে ‘গান্ধী মহারাজ কী জ্যায়’ শ্লোগান দিয়েছিল, শেষে কমিউনিস্টদের কথায় ও শিক্ষায় ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’, ‘শ্রমিক-কৃষক ঐক্য ও সংগ্রাম দীর্ঘজীবী হোক’—এই শ্লোগানে সমৃদ্ধ ও উন্নত হয়েছিল। মীরাট বন্দীদের সপক্ষে ব্রিটেনের

শ্রমিক সংগঠনগুলি অর্থ ছাড়াও পাঠিয়েছে বিরাট লাইব্রেরী, যাতে অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে মার্কস–এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিন-এর প্রচুর বই এসেছে। এগুলি কমিউনিস্ট আসামীদের আত্মপক্ষ সমর্থনের বলিষ্ঠ ভূমিকা অর্জনে মূল্যবান হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছে। এই মামলায় কেবলই যে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া শাসকদের কুতসিৎ ও বর্বর চেহারা খুলে গেছে, আন্তর্জাতিক শ্রমিক-শ্রেণীর সংহতি প্রতিফলিত হয়েছে তা নয়, ভারতীয় রাজনীতি ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে মোড় ঘুরেছে মানেই **বিজ্ঞানসম্মত বৈপ্লবিক চরিত্রের** পদপাত ঘটেছে।

সারা ইউরোপে ও এশীয়ায় তখন, ত্রিশের দশকে ইতালি, জার্মানি, স্পেনীয় ও জাপানী ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলির পৈশাচিক দাপাদাপি সুরু হয়ে গেছে এবং ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তাদের সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বাসঘাতকতার চক্রান্ত জালে বিষাক্ত করে তুলেছে মানবসভ্যতার মর্মমূল; এই আগ্রাসী শক্তিগুলির ঔপনিবেশিক স্বার্থ–সংঘাতের অনিবার্য ফল হিসাবেই সুরু হয়েছে আরও একটি বিশ্বযুদ্ধ।

গতি ও চরিত্রের দুই বাঁকে, ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হতে, জাতীয় কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টি দুই রকম দৃষ্টিভঙ্গী ও ভূমিকা নিয়েছিল। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা ও চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনা থেকে, একদিকে ব্রিটিশ শাসনের বর্বর অত্যাচার ব্যাপকভাবে নেমে এসেছিল, অপরদিকে বিশ্ব-ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে, জাতীয় স্বাধীনতার প্রশ্নে সারা বিশ্বের বিবেকী জনমত, কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রমিক-কৃষকদের আন্দোলন তীব্রতর হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে জাতীয় কংগ্রেসের আপোষকামী ও তথাকথিত 'বামপন্থী' নেতৃত্ব বললেন: আমাদের জাতীয় সরকার দিলে আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে এ যুদ্ধে সাহায্য করতে প্রস্তুত। এই প্রস্তাব যথারীতি অগ্রাহ্য করলে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে গান্ধী প্রমুখ সংস্কারবাদীরা ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ করে আন্দোলনের ভাবটা বজায় রাখলেন; অথচ যুদ্ধ সুরুর পরের মাসেই 'বেআইনী' কমিউনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরো ঘোষণা করেছিল—ভারতকে পূর্ণ স্বাধীন করতে সাম্রাজ্যবাদীদের সংকটকে ব্যবহার করা ও জনগণকে প্রতিরোধ সংগ্রামে সংগঠিত করা আশু কর্তব্য। এরই ঠিক পরের মাসে, অর্থাৎ নভেম্বরে 'কমিউনিস্ট' পত্রিকায় পি. সি. যোশী লেখেন: "জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যুদ্ধ সংকটের বৈপ্লবিক ব্যবহারই নতুন যুগে জাতীয় শক্তি সমূহের প্রধান কাজ।" অতঃপর ১৯৪০ সালের ২রা অক্টোবর (গান্ধীর জন্মদিনে) দেশের ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও বামপন্থী রাজনৈতিক

শক্তিগুলি এক হয়ে বোম্বাইয়ের প্রায় একলক্ষ পঁচাত্তর হাজার শ্রমিকের যুদ্ধ-বিরোধী যে ধর্মঘট সংগঠিত করে, তা ছিল সারা বিশ্বের **শ্রমিকশ্রেণীর সাম্রাজ্য-বাদী যুদ্ধবিরোধী প্রথম রাজনৈতিক ধর্মঘট**। বস্তুত ব্রিটিশ সরকার বুঝেছিল, তাদের যুদ্ধকালীন বিপদটা জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্বের দিকে নেই; তা অনিবার্যভাবেই আসছে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী বামপন্থী জঙ্গী নেতৃত্বের দিক থেকে। তাই ১৯৪১ সালে, 'পয়লা মে'র ঐতিহাসিক গণ-জমায়েতের পর শ্রমিক-যুবক সহ প্রায় ২০,০০০ হাজার বামপন্থী স্বাধীনতা সংগ্রামীকে 'ভারত প্রতিরক্ষা' ও অন্যান্য 'আইন-শৃঙ্খলা'-মূলক আইনে গ্রেপ্তার ক'রে, তাঁদের জন্য রাজস্থানের দেউলী ও বাংলার হিজলীতে কুখ্যাত বন্দীশিবির নির্মাণ করে। এই সময়ে, মালাবার, পাঞ্জাব ও অন্ধ্র ছাড়াও, একমাত্র উত্তর-প্রদেশের কৃষক সভার ডাকে যে বিক্ষোভ আন্দোলন (যুদ্ধ ও মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে) সংগঠিত হয়েছিল তাতে প্রায় ছয় হাজার সভা-সমাবেশে তিন লক্ষ কৃষক অংশ নিয়েছিলেন।

অতঃপর, ১৯৪১ সালের ২২ জুন ফ্যাসিস্ট হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানির আগ্রাসী শক্তি সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া আক্রমণ করলে, **জনযুদ্ধে রূপান্তরিত** হল। একই বছরের ৩রা জুলাই মহান কমিউনিস্ট নেতা যোশেফ স্তালিন এক বেতার ভাষণে, এই যুদ্ধকে বিশ্বমানবের জনযুদ্ধ বা মুক্তি সংগ্রাম আখ্যা দিয়ে গণতান্ত্রিক প্রতিরোধ সংগ্রামকে আরও জোরদার করার আহ্বান জানান। ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারীতে 'ফরওয়ার্ড টু ফ্রিডম' দলিলে যোশী বলেছেন: "২২শে জুন (১৯৪১) হিটলার ফ্যাসিজিমের কবর নিজেই রচনা করিয়াছিল। আমরা যে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদকে জানি সেই শক্তিরও কবর সঙ্গে সঙ্গে খোঁড়া হইয়াছিল। অগ্রসরমান নাৎসি পালের বিরুদ্ধে লাল ফৌজের প্রথম গোলা বর্ষণেই নতুন যুগের—জনগণের মুক্তি-সংগ্রামের নয়া পর্বের সূচনা হইয়াছিল।" একই সময়ে কংগ্রেসের বারদৌলি অধিবেশনে 'জাতীয় সরকারের পরিচালনাতেই কেবল ফ্যাসিস্ট আগ্রাসন প্রতিরোধ সম্ভব' বলে প্রস্তাব নেওয়া হলে গান্ধীজী তাঁর অহিংসার মুখ চেয়ে আপত্তি করেন। কমিউনিস্টরা তখন জাতীয় সরকারের দাবী ও আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গোটা জাতির প্রতিরোধ সংগ্রামের প্রশ্নকে সামনে রেখে 'ইউনাইটেড ন্যাশনাল ফ্রণ্ট'-এর প্রস্তাব রাখেন। অপরপক্ষে ব্রিটিশ সরকার 'আটলাণ্টিক চার্টার' নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এবং 'ক্রিপ্‌স মিশন' পাঠিয়ে জাতীয় ক্ষেত্রে প্রতারণামূলক রাজনৈতিক চক্রান্তে

-লিপ্ত হলে, ফুটন্ত জলের মত ভারতের জনগণ তখন গান্ধী প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃত্বকে বাধ্য করে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দিতে। এই সময়ে দেশের মধ্যে এমন শক্তিও দানা বেঁধেছিল যারা ফ্যাসিস্ট জাপানকে স্বাগত জানাতে ও তাদের দিয়ে ব্রিটিশ তাড়াতে চেয়েছিল। স্বভাবতই এইসব উগ্র-জাতীয়তাবাদী শক্তি দেশের গণতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট শক্তিগুলির ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠেছিল। এ কথা অস্বীকার করা ঠিক হবে না, একদিকে ঔপনিবেশিক পরাধীনতা (যা ইউরোপের স্বাধীন দেশগুলির সমস্যা ছিল না), অপরদিকে বিশ্ব-ফ্যাসিস্ট শক্তির আক্রমণ; একদিকে উগ্র-জাতীয়তাবাদ ফ্যাসিস্ট শক্তির দোসর হয়ে পড়ছে, অপরদিকে একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার ও বিশ্ব-ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই—এই জটিল আবর্তে কমিউনিস্ট পার্টির ভিতরে ও বাইরে সামলানো খুবই কঠিন ছিল।

একই এশীয় ভূখণ্ডে চীনের বিপ্লব অনেকটা এগিয়ে গেছে; এমন কি দক্ষিণ-পূর্বের ভিয়েতনামী ওয়ার্কার্স, (কমিউনিস্ট) পার্টি, গায়ের রঙ্ যাই হোক না কেন, সাম্রাজ্যবাদী ফরাসী ও সমরবাদী জাপানী আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে সামগ্রিকভাবে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতে যেমন জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ কিছুটাও হয়েছিল, ভিয়েতনামে তেমনটা হয়নি। সেখানে তাই একদিকে বিশ্বাসঘাতক জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করে (আমূল ভূমি-সংস্কারের লক্ষ্য সামনে রেখে) ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করার ডাক দেওয়া হয়েছিল, গ্রামীন গেরিলাদের অভ্যুত্থানগুলিকে নেতৃত্ব ও প্রসারিত করা হয়েছে, অপরদিকে কিছু জাতীয় বুর্জোয়া অংশ গণতান্ত্রিক দল (১৯৩৩) গঠন করেছে (যারা কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক কর্মসূচীতে আগ্রহী হয়েছিল) এবং ভিয়েতমিনের কাছাকাছি আসা জাতীয় স্তরে 'সাংস্কৃতিক সমিতি' (১৯৪২-৪৩) গঠিত হয়েছে। এই সময়ের দুটি ঘটনা, একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় সংগ্রামকে দারুণ উদ্দীপিত করেছে: চীনের চিয়াং-এর দালালদের দ্বারা কারারুদ্ধ হো-চি-মিন-এর 'জেলখানার ডায়েরী' (কবিতা-সংকলন) প্রকাশ ও ১৯৩৯-৪২ সালে কারারুদ্ধ তরুণ ভিয়েতনামী কবির 'সেদিন থেকে বিরামহীন' কবিতায় বলিষ্ঠ জীবনমুখী উচ্চারণ—"সেদিন থেকে বিরামহীন' গ্রীষ্মের উজ্জ্বল আলো / আমার মধ্যে জ্বলে এসেছে, এবং / সত্যের সূর্য আমার

হৃদয়কে আলোকিত করেছে।" এইভাবে ১৯৪২-৪৪ সালে যে বিপ্লবী রোমান্টিকতার জন্ম হয়েছে, তার গর্ভ সঞ্চারিত হয়েছিল, তিরিশের দশকে মধ্যযুগীয় বিশ্বাস ও মানবিক মূল্যবোধের সংঘাতে জীবনমুখী 'ব্যক্তিসত্তা'র জাগরণে এবং ক্রমে তা পিতৃভূমির প্রতি ভালবাসায়, গণতান্ত্রিক ও জাতীয় মুক্তির প্রতি মূল্যবোধে রূপান্তরিত হয়ে। আমাদের দেশে এই সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিবাদী যুদ্ধ পরিস্থিতি রাজনীতির ক্ষেত্রেও যেমন, সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তেমনি অভূতপূর্ব সংকট ও জটিলতা সৃষ্টি করেছিল সত্য, তবু তিরিশের দশকেই এর পশ্চাৎপট সাহিত্য-সংস্কৃতির ভাববাদী, কল্লোল-কলিকলম-এর প্রকৃতিবাদী বুর্জোয়া বাস্তবতার ধারা ও 'এলাইটিস্ট' প্রবণতা ছিন্ন করে ১৯৩৬-৩৭ সালে 'Towards Progressive Literature' ও 'প্রগতি' সাহিত্য-সংকলন প্রকাশিত হয়েছে, রলাঁর আহ্বানে অনুষ্ঠিত ব্রাসেল্‌স শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি সম্মেলনে প্রগতি লেখক সঙ্ঘের প্রেরিত ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে—'...ফ্যাসিস্ত স্বৈরতন্ত্র আজ মাখনের বদলে কামান তৈরীতে মগ্ন। তারা সংস্কৃতির বিকাশের বদলে উত্তেজিত করছে সাম্রাজ্য গ্রাসের লালসা, প্রকাশ করছে নিজের হিংস্র সামরিক চেহারা। ইতালী যেভাবে আবিসিনিয়াকে পদানত করল, তা সভ্যতা ও মানবতার উপাসক সকল মানুষকেই স্তম্ভিত করেছে।' রবীন্দ্রনাথ 'প্রশ্ন' (১৯৩১) এবং 'আফ্রিকা' (১৯৩৬) ও 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯৩৭) রচনার সঙ্গে ঘোষণা রাখলেন: 'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস শান্তির ললিত বাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস / বিদায় নেবার আগে তাই—ডাক দিয়ে যাই / দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে / প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে' (প্রান্তিক, ১৯৩৭)। এই সময়ে শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন নিউ ইয়র্কের রিজ কার্লটন হোটেলে 'যুদ্ধ ও শান্তির সমস্যা' বিষয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় নিষ্ক্রিয় শান্তিবাদীদের কটাক্ষ করে বলেন: 'Pacifist speakers coming to a meeting like this frequently become like sheeps talking to other sheeps. The wolves are always outside the door.' তাঁর এই বক্তৃতাটি 'নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন'-এর ১৯৩০, ১৫ই ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই সময়ে লেখা তাঁর 'সমাজ ও ব্যক্তিত্ব' নিবন্ধটি ফ্যাসিবাদের অন্ধ অরণ্য থেকে বিচ্ছুরিত বিবেকী চিন্তার একটি মূল্যবান ফসল।

জার্মানির ফ্যাসিস্ট জঙ্গলের রাজত্বে (১৯৩৩-৪৫) কিভাবে মানুষের প্রতিভা, মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব আক্রান্ত হয়েছিল তার বর্ণনা দিয়ে ঐ নিবন্ধে তিনি বলেছেন

"....বিশেষ করে শিল্পের ক্ষেত্রে মহান স্রষ্টার অভাব খুবই মর্মান্তিক। চিত্র ও সঙ্গীত অধঃপতনে নিমজ্জিত। এ সবের কোন জনপ্রিয় আবেদনই নেই। রাজনীতিতে প্রকৃত নেতৃত্বের অভাব দেখা দিয়েছে এবং নাগরিক স্বাধীনতা ও বিচারবোধ মারাত্মকভাবে অবনমিত হয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের স্থানে বিভিন্ন দেশে ফ্যাসিস্ট একনায়কতন্ত্র মাথা চাড়া দিয়েছে। মানুষের চেতনা ও অধিকারবোধ এমনই অসাড় ও দুর্বল হয়ে পড়েছে যাতে ফ্যাসিজিমও সহনীয় হচ্ছে....কিন্তু আমি বিশ্বাস করি উন্নততর সময় আসবেই।" এই সময়ে ইতালির দুই বিজ্ঞানীর কাছ থেকে বিবেকের যন্ত্রণাভরা চিঠি পেয়ে ফ্যাসিস্ট মুসোলিনীর অনুগত শিক্ষামন্ত্রী রকোকে এক পত্রে আইনস্টাইন জানান, এটা শুধু মানবিক অনুভূতির চাপ ও ক্ষয় সৃষ্টির সমস্যা নয়, মানবসংস্কৃতির ঐতিহ্যগত সংকট।

আমাদের দেশে ১৯৩৭ সালে তখন 'মডার্ণ রিভিউ'তে প্রকাশিত হয়েছে মনীষী রঁমা রলাঁর সেই ঐতিহাসিক ফ্যাসিবিরোধী আবেদন, যাতে সাড়া দিয়ে এখানে গড়ে উঠেছে 'লীগ এগেনস্ট ফ্যাসিজিম এ্যাণ্ড ওয়ার'-এর সর্বভারতীয় কমিটি, যার সভাপতি হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই সময়কার সাহিত্য-সংস্কৃতির আন্দোলনে অগ্রগামী সংস্থা 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘের' উদ্যোগে প্রকাশিত 'প্রগতি' সংকলন (১৯৩৯) বইখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এতে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বিজলাল চট্টোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী প্রমুখ সাহিত্য-সমালোচকগণের সাহিত্যে বাস্তবতার রূপ ও মাত্রা এবং সমাজচেতনা বিষয়ে একাধিক প্রবন্ধ, ক্রিস্টোফার কডওয়েল, ফর্স্টার ও মার্কস-এর রচনার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। পরের বছর ঢাকায় ডঃ শহীদুল্লাহ ও তরুণ কমিউনিস্ট লেখক সোমেন চন্দের উদ্যোগে বেরিয়েছে 'ক্রান্তি', যাতে রণেশ দাসগুপ্ত, সোমেন চন্দ, অচ্যুৎ গোস্বামী ও কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ প্রগতিশীলরা লিখেছিলেন। এই সব ঘটনার শক্তি ও গুরুত্ব তখনই প্রমাণিত হয়, যখন দেখা যায়, বিশের দশকে শশাঙ্কমোহন সেন প্রমুখ রক্ষণশীলদের মত, তিরিশের দশকে মোহিতলাল-সজনীকান্তরা সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থবাহী 'স্টেটস্‌ম্যান'-এর সুরে সাহিত্য-সংস্কৃতিতে এই প্রগতি ধারাকে 'কম্যুনিস্ট প্রোপাগাণ্ডা' বলে, 'প্রগতি নামক একটি অনার্য শব্দকে' বিরাট বাঁশে বেঁধে 'রস-অধিকার-বঞ্চিত হরিজনেরা দারুণ চিৎকার শুরু করেছে,—এই ধরণের মন্তব্য করেছেন এবং অবশ্যই সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের মত প্রগতিশীল সাংবাদিকগণ এইসব কুৎসার সমুচিত জবাব দিতে কলম ধরেছেন।

এর আগে ১৯৩৩ সালের ১০ই মে বার্লিনের রাজপথে ফ্যাসিস্ট হিটলারের খুনে বাহিনীদের হাতে দেশ-বিদেশের জীবনমুখী প্রগতিশীল পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থের বহ্ন্যুৎসব হয়েছে। ফ্যাসিস্ট অভ্যুত্থানের প্রতিরোধে ১৯৩৫ সালের ২১শে জুন প্যারিসে আন্তর্জাতিক লেখক-শিল্পীদের প্রথম সম্মেলনে রলাঁ, গোর্কি, অঁরি বারবুস, জন স্ট্রাচি, আঁদ্রে জিদ, ফর্স্টার, আঁদ্রে মালরো প্রমুখ অগ্রণী কলম-সৈনিকগণ সংগ্রামের শপথ নিয়েছেন, এবং এই বছরই, ফ্যাসিস্ট মুসোলিনীর ইথিওপিয়া আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে কম্যুনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের সপ্তম অধিবেশনে জর্জি ডিমিট্রভের ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ঐতিহাসিক 'যুক্তফ্রণ্ট থিসিস' প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের দেশে, যথা সময়েই ১৯৩৬ সালের এপ্রিল-এ লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে জহরলাল নেহেরু বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা ও ফ্যাসিস্ট বর্বরতার মুখে আন্তর্জাতিকতা-বাদের পরিচয় দিয়েছেন এবং ঐ শহরেই প্রখ্যাত সাহিত্যিক মুন্সি প্রেমচন্দের সভাপতিত্বে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘ'-এর প্রথম সম্মেলন হয়েছে। **বিশ্ব-ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে** এই নবজাগরণের স্রোতে এই বছরের ১১ই জুলাই কলকাতার এ্যালবার্ট হলে 'গোর্কি স্মরণ দিবস'-এ (মৃত্যু ১৮ই জুন) বাংলাদেশে যখন 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘ', গড়ে উঠেছে, তার সাত দিন পরেই, ১৮ই জুলাই স্পেনে ফ্যাসিস্ট ফ্রাঙ্কোর অভ্যুত্থান হয়েছে।

স্পেনের গণতন্ত্রের উপর, ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে ফ্যাসিস্ট হিটলার ও মুসোলিনীর জোট বাঁধায় উৎসাহিত হয়ে ইউরোপের সমস্ত দেশের বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়ার-চক্র যখন নিজ নিজ দেশে মাথা চাড়া দিয়েছে, সেই সময়ে কিউবা, চেকশ্লোভাকিয়া, ফিনল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্মানি, হাঙ্গেরি, নরওয়ে, সুইডেন, আয়ার্ল্যাণ্ড, ইতালি, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, গণতান্ত্রিক যুবসমাজ ও বিবেকী লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবী স্পেনে ফ্যাসিস্ট আগ্রাসনকে প্রতীকি অর্থে নিয়ে 'আন্ত-র্জাতিক ব্রিগেড'-এ যোগ দেন। স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান ডলোরেস আইবারুরী এই মহান ঐতিহাসিক ঘটনাকে প্রকাশ করেছেন এই বলে : "তাঁরা প্রেম, দেশ, গৃহ, ভাগ্য, মা, স্ত্রী, সন্তান ও ভাইবোন ছেড়ে আমাদের কাছে এসে বলেছেন—'আমরা এলাম! তোমাদের বিপদ, স্পেনের বিপদ আমাদেরও বিপন্ন করেছে। এটা হল সারা বিশ্বের অগ্রগামী ও প্রগতিশীল মানুষের সাধারণ সংকট।" এই আন্তর্জাতিক ব্রিগেডে র‍্যাল্‌ফ ফক্স, আঁদ্রে মালরো, লুই আরাগঁ, পল রবসন, পল এলুয়ার, ল্যাংস্টন হিউজ, ক্রিস্টোফার কডওয়েল প্রমুখ শত শত প্রখ্যাত লেখক-শিল্পী অংশ নিয়ে বিশ্ব-ফ্যাসিবাদের বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে মহান বিপ্লবী

যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। এই যুদ্ধে কমরেড মলোটভ ও কমরেড স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত লাল ফৌজের গৌরবময় ভূমিকায় আতঙ্কিত ও মূলতঃ কমিউনিস্ট বিদ্বেষী ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ফ্রান্সকে দোসর পেয়ে বিভেদাত্মক-চেক-সুদেতেন প্রশ্নে ফ্যাসিস্ট হিটলারকে গোপনে সমর্থন করে চক্রান্তমূলক 'মিউনিখ চুক্তি' সম্পাদন করে এই আশায় যে, ফ্যাসিস্ট-চক্র স্পেনের খেলা শেষ করে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করবে। ব্রিটেনের লেবার পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বও আদৌ চাইতে পারেনি, যুদ্ধ ও ফ্যাসিস্ট-বিরোধী শ্রমিক আন্দোলন শক্তি ও সংহতি অর্জন করুক; স্বভাবতই ব্রিটেন-ফ্রান্সের শাসকগোষ্ঠী শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনী পার্টির উপর দমন-পীড়ন তীব্রতর করেছে।

আমাদের দেশে তখন ১৯৩৫ সালের 'ভারত-শাসন আইন'-এর বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ-অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। ১৯৩৬ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসে জাতীয় নেতৃত্ব 'গান্ধীপন্থী' ও 'সুভাষপন্থী'—এই ভাগে ভাঙল এবং একপক্ষ বিশ্বযুদ্ধের চরম পর্বে, অর্থাৎ বিশ্বফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জনযুদ্ধের পর্বে শ্লোগান তুললো— 'ভারত ছাড়ো', আর অপরপক্ষ গড়লো 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ'। লক্ষ্য করা গেছে, মীরাট মামলা ও ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর, বিশেষ করে জার্মান, ইতালি ও স্পেনের ফ্যাসিস্ট আগ্রাসনের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর ও বিবেকী জনমতের আন্দোলন গড়ে তোলার মুখে ব্রিটিশ সরকার কমিউনিস্ট পার্টি ও তার সমস্ত প্রচার মাধ্যমগুলিকে বে-আইনী ঘোষণা করে। এই পর্বে তাই প্রধানতঃ ছাত্র ফেডারেশন, ফ্যাসি-বিরোধী লেখক-শিল্পী সঙ্ঘ ও পরে সোভিয়েত সুহৃৎ সঙ্ঘের উদ্যোগে গণতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালিত ও উৎসাহিত হয়েছে। বোঝা যায়, ৪১-এর ২২শে জুন ফ্যাসিস্ট জার্মান সোভিয়েত দেশ আক্রমণ করলে গান্ধী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, কৃপালনী ও রাজা গোপালাচারী প্রমুখ কংগ্রেস নেতারা যে এই ঘটনার আন্তর্জাতিক তাৎপর্য সম্পর্কে অসাড় ও উদাসীন থেকেছেন, তার শিকড় রয়ে গেছে তাঁদের উগ্র-জাতীয়তাবাদী চরিত্রে ও ত্রিপুরী কংগ্রেসে এবং এটাও বুঝতে অসুবিধা হয় না, কেন ডঃ সীতারামাইয়া তাঁর 'কংগ্রেসের ইতিহাস' গ্রন্থে এই সময়কার কমিউনিস্টদের ভূমিকা সম্পর্কে তির্যক, তিক্ত ও সঙ্কীর্ণ মনোভাবের পরিচয় রেখেছেন। অপরদিকে এই বছরের ২৯শে জুনের আনন্দবাজার পত্রিকায় 'নিখিল

ভারত কিষাণ সভা'র অস্থায়ী সম্পাদক গোপাল হালদারের বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে—"সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বলিয়াই আমরা ফ্যাসিস্ট বিরোধী; সুতরাং ফ্যাসিস্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ এতদুভয়ের মধ্যে কোনটিরই প্রভাব বৃদ্ধিতে আমরা উদাসীন থাকিতে পারি না। মহাযুদ্ধের গতি সম্প্রতি যেভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে তাহাতে আমাদের নীতি ও কর্মসূচী পুনরায় ঘোষণা করার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে।.... আমরা জানি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র হইতেছে শ্রমিক ও কৃষকদের রাষ্ট্র। ইহা সমাজতন্ত্রীদের দেশ। অত্যাচারিত জাতিগুলির উদ্ধার সাধনই হইবে কার্য। আন্তর্জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদের আশ্রয় হিসাবে ইহাই হইতেছে শান্তি ও প্রগতির কেন্দ্রস্থল। সোভিয়েতকে রক্ষা করা, শ্রমিক ও কৃষকদের পক্ষে আত্মরক্ষারই তুল্য। যাঁহারা সামাজিক প্রগতি এবং বিজ্ঞানে আস্থাবান, তাঁহারাই এই কথা বলিবেন .... যুদ্ধের ঐতিহাসিক অধ্যায় সুরু হইয়াছে। এই সময় আন্তর্জাতিক শ্রমিক ও কৃষকের ন্যায় আমাদেরও পরিবর্তিত অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে।" এর পরই 'নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস'-এর পক্ষে এম. এন. রায় এবং 'লেবার পার্টি'র পক্ষে নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার 'এই যুদ্ধকে জনযুদ্ধে পরিণত কর'— এই মর্মে বিবৃতি প্রকাশ করেন। স্বভাবতই এই ভয়ংকর ও যুগান্তকারী ঘটনা বাংলার শিল্প-সংস্কৃতির জগতকেও একই সঙ্গে উদ্বিগ্ন ও আন্দোলিত করেছিল। কমিউনিস্ট ও বামপন্থী প্রগতিশীল গণ-সংগঠনগুলির সঙ্গে বহু শিক্ষাবিদ ও বিবেকী লেখক বুদ্ধিজীবীও সারা দেশে 'সোভিয়েত দিবস' পালনে এগিয়ে আসেন এবং ২০শে জুলাই আনন্দবাজার পত্রিকায় ".... সোভিয়েত ইউনিয়নের জনসাধারণ এক নতুন সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছে। সেই সভ্যতা যখন বিপদাপন্ন, তখন আমরা বহু যুগব্যাপী অন্নাভাবে জীর্ণ, হীনতায় নিমজ্জিত ভারতবাসীরা নিরুদ্বিগ্ন থাকিতে পারি না। সোভিয়েত ইউনিয়ন যেদিন তাহার বিরোধী শক্তিচক্রকে পরাভূত করিয়া আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে সেই দিনের জন্য আমরা অপেক্ষা করিয়া থাকিব,"— এই বিবৃতি প্রকাশের পরদিন ২১শে জুলাই 'টাউন হল'-এর সভায় ' Friends of the Soviet Union' বা 'সোভিয়েত সুহৃৎ সঙ্ঘ' গঠিত হয় এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অসুস্থতা সত্ত্বেও এই কমিটির পৃষ্ঠপোষক হিসাবে কাজ করতে সম্মত হন। তালিকা দীর্ঘ হলেও, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক বিবেকের সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে লেখক-শিল্পীদের 'ব্যাপক গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট'-এর ভূমিকা কত প্রয়োজনীয়, আবার এক স্তরের আন্দোলনে সাড়া দিয়েও, পরবর্তী স্তরে শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রাম তীব্রতর হলে পেটি-বুর্জোয়া দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার

কারণে কত মানুষ সরে যায় বোঝার জন্য, প্রখ্যাত কয়েকজনের নাম উল্লেখ করলাম—সর্বশ্রী প্রমথ চৌধুরী, অতুল গুপ্ত, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বঙ্কিম মুখার্জ্জী, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, যামিনী রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মানিক বন্দোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্ত্তী, বিষ্ণু দে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরণ সান্ন্যাল, নীরেন রায়, গোপাল হালদার, আবু সৈয়দ আয়ুব, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, স্নেহাংসু আচার্য, জ্যোতি বসু, ভবতোষ দত্ত, বঙ্কিম সেন, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রশান্ত বসু, অমল হোম, কালিদাস নাগ, হুমায়ুন কবির, নীহার রঞ্জন রায়, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, হীরেণ মুখার্জী, ধীরেন সেন প্রমুখ।

উল্লেখযোগ্য, 'জনযুদ্ধ' পর্বের আগে তো বটেই, এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সূচনার আগে, ১৯৩৯ সালের জানুয়ারীতে প্রকাশিত, কমিউনিস্ট পার্টির লাইনে পরিচালিত মার্কসবাদী চিন্তা দর্শনের পত্রিকা, 'অগ্রণী'তে স্পষ্ট ভাবেই ঘোষিত হয়েছিল—"সামাজ্যবাদ বিরোধিতার সঙ্গে ফ্যাসিস্ট বিরোধিতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।" এতেই প্রকাশিত হয়েছে, আব্দুল হালিম, সোমনাথ লাহিড়ী, পি. সি. যোশী. সরোজ মুখার্জ্জী, সুধাংশু দাশগুপ্ত, জি. অধিকারী, ডি. ডি. কোশাম্বী, সুরেন্দ্র গোস্বামী, মনোরঞ্জন রায়, সুধী প্রধান; সরোজ দত্ত, বিনয় ঘোষ, সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকদের সঙ্গে র‍্যাল্‌ফ ফক্স ও কডওয়েলের মত প্রখ্যাত মার্কসবাদী লেখকদের চিন্তামূলক প্রবন্ধ। এতেই বেরিয়েছিল সুবোধ ঘোষের 'ফসিল,' বিশ্ব বিশ্বাসের 'মজদুর'-এর মত গল্প; এই পত্রিকার মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়েছে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক' প্রতিভা, প্রকাশিত হয়েছে মনোরঞ্জন হাজরার 'নোঙরহীন নৌকা' এবং গোপাল হালদারের 'একদার' মত রাজনৈতিক উপন্যাস। উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৩৯-৪০ সালে কমিউনিস্ট আন্দোলন ও মার্কসীয় চিন্তাদর্শের প্রচার ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পর্বে সরকারী দমন-পীড়ন বাড়লে, সংস্কৃতিক্ষেত্রে পূর্বতন ব্যাপক গণতান্ত্রিক মোর্চায় ভাঙন ধরে; অবশ্য এই ফাঁক—ঢাকা, কুমিল্লা, শ্রীহট্ট, যশোর ও ফরিদপুরের 'প্রতিরোধ', 'নবযুগ', 'বলাকা' ও 'প্রগতি' প্রভৃতি প্রগতিশীল ও মার্কসীয় সাহিত্য সংস্কৃতি-বিষয়ক পত্র-পত্রিকা, ছাত্র ফেডারেশনের সাংস্কৃতিক কর্মসূচী এবং 'ইউথ কালচারাল ইনস্টিটিউট'-এর উদ্যোগে আলোচনা সভা, বিতর্কসভা, নাটকাভিনয়, পোস্টার ও চিত্র-প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে অনেকটা ভরেছিল। 'অগ্রণী' বন্ধ হলে বেরিয়েছিল প্রখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন্দ্র মজুমদারের 'অরনি', যাকে তখনকার প্রায়

সকল মার্কসবাদী লেখক বুদ্ধিজীবী সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী নানা লেখায় সমৃদ্ধ করেছেন এবং কর্মী সুকান্তের বিকাশ যেমন কমিউনিস্ট পার্টির মাধ্যমে ঘটেছে, তেমনি **কবি সুকান্তের বিপ্লবী প্রতিভা** 'অরণি'র পাতাতেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল; যদিও 'জনযুদ্ধ'-এর মত এটি কমিউনিস্ট পার্টির অফিসিয়াল পত্রিকা ছিল না, তবু সে সময়ে মার্কসীয় চিন্তাচেতনার প্রচারে 'অরণি'র গৌরবময় অবদানের কথা কমিউনিস্ট পার্টিও স্বীকার করেছে।

লক্ষ্য করা যায়, ত্রিশের দশকে কমিউনিস্ট পার্টি ও প্রগতিমুখী সাহিত্য-সংস্কৃতির আন্দোলন সারা বিশ্বে ফ্যাসিস্ট অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে, সভা-সমাবেশ ও বিবৃতি প্রচারে যে উদ্যোগ নিয়েছিল তাতে বিদ্রোহী কবি নজরুল ছিলেন অনুপস্থিত। মীরাট মামলার সূত্রে বন্ধু মুজফ্‌ফর আহমদ প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ, পুত্রশোক, স্ত্রীর দীর্ঘস্থায়ী অসুখ ইত্যাদি মানসিক ও আর্থিক বিপর্যয়ের কারণে নজরুল গ্রামাফোন কোম্পানী ও আধ্যাত্মিক যোগ-সাধনায় সরে গেলেও, বাস্তবের ঠোকায় এবং জাতীয় নেতাদের শ্রেণী-স্বার্থমুখী সুবিধাবাদী ঝোঁকের জবাব দিতে ভোলেননি। তাঁর 'ওঠরে চাষী', 'বিদ্রোহীর কৈফিয়ত' (১৯৩৮) এবং 'শিখা' (১৯৩৯) কবিতাগুলির লৌকিক প্রকাশভঙ্গী ও গণমুখী আবেদনে, একই সঙ্গে কল্লোলীয় লেখক বুদ্ধিজীবীদের তথাকথিত পাশ্চাত্য আধুনিকতার বিরুদ্ধে ও চরখাবাদী পশ্চাৎপদ ও সুবিধাবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে ঘৃণার মনোভাব এবং 'পূর্ণ স্বাধীনতা'র প্রশ্নে বিস্মৃতিতে আচ্ছন্ন মননশীল ও প্রগতি আন্দোলন সম্পর্কে যেন একটা ঠেস দেওয়ার মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। অবশ্য আমরা এটাও লক্ষ্য করেছি, ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে নজরুলকে আকর্ষণ করা বা তাঁর কাব্যের ঐতিহ্য তুলে ধরার কোন প্রয়াস তখন কমিউনিস্ট পার্টি ও প্রগতি লেখক-শিল্পী সঙ্ঘ করেনি; সম্ভবতঃ সেই পর্বে তাঁকে ডাকলে পাওয়া যাবে না, এই ভেবেই তাঁর সম্পর্কে উদাসীন থেকেছে, অথবা তাঁর কাব্যে তেমন 'বামপন্থী মননশীলতা' পাওয়া যায় না বলেই, তাঁর সঙ্গে তাঁর কাব্যকেও সরানো হয়েছিল। তবু প্রশ্ন থেকে যায়, 'শনিবারের চিঠি'র সজনীকান্তের মত রক্ষণশীল, বুদ্ধদেব বসুর মত বুর্জোয়া মননশীল সাহিত্যিকদের নিয়েও যদি **ব্যাপক গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট** গড়া সম্ভব হয়েছিল, তবে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে মহান ঐতিহ্য সৃষ্টিকারী কবির সাময়িক বিভ্রান্তি ও সীমাবদ্ধতাকেই বড় করে একেবারেই বর্জন করা হল কেন?

●

সুকান্তের জন্ম হয়েছিল ১৯২৬ সালে, পথের দাবী, লাঙল-গণবাণীর দামালো

সময়ে এবং প্রধানতঃ সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসীবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের অগ্রগামী শক্তির গর্ভ হতেই তার বিপ্লবী কবিসত্তার আবির্ভাব হয়েছিল। বিশের দশকে বিদ্রোহী নজরুল যে বিপুল যন্ত্রণা ও আবেগ থেকে উচ্চারণ করেছিলেন 'যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস / যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায় / তাদের সর্বনাশ', ১৯৪০ সালে রোগশয্যায় শায়িত কবি রবীন্দ্রের জীবনে শেষ বড়দিনের কাব্যে ('একদিন যারা মেরেছিল....') সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিস্ট ঘাতক শক্তির ভণ্ডামি ও বর্বরতার বিরুদ্ধে 'মানবপুত্র'কে যে সচেতন আন্তরিকতায় ডাক দিয়ে গেছেন, সাহিত্য-সংস্কৃতির সেই কঠিন ও মহান ঐতিহ্যের পথেই পরিণত প্রতিভার বিচ্ছুরণ হয়েছে, চল্লিশের দশকে সুকান্তের আবির্ভাবে; তাঁর মহান সৃষ্টিতে এই ঐতিহ্য বাংলা গীতি-কাব্যের পলায়নপর নেতিবাদী আত্মমগ্নতা বা অজকলাবাদী মননধর্মী আধুনিকতাও নয়, এ হল জনযুদ্ধের অগ্নিশলাকা। বিয়াল্লিশের শেষে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে, বিশ্বযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের কবি, সংশয়ে বিহ্বল জীবনদরদী কবি (পূর্বাভাস) অতি দ্রুত পট পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে ভেঙে ও নতুন চৈতন্যে প্রখর হয়ে, গোটা সমাজকেই বদলানোর বিপ্লবী কবি-ব্যক্তিত্বে উত্তরণ ঘটিয়েছিলেন।

সুকান্ত কোন 'অলৌকিক' প্রতিভা নন; পরাধীনতায় ও শ্রেণীশোষণে **বিক্ষুব্ধ ও প্রতিবাদী জনগণই** তাঁর সৃষ্টির উৎস ও বিকাশ। তিনি তাঁর কমিউনিস্ট কর্মীসত্তা, মার্কসীয় চিন্তাচেতনা ও সংবেদনশীল কবিপ্রাণতার জারকরসে আত্মস্থ অভিজ্ঞতাকে প্রত্যক্ষ, স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন রক্তের ভাষায়—কবিতার ভাষায়—জনগণের মধ্যে। তাঁর 'ছাড়পত্র' আদৌ গণ-বিক্ষোভের রিপোর্টাজ নয়, শ্রমজীবী মানুষের গণ-সংগ্রামের শাণিত হাতিয়ার—মুক্তিপথের উজ্জ্বল ধ্রুবতারা।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'মাটির কাছাকাছি'র কবি সুকান্তের, 'কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা অর্জন'-এর মাটি ছিল তখন যুদ্ধ, মন্বন্তর আর বিক্ষোভ আন্দোলনের মাটি, শোষণ-জর্জর মেহনতি জনগণের যন্ত্রণা ও প্রতিরোধ-সংগ্রামের মাটি; এই মাটির কর্মে তিনি কমিউনিস্ট, এই মাটির ভাষায় তিনি বিপ্লবী কবি। এই ভাষার টানেই স্পেনীয় ফ্যাসীবাদের বর্বর শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন লোরকা ও আলবার্তি, ইংলণ্ডের র‍্যাল্‌ফ ফক্স ও কডওয়েল এরই মহান আহ্বানে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন প্রতিরোধ যুদ্ধে, মার্কিণসহ বিশ্ব-ফ্যাসিবাদ ও শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ উচ্চারণে উদ্দীপ্ত হয়েছেন সংগামী গণশিল্পী পল রবসন—"Every

artist, every scientist must decide now where he stands; he has no alternative, There is no standing above this Conflict on Olympian hights, there are no impartial observers⋯the artist must elect to fight for freedon or for slavery, I have my choice not through blind faith or coercion, but through conciousness of my courage, I take my place with you, my beloved people of Spain" (Here I stand, p-60-61)

আমাদের দেশে তখন কল্লোল-কালি কলমের কিছু কবি-লেখক হামসুনীয় ও ফ্রয়েডীয় আধুনিকতার নামে বস্তাপচা 'বুর্জোয়া বাস্তবতা' ছড়িয়ে বাজারে ভনভন্ করছেন, রবীন্দ্র-বিরোধী হওয়ার তাড়নায়, এমনকি ফ্যাসি-বিরোধী স্মারকপত্রে সই দিয়ে 'জনসংযোগ-জনসংযোগ' বলে চিৎকারও জুড়েছেন; তাঁরা সেই রবীন্দ্রনাথকে 'সেকেলে ও বুর্জোয়া' বলে গাল পেড়েছেন যিনি ১৯৩৮ সালে প্রগতি লেখক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সম্মেলনে (কলকাতা) সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনের 'পথ প্রদর্শক' বলে অভিনন্দিত হয়েছেন।

সুকান্ত জীবনকে শুধু ভালই বাসেননি, তাকে বদলে দিতে, এগিয়ে দিতেও চেয়েছিলেন। মার্কসবাদ শুধু জীবন ও সমাজকে ব্যাখ্যা করতে ও ভালবাসতেই শেখায় না, শ্রেণী-সচেতন ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দুয়ের গরমিল ও মিল দেখাতে এবং **সংগ্রামী জনগণের ইতিবাচক অগ্রগতির দিকে উত্তরণ** ঘটাতেও শিক্ষা দেয়, প্রেরণা দেয়। সমকালের শক্তিশালী কথাশিল্পী মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্য করার আগে' নিবন্ধে বলেছেন: 'মার্কসবাদ যেটুকু বুঝেছি, তাতে মনে হয়েছে এ পর্যন্ত আমার সাহিত্যে (তিরিশের দশকে) কত মিথ্যা আবর্জনা আমদানি করেছি'। অর্থাৎ সত্যিকারের সাহিত্য তিনি মার্কসবাদ পড়ে ও কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে এসেই করতে পেরেছেন বলে স্বীকার করেছেন। আসলে 'রাজনীতিহীন' সাহিত্য-শিল্পের মতবাদ, হয় ভণ্ডামি নয়ত অপরিণত বুদ্ধির আফিম ছাড়া কিছু নয়। মার্কসবাদ এই ভণ্ডামি ফাঁসিয়ে দিতে ও বুদ্ধির জড়ত্ব কাটাতে সাহায্য করে। যে বুদ্ধদেব বসু বিয়াল্লিশের পর্বে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ঘোষণাপত্রে সই করেছেন, সম্মেলনে যোগও দিয়েছেন, এমনকি সোমেন-হত্যার (৮ই মার্চ, ১৯৪২) আঘাতে একটা কবিতাও লিখে ফেলেছেন, সেই কবি ও সম্পাদক ঐ সময়ে সুকান্তকে প্রলুব্ধ করে এক পত্রে লিখলেন—'রাজনৈতিক পদ্য লিখে শক্তির অপচয় করছ তুমি। তোমার জন্য দুঃখ হয়।' সুখের কথা, গর্বের কথা সুকান্ত

সেদিন বুদ্ধদেব বসুর কুৎসিত টোপ হেলায় প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এই কারণেই যাঁরা রবীন্দ্র ও নজরুল-বিরোধী হওয়ার নামে ফ্রয়েডীয় রিয়ালিজমে ঘুরপাক খেয়েছেন, এবং অবশেষে মিষ্টিক ও আধ্যাত্মিকের বিচ্ছিন্নতায় বিষণ্ণ ও গম্ভীর হয়েছেন, যাঁরা আধুনিকতার নামে ব্যক্তিপ্রেম ও নিসর্গ রোমান্সের রোমন্থন করেছেন, যাঁরা ব্যক্তি ও বিশ্বের ভাবগত অন্বয় সন্ধানে বেরিয়ে শেষে নিঃসঙ্গতার গভীরতর অসুখে ভুগেছেন, এবং যাঁরা নেতিবাদ আর মনস্বিতার মমি রচনাকেই গভীরতর সত্তার সন্ধান বলে মনে করেছেন, সেই অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব, জীবনানন্দ, সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখ কবিদের নিয়ে আজ জনগণের জাতীয় স্মরণোৎসব হয় না, হয় রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্তকে নিয়েই। অবশ্য আলোচ্য তালিকার মধ্যে বিষ্ণু দে ও প্রেমেন্দ্র মিত্র একটু স্বতন্ত্র মূল্য পাওয়ার অধিকারী, যেহেতু তাঁদের কবি-চেতনায় একটা স্তর পর্যন্ত দেশ-কাল ও সমাজ মনস্কতার স্পর্শ রয়েছে।

সুকান্ত যখন রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে বলেন—'আজও আমার মনে তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি,' তখন বোঝা যায়, তিনি বাংলা কাব্যের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঐতিহ্য, গণতান্ত্রিক বিবেক ও বিশ্ব-মানবতার উত্তর সাধনার পথে নেমেই তথাকথিত রবীন্দ্র বা ঐতিহ্য-বিরোধীদের রোমান্টিক পলায়নপরতা, আত্মরতি, দেহাত্মক আধুনিকতা ও অহংবাদী মননশীলতার শ্মশান যাত্রার বিপরীতমুখে সময় ও জনগণের যন্ত্রণা-সংগ্রামের পথে আন্দোলিত হয়েছেন। এই পথেই তিনি 'ইন্দোনেশিয়া, ফ্রান্স, যুগোশ্লাভিয়া, রুশ ও চীনের' ঠিকানা পেয়েছেন, অর্থাৎ আন্তর্জাতিকতাবাদে বাংলা কবিতাকে উদ্ভাসিত করেছেন, রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যকেই সম্প্রসারিত করেছেন। ১৯৪৫ সালে চট্টগ্রামের ছাত্র ফেডারেশনের সম্মেলনের জন্য লেখা 'ঠিকানা'য় তিনি যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন, তাতে বাংলার গণ-সংগ্রাম ও কাব্যের মহান ঐতিহ্যই প্রতিফলিত হয়েছে, ব্যক্তি-সুকান্ত মহান কবি-ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত হয়ে গেছেন:

'জালিয়ানওয়ালায় যে পথের সুরু
সে পথে আমাকে পাবে
জালালাবাদের পথ ধরে ভাই
ধর্মতলার পরে।'

বিশের দশকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় বিক্ষোভ আন্দোলনের ক্রমবিকাশে, ত্রিশের দশকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঐতিহাসিক ঘটনায় জালালাবাদ পাহাড়ে বিপ্লবী যুবকদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের খাত বদলে, শ্রমিক-কৃষক ও

কমিউনিস্ট আন্দোলনের তীব্রতর স্তরে সুকান্তের পরিচয়। তখন কলকাতার ৪৬ নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট ছিল কমিউনিস্ট পার্টির অফিস।

বোঝা যায়, বুদ্ধদেব বসু, জগদীশ ভট্টাচার্য প্রমুখদের মত 'রাজনীতিবিহীন' দেউলিয়া ও বিশুদ্ধ সাহিত্যসেবীদের গায়ের জ্বালাটা কোথায়! সোভিয়েত রাশিয়ায় যেমন লেনিনের মত মহান বিপ্লবী নেতা ও গোর্কির মত মহান সাহিত্যিক শতাব্দীর দুই দশক ধরে ডস্টেয়ভস্কির প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারা, ভিনি-চেঙ্কোর পাপাচারের নেতি মূলক প্রবণতা ইত্যাদি পচাগলা বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে সমালোচনা ও সংগ্রামে নেমেছিলেন, আমাদের দেশে তিরিশের দশকে তেমনি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্যের ধর্ম,' সাহিত্যে নবত্ব' প্রভৃতি প্রবন্ধে, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মত মার্কসবাদী 'গণসাহিত্য সৃষ্টি চাই' (১৯৩৪) প্রবন্ধে তৎকালীন সাহিত্যের পচাগলা বুর্জোয়া ঝোঁকগুলির বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম করছেন। এর আগে বিশের দশকে নজরুল সম্পর্কে মোহিতলাল, সজনীকান্ত ও শশাঙ্ক সেনের দলবল যতই বলুন—'কেজো ক্রমেই হচ্ছে অকেজো পলিটিক্সের পাঁশ ঠেলে,' শেষবেশ বিদ্রোহী কবি তাঁর শেষ ঘোষণা শুনিয়ে গেছেন—'যবে উৎ-পীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না/যবে অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না/আমি সেই দিন হব শান্ত।' এইজন্য তিনি রক্তের অক্ষরে লিখে গেছেন তাদের সর্বনাশ, যারা তেত্রিশ কোটি মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে খায়। ত্রিশের ও চল্লিশের দশকে ফ্যাসি-বিরোধী লেখক শিল্পী সংঙ্ঘ, কমিউনিস্ট পার্টি ও গণনাট্য সঙ্ঘ নজরুলের বিচ্ছিন্ন অবস্থানে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তাঁর কাব্যেরও মূল্যায়ন থেকে বিরত থেকে ছিল বলে, সুকান্তের কোন কবিতা বা চিঠিপত্রে নজরুলের উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু নজরুলের 'আমার কৈফিয়ৎ' এবং 'বিদ্রোহী'র অংশগুলি পড়ার পর সুকান্ত'র 'ঠিকানা' ও মন্বন্তরের ভয়ংকর বছরে (১৯৪৩) লেখা 'বোধন' পড়লে দুই কবির চেতনা ও ঐতিহ্যগত সুর ও সম্পর্ক বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না।

[১] 'দেখবে ঠিকানা লেখা প্রত্যেক ঘরে
ক্ষুব্ধ এদেশে রক্তের অক্ষরে
বন্ধু, আজিকে বিদায়; দেখেছ
উঠল যে হাওয়া ঝড়ো
ঠিকানা রইল, এবার মুক্ত
স্বদেশেই দেখা করো॥'

[২] 'শোনরে মালিক, শোনরে মজুতদার
তোদের প্রাসাদে জমা হল কত মৃত মানুষের হাড়
হিসাব কি দিবি তার?
প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা
ভেঙেছিস ঘরবাড়ী
সে কথা কি আমি জীবনে মরণে
কখনো ভুলতে পারি
আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই
স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের
চিতা আমি তুলবোই।'

সুকান্ত সম্পর্কে রবীন্দ্র প্রভাবের কথাও বলা হয়। প্রথম দিকের কবিতায় শব্দ চয়ন ও বাক্য বিন্যাসে তা থাকলেও ভাববাদী রোমান্টিকতার কিংবা পরিশীলিত অভিজাত প্রকাশভঙ্গীর প্রভাব নয়, তা হল রবীন্দ্রের সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদী প্রথা সংস্কার-বিরোধী গণতান্ত্রিক ও মানবিক চিন্তাধারার প্রভাব ও তারই পরিণত উত্তরসাধনা। তাই সুকান্ত শোষণ-জর্জর দুর্ভিক্ষের স্বদেশ ভূমিতে দাঁড়িয়ে 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় নিবেদন করলেন—'

'আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি
আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতিক্ষায়
আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়।'

তথাকথিত 'আধুনিক' ও রবীন্দ্র-বিরোধীদের অগ্রগণ্য কবি বুদ্ধদেব বসু তখন 'কঙ্কাবতী'র উদ্দেশ্যে 'লক্ষবর্ষ উপবাসী শৃঙ্গার কামনা'য় নিবেদন করলেন—

'বক্ষে তব ঢাকিয়া দিনু চুম্বনের ছাপে
যুগ্ম সেই অগ্নিগিরি স্পর্শ ভয়ংকর
যেখানে প্রেম মৃত্যুহীন রাত্রিদিন কাঁপে।'

উল্লেখযোগ্য যে, বামপন্থী ছাত্র আন্দোলন ও ইউথ কালচার-এর পরিণতিতে এই বছরই আনুষ্ঠানিক ভাবে 'গণনাট্য সঙ্ঘ' গঠিত হয়েছে। আগুন-ল্যাবোরেটরী-জবানবন্দী'র পর সৃষ্টি হয়েছে নবান্নর মশাল।

আর সমকালের মননশীল কবি সুধীন্দ্রনাথ জড়বাদী বলে ঘোষিত হয়েও অবশেষে 'নিশ্চিহ্ন নাস্তিতে' বিলীন হয়েছেন, রাজনীতি ও সংস্কৃতি আন্দোলন থেকে ল্যাজ

গুটিয়ে পালিয়েছেন—'সহে না আর জনতার জঘন্য মিতালি'। এটা এসেছে পাশ্চাত্য অবক্ষয়ের চালানি মাল হয়ে, যার বিরুদ্ধে তখন র'লা, অঁরি বারবুস, পল এলুয়ার স্তেফান জাইগ, অঁাদ্রে মালরো, র‍্যালফ ফক্স, গোর্কি, ক্রিস্টোফার কডওয়েল, চার্লি চ্যাপলিন, আইজেনস্টাইন প্রমুখ মনীষীরা সংগ্রাম করছেন। ১৯৪৭ সালের ১২ই মে 'কবিতা' পত্রিকায়, সুকান্তের মৃত্যুর পর তাঁর কাব্যের মূল্যায়নে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন: 'তার কবিতা পড়ে মনে হয়, তার কিশোর হৃদয়ের স্বাভাবিক উন্মুখতার সঙ্গে পদে পদে দাঙ্গা বাধিয়েছে একটি কঠিন, সঙ্কীর্ণ তথাকথিত বৈজ্ঞানিক মতবাদ।' অবচেতনে স্বীকারই করে ফেলেছেন, শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক থাকা ঠিক নয়, অথবা তাঁর জীবনদৃষ্টিতে বিজ্ঞানের কোন বালাই নেই। ঠিকই তো! এই জীবনবিমুখতা ও বিজ্ঞান-বিরোধিতাই বুদ্ধদেব বসু ও তাঁর উত্তরসূরী চেলাদের 'রাজনীতি-নিরপেক্ষ' সাহিত্য সাধনার লক্ষ্য। কবি ও সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্য 'সুকান্তের কবিমানস ও কর্মিমানসের বিষম মিলন'-এর জন্য দুঃখ করেছেন এবং প্রকারান্তরে এই কথাই বলেছেন—কমিউনিস্ট রাজনীতিই তাকে পরিণত কবি হতে দিল না।' তাঁর বিচারে তাহলে সুভাষ 'পরিণত' কবি; কারণ, তিনি কবিতা ছেড়ে রাজনীতিতে এসেছিলেন বলে 'সুকান্ত সমগ্র'-এর ভূমিকায় নিজেই বলেছেন। কথাটা ঐতিহ্য-বিরোধী ও অবাস্তব বলেই কি শেষ পর্যন্ত তিনি অরাজনৈতিকতার কানাগলিতে ঢুকে ভূষিমালে পরিণত হয়েছেন? কবি ও কর্মিসত্তার গরমিল ব্যাপারটা যে কত ভুল ও খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি তা সমকালের অগ্রজ অন্য দুজন সাহিত্যিকের মূল্যায়ণেই প্রকাশ পায়। কবি বিষ্ণু দে নিজে শেষদিকে, যতই চোরাবালি'র বিষাদে 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ'-এ অম্বিষ্ট হোন না কেন, সুকান্ত'র কাব্যবিচারে বলেছেন: 'অক্লান্ত কর্মীর অবসরহীন মানস, কিন্তু সুলিখিত কবিতা। একাধারে তাঁর এই পরিণত কবিত্ব এবং মার্কসীয় তত্ত্বের জনগাম্ভীর্য বারংবার বিস্মিত করেছে....সুকান্তের কবিতা প্রকাশিত হল প্রতিশ্রুতিতে নয়, একেবারে পরিণতিতে'। বলিষ্ঠ জীবনশিল্পী মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন: 'সুকান্ত কিশোর কবি হলেও, কৈশোরের কবি ছিল না। তার কর্মিসত্তা ও কবিসত্তার সমীকৃত উপাদনই তার পরিণত কবিব্যক্তিত্বের ভিত্তি।'. সুকান্ত নিজে তার মেজবৌদিকে এক পত্রে (দেওঘরে শরীর সারাতে ও নির্জনতা পেতে বলার জবাবে) লিখেছেন—'কবি বলে নির্জনতা প্রিয় হবো, আমি কি সেই ধরণের কবি? আমি যে জনগণের কবি হতে চাই! জনতা বাদ দিলে আমার থাকবে কি? তা ছাড়া, কবির চেয়ে

বড় কথা। আমি কমিউনিস্ট; কমিউনিস্টদের সব কাজ জনতা নিয়েই।' প্রায় একশ' বছর আগে ইংলণ্ডে, ১৮৩৯ সালের চার্টিস্ট সার্কুলারে শেলী, এলিয়ট ও বায়রণকে 'জনগণের কবি' বলে অভিনন্দিত করা হয়েছিল। এলিয়ট একটি কবিতায় স্পষ্ট করেই ঘোষণা করেছেন, 'সমস্ত খাঁটি কবিই অগ্নিক্ষরা রাজনীতিজ্ঞ।' প্রকৃতপক্ষে দাঁতে, সেক্সপীয়ার, মিলটন, বার্ণস সকলেই সমকাল ও জীবনের নিয়ম-সংঘাতের প্রতিফলন রেখেছেন তাঁদের স্মৃষ্টির মধ্যে। ইংলণ্ডের শ্রমিকশ্রেণীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার অগ্রণী রাজনৈতিক আন্দোলন (চার্টিস্ট আন্দোলন)-এর উপর বুর্জোয়া শাসকদের প্রচণ্ড দমন-পীড়নের মধ্যেও ১৮৪১ সালে চার্টিস্ট কবি উচ্চারণ করেছেন : 'অহো! কালো রাত্রি ভেঙে যাচ্ছে/সূর্যোদয়ের কাল আসন্ন!' বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে হিটলার-মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ট তাণ্ডবের পর্বে, ১৯৩৪ সালে জার্মান কবি ও নাট্যকার বের্টোল্ট ব্রেখ্ট তাঁর 'প্রেইজ অব দি ডায়ালেক্টিক্স্' কবিতায় ইতিহাসের সুস্পষ্ট ঘোষণা উচ্চারণ করলেন :

'পশুশক্তি বলছে, যারা যেখানে যেমনটি আছে
তারা তেমনি থাকবে এবং তখন
শোষিতদের অনেকেই বলল, আমরা যা চাই
কখনোই তা হবে না, এবং তখন
দ্বান্দ্বিক জানালো : যারা এখনো বেঁচে আছ
কখনই 'না' বলো না
যদি হারাও লড়ো—
আজ যারা হারছে
আগামীকাল তারাই জিতবে।'

এই ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানির জাতীয় গ্রন্থাগারে বাংলায় বিপ্লবী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের অনেক কবিতা অনূদিত ও অনুশীলিত হচ্ছে; অথচ বুদ্ধদেব বসু তাঁর ইংরাজীতে লেখা বাংলা কাব্যের ইতিহাসে সুকান্তকে স্থান দেননি। এ ক্ষেত্রে বুদ্ধদেববাবুই করুণার পাত্র। বায়ু ছাড়া যেমন পৃথিবী, জল ছাড়া যেমন মাছের জীবন অর্থহীন, তেমনি রবীন্দ্রোত্তর যুগের প্রগতি সাহিত্যের ধারায় সুকান্তকে 'কিশোর কবি', 'অপরিণত অসম্পূর্ণ কবি' কিংবা 'রাজনৈতিক শ্লোগানের কবি' বলে লঘু করা ও বাংলা কাব্যের কেতাবী ইতিহাস থেকে বাতিল করা শুধুই 'প্রাজ্ঞ বুদ্ধিজীবীদের' মানসিক দৈন্য ও রুগ্নতা নয়, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শাসকশ্রেণীর গভীর চক্রান্তও বটে। যে সুকান্ত তাঁর মাত্র একুশ বছরের জীবনের মধ্যে, শেষ সাত

বছরের জীবন ও সৃষ্টিকে (১৯৪০-৪৭) শীতজর্জর অভুক্ত 'ছেলেটা'র গায়ে একটু রোদ্দুর এনে দেওয়ায় উৎসর্গ করে গেছেন, তাঁর কবিতা পড়ে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৪৬ সালে, যাদবপুর হাসপাতালে যক্ষ্মায় শায়িত কবির উদ্দেশ্যে লিখেছেন :

'তোমার যক্ষ্মা হয়েছে ?
এও বুঝি ষড়যন্ত্র রাত্রিজ মেঘের
উষায় যারা আজ দুর্যোগ ঘটালো।
বুলেট ছেঁদা করে দিচ্ছে তোমার
উলঙ্গ ছেলেটার বুক
কুরে কুরে টি বি কীট ;
দুর্যোগের ঘন কালো মেঘ ছিঁড়ে
আমরা রোদ এনে দেব ছেলেটার গায়ে
আমরা চাঁদা তুলে মারব সব কীট
কবি ছাড়া আমাদের জয় বৃথা।'

ব্রিটিশ শাসক, মালিক-জমিদার, মজুতদার-মহাজন শীতার্ত ক্ষুধিত উলঙ্গ দেশটার বুকে বুলেটবিদ্ধ করেছে, ক্ষয়ের বীজাণু ঢুকিয়ে দিয়েছে। দশকের সুরু থেকে ছেচল্লিশে সারা দেশ রক্তঝরা গণ-সংগ্রামে উত্তাল—দাঙ্গা নয়, শ্রেণীক্ষমতার অফিস বদল নয়, মিলিত হিন্দু-মুসলমানের-শ্রমিক-কৃষক সহ সর্বস্তরের মেহনতি জনগণের পূর্ণ স্বাধীনতা চাই—এই বিপ্লবী বিবেককেই বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছেন সাতচল্লিশের 'স্বাধীনতা'র মুখে।

এই মৃত্যু, অন্ধকার ও অবক্ষয়ের বছরগুলিতে, দুঃসহ ক্ষুধা, পীড়ন-অত্যাচার ও গণ-প্রতিরোধের দামালো দিনগুলিতে আমরা পেয়েছি বিনয় ঘোষের 'সংস্কৃতির দুর্দিন', গোপাল হালদারের 'সংস্কৃতির রূপান্তর', প্রগতি লেখক সঙ্ঘের 'জনযুদ্ধের গান', ছাত্র ফেডারেশনের 'প্রাচীর' বিষ্ণু দে'র 'বাইশে জুন', সুভাষ-গোলাম কুদ্দুসের 'একসূত্রে' এবং সুকান্তের সম্পাদনায় 'আকাল' কবিতা ও গণ-সঙ্গীত সংকলন, আর যুগান্তকারী নাটক বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন', সুধী প্রধানের সম্পাদনায় সংগ্রামী লোককবিদের গানের সংকলন। ৪২ থেকে ৪৫-এ সোভিয়েত লাল ফৌজের হাতে ফ্যাসিস্ট হিটলারের কবর রচনা পর্যন্ত দেশজুড়ে যুদ্ধ ও মন্বন্তরের বুকে বহেছিল সৃজনশীলতার জোয়ার। সুকান্তের মধ্যে যে সমকালের গণনাট্য আন্দোলনের প্রভাব পড়েছিল এবং যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জেগেছিল, তার নজির রয়েছে তখনকার 'আগুন'

ও 'জবানবন্দী' (বিজন ভট্টাচার্য্য) এবং 'ল্যাবোরেটারী' (বিনয় ঘোষ) এবং 'হোমিওপ্যাথী' (মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য) নাটকের বক্তব্য ও ছবির সঙ্গে ৪৩-৪৪-এ লেখা সুকান্তের একাধিক কবিতার ভাবসত্যের মিল। আতঙ্ক নয়—যন্ত্রণা, বিচ্ছিন্নতা ও স্বার্থচিন্তা নয়—ঐক্য এবং কান্না নয়—প্রতিরোধের ভাষা, 'মানুষকে বৈপ্লবিক প্রাণশক্তিতে বলীয়ান করতে সংস্কৃতির প্রভাব' (গণনাট্য ঘোষণা) যে কত তীব্র ও উপযোগী তাই-ই তখনকার এইসব নাটক ও কবিতায় ভাষা পেয়েছে। এর প্রভাবেই সুকান্তের কবিসত্তা থেকে মধ্যবিত্তসুলভ বিচ্ছিন্নতা ও রোমান্টিক চিত্রকল্প সরে ও ভেঙে যেতে পেরেছিল, যা সমকালের সুভাষ ও সমর সেনের থেকে যেতে গিয়েও যায়নি। এ সব রচনার অধিকাংশই ছিল মৃত্যুর বিভীষিকা আর নির্মম অত্যাচারের জীবন্ত দলিল এবং তা একটা ঢেউয়ের পর যেন থিতিয়ে গেল। সোভিয়েত বিজয়ের পর, ফ্যাসিস্ট শক্তির পতনের সঙ্গে অনেক লেখক-শিল্পীর মধ্যে একটা আত্মতৃপ্তির ভাবও যে জাগেনি তা নয়। কিন্তু সুকান্ত-মাণিক এখানেই থামেননি। সাম্রাজ্যবাদী, পুঁজিবাদী আর সামন্তবাদী পশুশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের মূল বিপ্লবী শক্তিকে জাগিয়ে তোলার, নতুন ঢেউ জাগানোর দায় থেকে সরে যেতে বা থেমে যেতে পারেননি তাঁরা—কবিতায় ও গল্পে-উপন্যাসে। মার্কসবাদ শুধু পড়লেই হয় না; কর্মের মধ্য দিয়ে তাকে অঙ্গীকার করা চাই। **মধ্যবিত্ততার বীজাণুগুলিকে মারতে** নিজেদের ভাঙতে হয়; শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনগুলির মধ্যে, কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীর মধ্যে সক্রিয় অংশ নিয়ে নিজেদের নতুন করে গড়তেও হয়। জীবনে ও চেতনায় এই প্রক্রিয়াকে চালু না রেখে, মার্কসবাদ না জেনে তো কথাই নেই, এমনকি জেনেও, শিল্প-সাহিত্য করতে গেলে নানা রকম বিভ্রান্তি ও সংশোধনবাদের পোকা বাসা বাঁধে। "মানুষের ভিতরের কু-সংস্কার ও বর্বরতাকে তৃপ্তি দেবার জন্য আমাদের সাহিত্য নয়। আমাদের কাজ উন্নততর সভ্যতার দিকে মানবজাতিকে এগিয়ে নেওয়া।" স্তালিন যে অর্থে শিল্পী-সাহিত্যিককে 'মানবাত্মার কারিগর' বলেছেন, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই অর্থেই লেখককে 'কলম পেষা মজুর' বলেছেন। ৪৬-এর রশীদ আলী দিবস, শহীদ রামেশ্বর দিবস, ডাক-তার ধর্মঘট, নৌবিদ্রোহ, তেভাগা তেলেঙ্গনা কৃষক আন্দোলনের ঝ'ড়ো দিনের পটভূমিকায় লেখা 'দর্পণ' আর 'চিহ্ন' উপন্যাসের স্রষ্টার পক্ষেই এ কথা বলার অধিকার। 'ছাড়পত্র'' 'লেনিন', 'বোধন', ও 'অনুভব'-এর কবি সুকান্তেরই উপযুক্ত ঘোষণা :

[১] 'লেনিন ভেঙেছে রুশে জনস্রোতে অন্যায়ের বাঁধ
অন্যায়ের মুখোমুখি লেনিন জ্বলন্ত প্রতিবাদ।'

[২] 'যতদিন দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল।'

[৩] 'প্রত্যহ যারা ঘৃণিত ও পদানত
দেখ আজ তারা সবেগে সমুদ্যত
তাদেরই দলের পিছনে আমিও আছি
তাদেরই মধ্যে আমিও যে মরি-বাঁচি।'

কলকাতার বেলেঘাটা অঞ্চলের এক নিম্ন-মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে সে তার ব্যক্তিগত দারিদ্র্যের বিষণ্ণ অনুভূতিগুলিকে বাসা বাঁধতে দেয়নি, কমিউনিস্ট পার্টি, জনরক্ষা সমিতি, কিশোর বাহিনী ও ছাত্র ফেডারেশনের বিভিন্ন প্রতিবাদ-প্রতিরোধাত্মক গঠনমূলক কর্মসূচীতে অংশ নেওয়ার মধ্য দিয়ে ; সে কেবল বই পড়ে বা আনুষ্ঠানিক সভ্য হয়েই কমিউনিস্ট কবি হয়নি, জীবনদর্শন ও জীবন-চর্যার মধ্য দিয়ে সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবী মানবতার অনুভূতি ও বোধ অর্জন করে, ঐটুকু বয়সেই নিজের পুনর্জন্ম ঘটিয়ে নিয়েছিলেন ; তাই তাঁর **সমকালের যন্ত্রণা, সংগ্রাম ও স্বপ্ন সমেত ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে** আত্মস্থ করা ও সহজ বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে প্রকাশ করার মধ্যে কোন গরমিল থাকেনি। যে উৎস তাঁকে সৃষ্টি করেছে, তারই লাগাম ধরে দামালো সওয়ার-কবি তাকেই উত্তরণের দিকে ছুটিয়ে নিয়ে গেছেন। যে শ্রেণী-চ্যুতির (declassed) কারণে ধাপে ধাপে নিজের ব্যক্তিত্বের পাঁচিলগুলি অতিক্রম করা এবং স্বকালকে নিয়েও আগামী কালের বিপ্লবী স্বপ্নের প্রতীকে রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব, তারই মর্মমূল থেকেই সুকান্ত উচ্চারণ করেছে— 'বিপ্লব স্পন্দিত বুকে মনে হয় আমিই লেনিন।' সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খালি পেটে পার্টির কাজে ঘুরেছে, আঠারো বছরের ছেলে ; পকেটে পার্টির চাঁদার টাকা, তবু টুকরো রুটি কিনেও খায়নি ; বলেছে—'ও টাকা তো আমার নয়'। এই কর্মী সুকান্তের বুকেই কবি সুকান্তের বিপ্লবী স্বপ্ন বনস্পতি ও স্পন্দিত হয়েছে। 'শুধু ভঙ্গী দিয়ে' চোখ ভোলানো, 'সৌখিন মজদুরি'র কবি প্রেমেন্দ্র-অচিন্ত্যের সীমাবদ্ধতা এইখানেই। বামপন্থী মননশীলতার কবি সমর সেন ও 'পদাতিক' এর সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁদেরই অনুজ সুকান্তের মত শ্রেণী-চ্যুতি ঘটাতে না পারার

কারণেই, শেষ পর্যন্ত, হয় ফুরিয়ে গেছেন নয়ত সংশোধনবাদী আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে ব্যাঙ্কের পাশবই ওল্টাতে ব্যস্ত থেকেছেন। কলকাতার বেলেঘাটা অঞ্চলে পার্টির কাজে মগ্ন ও শ্রমিক বস্তি স্কোয়াডে তাদের আপনজন সুকান্ত এবং সেই একই সময়ে ঢাকার রেল ইয়ার্ডে শ্রমিক সংগঠন করা তরুণ কমিউনিস্ট লেখক সোমেন চন্দ যে গভীরতর স্তর থেকে 'প্রগতি লেখক সংঘ' করেছিলেন ও ফ্যাসিস্ট বর্বরতা, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা ও সাম্রাজ্যবাদী পীড়ণ-চক্রান্তের বিরুদ্ধে কবিতা ও গল্প লিখেছেন, শ্রমিক জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পাওয়ার জন্য দূরত্ব রক্ষাকারী নাগরিক সফিস্টিকেসন-এর বস্তুবাদী কবি সমর সেন ও পেটি-বুর্জোয়া বামপন্থী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সেই গভীরতা অর্জন করবেন কি করে? তবু নজরুলের বামপন্থী আবেগকে (নিজেরা তাঁর অবদান অস্বীকার করলেও) মার্কসীয় আপ্তবাক্যে ও যুক্তির ছাঁচে ঢালাই করে বাংলা কবিতাকে বামপন্থী প্রত্যয়ের জোর অনেকটা দিয়ে গেলেও, মধ্যবিত্ত মন ও নাগরিক মনন থেকে চিমনির ধোঁয়ায় যুবতীর এলায়িত কুন্তল ফুটে উঠতে পারে, কিন্তু পূর্ণিমার চাঁদে ঝলসানো রুটির বাস্তব চিত্রকল্প ফোটানো আরও গভীর স্তরের সৃষ্টি। ধরা যাক, সাঁওতাল পরগণার পল্লীপথে, মাঘ মাসের রাতে বামপন্থী নাগরিক কবি হাঁটছিলেন। তাঁর পরণে জব্বর ওভারকোট। স্বচ্ছ মেঘমুক্ত আকাশে উজ্জ্বল চাঁদ উঠল। তিনি বিহ্বল ও প্রসন্নতার আবেশে মগ্ন। সঙ্গে এক দেহাতী ক্ষেতমজুর। তাঁর গাইড। তার অনুভূতি তখন কী হতে পারে? সে কি তখন এই দারুণ শীতের রাতে নিজের বৌ-বাচ্চাদের কষ্টের কথা ভাবছে না? কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রমজীবী মানুষের জীবনধারার দর্শক বা গুরুমশাই প্রগতিশীল কবি ও কথাশিল্পীরা ঐ গরীব ক্ষেতমজুর চরিত্রটির মনেও রাবীন্দ্রিক বা পদাবলীর রঙ ধরিয়ে 'কৃত্রিম পণ্যে গানের পসরা ব্যর্থ' করেন। ১৯৪৮ সালে, অর্থাৎ রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরের বছর তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একই পটভূমি ও বিষয় নিয়ে লিখলেন যথাক্রমে 'হাঁসুলিবাঁক' ও 'বাগ্‌দিপাড়া'র কাহিনী। দুই লেখকই এর আগে দুর্ভিক্ষ ও ফ্যাসিবাদী বর্বরতার বিরুদ্ধে সম্মেলন ও সংগঠনে অংশ নিয়েছিলেন। তারাশঙ্কর কাহারপাড়ায় বিদ্রোহ দেখিয়েছেন আদিম ধর্মীয় প্রথা ও অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে, আর মানিক দেখিয়েছেন বংশগত বৃত্তি ও জমি হারিয়ে কৃষকদের শিল্পশ্রমিকে পরিণত হওয়ার ও যৌথভাবে মালিকী শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রমিক আন্দোলনের বাস্তব পরিবর্তনের ঘটনা; তারাশঙ্করের করালী বিদ্রোহের নেতা হয়েও বনোয়ারীর পর গ্রাম-প্রধান হওয়ার ও পাকাবাড়ীর

স্বপ্ন দেখছে, সে বলছে—'বাবাকর্ত্তার পুজোটা এবার আমায় দিও গো।' সে পাখিকে ফুসলিয়ে নেয়, সুবাসীকে ভোগ করতে চায়। গান্ধীবাদী তারাশঙ্করের হাতে ফুটল এই রকম সব সামন্তবাদী বাসনার ছবি। অপরদিকে মার্কসবাদী মানিক দেখালেন, পুরোণ সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ ভেঙে, ব্যক্তিগত লোভ-লালসার প্রবণতা ছিন্ন করে বেরিয়ে আসা, শ্রমিক আন্দোলনের নেতা শিবুকে আর খন্তা হাতে বেরিয়ে আসা দুলালীকে, যে জমিদারের দালাল দুলে বাগ্‌দিকে খতম করে পচা নালার জলে ভাসিয়ে দেয়। এই বছরই গণকবি গুরুদাস পাল নতুন কংগ্রেসী রাজত্বে ছাত্র হত্যা, কৃষক হত্যার প্রতিবাদে গান গাইলেন :

"গাই না আমি গানের ছন্দে বিদ্রোহের সুরে
মনের জড়তা সব যাক্‌ না ভেঙেচুরে
মজুর-কিষাণ মধ্যবিত্তের সকল ব্যবধান
জাগরণের জোয়ারে সব হোক না রে খান খান।"

(কলকাতার খবর)

গণসাহিত্যের এই ঐতিহ্য **সোমেন সুকান্তেরই ঐতিহ্য**। জনযুদ্ধের পর্বে, ১৯৪১ সালের ২২শে জুন থেকে ১৯৪২ সালের ৮ই মার্চের মধ্যে লেখা 'দাঙ্গা' গল্পে সোমেন লিখেছেন : ভাই অজয় (হিন্দু সোস্যালিষ্ট) হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের আবেদনের ইস্তাহারগুলি জড়ো করে পোড়াচ্ছে। দাদা অশোক ছুটে গিয়ে নেবাবার চেষ্টা করতে করতে বলল—'এ সব কী করছিস ?"

— কি আবার করব ? মড়া পোড়াচ্ছি।'

— 'অজু, চোখ যখন অন্ধ হয়নি, একটু পড়াশোনা কর। তারপর পলিটিক্‌স করিস্‌।'

— 'দাদা, তোমার কম্যুনিজম রাখো। আমরা ওসব জানি।'

— 'কি জানিস, বল ?'

— 'সব জানি। তোমরা দেশের শত্রু।'

— 'তোরা হলি, ফ্যাসিস্ট এজেন্ট। বড় লোকের দালাল।'

তিরিশের দশকের বুর্জোয়া অবক্ষয় ও যৌনসর্বস্ব প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্য ধারার মধ্যে ঢাকার সোমেন চন্দের 'ইঁদুর' ও 'সংকেত'-এর মত গল্প সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রগতি সাহিত্যের সারিতে পড়ে। 'ইঁদুর' গল্পে পচনশীল বুর্জোয়াতন্ত্রের গ্রাসে জীর্ণ মধ্যবিত্ত পরিবারে মা-বাবার ঝগড়া ও গালমন্দ, তাদের ভালবাসা, সোমেনের কিশোর নায়কের বাবাকে তার বয়স ফিরিয়ে দেবার রোমান্টিক কল্পনা,

রেল-ইয়ার্ডের মজুর সহকর্মী, ইয়াসিন ও সুরেনের সঙ্গে ইউনিয়নের কাজ, দুনিয়ার শ্রমিকদের জোট বাঁধার উজ্জ্বল খবর, সাম্যবাদের গর্ব, বুকভরা সোনার ফসল বুকে নিয়ে নিজেকে নতুন বিপ্লবী চেতনায় জন্ম দেওয়ার মুহূর্তে রেল ইঞ্জিনকে মানবিক মহিমায় ভাস্বররূপে উপলব্ধি করা, বাবার কলে ইঁদুরগুলির ধরা পড়ার ও পাড়ার ছেলেদের ইটপাটকেল হাতে উল্লাস করার কাহিনী; এবং এরই সঙ্গে 'সংকেত' গল্পে গ্রামীন অর্থনীতি ভেঙে ছিন্নমূল তাঁতি-কামার-চাষিদের শহরের কারখানায় ধর্মঘটী শ্রমিকদের যায়গায় ঢুকিয়ে দেওয়ার মালিকী চক্রান্ত, পুলিশী অত্যাচারও শ্রমিক-কৃষকের শ্রেণীচেতনা সৃষ্টির সহজ মানবিক আবেদনে বদলে যাওয়া রহমানের মত, পদাঘাতে লাঞ্ছিত ক্ষুব্ধ জন্মভূমিতে সুকান্তেরও চোখে 'ঘুম নেই,' সে বিস্ফোরিত হল বিপ্লবী সংগ্রাম ও স্বপ্নের 'ছাড়পত্র' হাতে, কণ্ঠে তার দিনবদলের 'ঐতিহাসিক' পালাগান :

আকাশে আছে এক ধ্রুব নক্ষত্র
নদীর ধারায় আছে গতির নির্দেশ
অরণ্যের মর্মর ধ্বনিতে আছে আন্দোলনের ভাষা
আর আছে পৃথিবীর চিরকালের আবর্তন।'

কিন্তু সুকান্ত যুদ্ধ সুরুর সময় থেকেই এই পরিণত কবিচেতনায় ছিল না। সে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক মতাদর্শ অর্জন করে, গণ-আন্দোলনের পায়ে পায়ে নিজেকে ভেঙেছে, বদলেছে ও বিপ্লবী বিশ্বাসের মাটিতে নিজেকে নতুন করে গড়েছে—এই বিবর্তনশীল কবিব্যক্তিত্বের মধ্যেই বাংলা কাব্য ও সংস্কৃতির বিকাশে সুকান্ত রেখে গেছে মহান উত্তরাধিকার।

চল্লিশের শেষ দিকে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আঘাতে কবি বিহ্বল ও বিষণ্ণ : 'দূর পূর্বাকাশে বিহ্বল বিষাণ বেজে ওঠে/মরণের শিরায় শিরায়' (পূর্বাভাষ); এ সময় কবির চোখে ভয়ার্ত কালো ছায়া নামলেও ('নিবৃত্তির পূর্বে'), পৃথিবীকে গোপনে নির্জনে কাঁদতে শুনলেও ('পরাভব') শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্র-নজরুলের উত্তরাধিকারে সমৃদ্ধ সুকান্ত জীবনের প্রতি বিশ্বাসে শানিত ও উজ্জ্বলই থেকেছেন; গোটা জাতির সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনের ঐতিহ্য তাঁকে 'চূড়ান্ত দুর্দিনেও অপরাহত' রেখেছিল। ১৯৪১ সালে (১৩৪৮, ২২শে শ্রাবণ) রবীন্দ্রনাথের জীবনাসানে সুকান্ত 'সূর্যপ্রণাম' সম্পন্ন করে মানবতার প্রতি বিশ্বাসকে আরও গভীর সুরে বাজিয়ে তুললেন।

তবু সেই রাজনৈতিক ঘূর্ণিঝড়ের টালমাটাল দিনে আরও সঠিক কম্পাসের

প্রয়োজন ছিল। তাই মার্কসবাদী জীবনদর্শনে দীক্ষা নিয়ে এবং অবিলম্বে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে ৪২-এর শেষে লিখলেন—'জনযুদ্ধের গান' 'বিভিষণের প্রতি' ও 'কোন এক বন্ধুর প্রতি' কবিতা যাতে সংগ্রামী আত্মবিশ্বাস, প্রতিরোধ এবং ফ্যাসিবাদের অনুচর বা 'বিদেশী চর'দের সম্পর্কে তীব্র শ্লেষ ও ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। এ ছাড়া তিনি 'সেপ্টেম্বর ৪২' ও 'মধ্যবিত্ত ৪২' কবিতায় মানুষের বিপ্লবী প্রত্যয়কেই মহামান্বিত করেছেন। উল্লেখযোগ্য 'জনগণ হও আজ উদ্বুদ্ধ/সুরু কর প্রতিরোধ' জনযুদ্ধ' লেখার কিছুদিন পরে 'অরণী' পত্রিকায় লিখেছেন 'অভিবাদন', যাতে সাথীদের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন : রক্তিম দিন গোনা ও বিপুল সম্ভাবনা কখনও ব্যর্থ হবার নয়। এই উত্তরণ সম্ভব হত না, যদি সুকান্তের ব্যক্তি-জীবন রাজনৈতিক-জীবন ও কবি-জীবনের অবিচ্ছিন্ন সমীকরণ না ঘটত। এই সময়ে ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী ও সংগঠক রূপে ও সর্বোপরি কমিউনিস্ট পার্টির সভা ও পোস্টার লেখার কাজে থাকতে থাকতে (বেলেঘাটার জনরক্ষা সমিতি) এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী মুক্তিযুদ্ধের দুর্জয় সংকল্পে কঠোর হয়ে উঠেছিলেন। এ বছরের ডিসেম্বরেই লিখলেন 'বন্ধু, তোমরা ছাড়ো উদ্বেগ / সুতীক্ষ্ণ কর চিত্ত / বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি / বুঝে নিক দুর্বিত্ত'। ১৯৪৩-এ চট্টগ্রাম ও আসাম (মণিপুর) সীমান্তে চলেছে ফ্যাসিস্ট জাপানের আক্রমণ। ইতিহাস সচেতন কবি ভুলতে পারেন না অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বীর চট্টগ্রামকে :

'তুমি চাও শোনিতের স্বাদ—
যে স্বাদ জেনেছে স্তালিনগ্রাদ।
তোমার সংকল্পস্রোতে ভেসে যাবে লোহার গারদ
এ তোমার নিশ্চিত বিশ্বাস।
তোমার প্রতিজ্ঞা তাই আমার প্রতিজ্ঞা চট্টগ্রাম
আমার হৃৎপিণ্ডে আজ তারি লাল স্বাক্ষর দিলাম॥'

এ বছর সেই ভয়ংকর 'পঞ্চাশের মন্বন্তর'-র কাল। সুকান্ত তাঁর বিখ্যাত 'বোধন' কবিতায় ঘোষনা করলেন—'স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবোই,' এবং এর জন্য ডাক দিলেন : 'শাসক আর শোষকের নিষ্ঠুর একতার বিরুদ্ধে একত্রিত হোক আমাদের সংহতি। উলেখযোগ্য, সুভাষের 'ফুল ফুটুক না ফুটুক/আজ বসন্ত' এবং সুকান্তের 'আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতিক্ষায়'—এই দুই চিত্রকল্পের যেমন পার্থক্য রয়েছে, তেমনি নজরুলের থেকে

সুকান্তের 'কৃষকের গান' আরও গভীর ও উন্নত। নজরুল তাদের ভাঙা মনকে জোড়া লাগানোর, ঘুম থেকে জাগানোর ডাক দিয়েছেন, কিন্তু সুকান্ত হয়ে গেছেন তাদেরই একজন। দুর্ভিক্ষে গ্রাম ছেড়ে হাজার হাজার জমিহারা কৃষক শহরে আসছে, কবিও রয়েছেন—বহুদিন উপবাসী নিঃস্ব জনপদে/মাঠে মাঠে আমাদের ছড়ানো সম্পদ—কাস্তে দাও আমার এ হাতে/আমার পুরোন কাস্তে পুড়ে গেছে ক্ষুধার আগুনে/তাই দাও দীপ্ত কাস্তে চৈতন্যপ্রখর' (ফসলের ডাক, ১৯৪৪)। কবি-কৃষক সুকান্ত পিছুটানের স্মৃতিকে 'উৎসাহের জলন্ত কয়লায়' রূপান্তরিত করেছেন। 'হালকা হাওয়ায় বিগত স্মৃতিকে ভুলে থাকা দায়' হলেও কবি এই নেতিবাদী অনুভূতির কোলে এলিয়ে পড়েননি; তাঁর বিশ্বাস 'এবার নতুন জোরাল বাতাসে জয়যাত্রার ধ্বনি ভেসে আসে।' এ কবিতা লিখেছেন ১৯৪৪-এ, আর সোভিয়েত লালফৌজের বিজয় ঘটেছিল পরের বছরে, এটাও লক্ষ্য করার মত। ১৯৪৫ সালের ৮ই মে ফ্যাসিস্ট হিটলারের পতন ও যুদ্ধ শেষ। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের 'দিন বদলের পালা'র স্বপ্ন যেন সুকান্তের 'দিন বদলের পালা' কবিতায় স্পষ্ট ঘোষণায় বেজে উঠল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি—

'দিগ্বীজয়ী দুঃশাসন
আজ তার শোধ কর ঋণ
অনেক নিয়েছ রক্ত অনেক দিয়েছ অত্যাচার
আজ হোক তোমার বিচার।'

তাঁর 'প্রিয়তমাসু' কবিতাও যুদ্ধ শেষের সৃষ্টি। এই কবিতায় কিছু সাহিত্য-সমালোচক ঘরে ফেরার ব্যক্তিগত সুর খুঁজে পান: ভুল ব্যাখ্যা। 'পরের জন্য যুদ্ধ করেছি অনেক/এবার যুদ্ধ তোমার আমার জন্য'—এ কথার অর্থ ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্তর্জাতিক মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার ও জয়লাভ করার পর সাম্রাজ্য-বাদ-বিরোধী জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধে সামিল হওয়ার দৃপ্ত ঘোষণা।

সুকান্তের অধিকাংশ কবিতাই সমকালের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ঘটনা ও গণআন্দোলনের পায়ে পায়ে চলেছে। তখনকার ধর্মঘট আন্দোলনগুলি যেমন তাঁর কবিতায় কলজের জোর এনে দিয়েছে, তেমনি মে-দিবস, নভেম্বর বিপ্লব দিবস, কৃষক আন্দোলন, লালফৌজের বিজয় অভিনন্দন, ভিয়েতনাম দিবস ইত্যাদি ঘটনা তার কবিতাগুলিকে বিপ্লবী মহিমায় উজ্জ্বল করেছে।

তখনকার ফ্যাসিবাদ-বিরোধী গণ-আন্দোলনে সুকান্তর ভূমিকা কত প্রত্যক্ষ ও সাহসী ছিল তার প্রমাণ, ১৯৪২-৪৩ সালে 'ছুরি,' 'মজুরের ঝড়' এবং 'ডাক'

কবিতা রচনা এবং ছাত্র ফেডারেশনের সম্মেলনে অংশগ্রহণ। ৪২-এর ৮ই মার্চ রেঙ্গুনের পতন হল ফ্যাসিস্ট জাপানের হাতে এবং ঐ দিনই ঢাকার প্রকাশ্য রাজপথে সাহিত্যিক ও শ্রমিকনেতা সোমেন চন্দ দেশেরই ফ্যাসিস্ট গুণ্ডাদের হাতে নিহত হন। খবর পেয়ে সুকান্ত 'ছুরি' কবিতায় লিখলেন —

'বিদেশীর চর ছুরিকা হানে দেশের হৃদ্ বৃন্তে
সংস্কৃতির শত্রুদের পেরেছি আজ চিন্তে।'

এর পরের বছর ছাত্র ফেডারেশনের সাংস্কৃতিক দলের হয়ে রাজসাহীর সারা বাংলা ছাত্র ফেডারেশনের সম্মেলনে তিনি যোগ দেন ও গণনাট্যের নৃত্যশিল্পী শম্ভু ভট্টাচর্যের সঙ্গে 'হিটলার-স্তালিন' নৃত্যনাট্যে অংশ নেন। যদিও তখন হিটলারের পতন হয়নি, তবু এতে তার পতন দেখানো হয়েছিল। ছাত্রদের সম্পর্কে অরুণাচল বসু তাঁর স্মৃতি কথায় বলছেন : "তাঁরা শুধু ইংরাজ তাড়াতে চান না, সেই সঙ্গে জাপানী ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। জাপানী সমরবাদীদের স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ বুঝলেও এবং হুঁশিয়ার করলেও, তখন দেশের অনেক ব্যক্তি বোঝেননি"। উল্লেখযোগ্য যে, এই সম্মেলনেও উগ্র-জাতীয়তাবাদীদের ফ্যাসিস্ট গুণ্ডারা হামলা করেছিল।

১৯৪৩-৪৪ সালে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সঙ্ঘ এবং ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ-এর উদ্যোগে গ্রাম শহরে পরিবেশিত হয়েছে, বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন,' নিবারণ পণ্ডিত, সতীশ মণ্ডল ও রমেশ শীলের লোকসঙ্গীত, পানু পালের 'মহামারী-নৃত্য', অনু দাশগুপ্তের 'চা-বাগিচা নৃত্য' বিনয় রায়ের 'ম্যায় ভূখা হুঁ,' জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'নবজীবনের গান,' কেন্দ্রীয় স্কোয়াড-এর 'ভারতের মর্মবাণী' নৃত্যনাট্য ও রমেশ-গোমহানীর পলিটিক্যাল 'কবির লড়াই।'

বিয়াল্লিশ থেকে ছেচল্লিশের মধ্যে সারা দেশে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী জঙ্গী গণ-আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যে কমিউনিস্টদের সাংগঠনিক প্রয়াস ও কর্মসূচীগুলিকে 'গুণ্ডামি' বলার লোকের অভাব ছিলনা, যেমন এখনো সে অভ্যাস কাটেনি অনেকেরই। তাদের মূঢ়তা ও ঔদ্ধত্যকে ল্যাংস্টন হিউজের কবিতা 'মজুরের ঝড়' অনুবাদ করে এবং নিজে 'ডাক' লিখে তীব্র শ্লেষের কষাঘাতে প্রতিরোধ করেছেন—

'মুখে মৃদু হাসি অহিংস বুদ্ধের
ভূমিকা চাই না। ডাক ওঠে যুদ্ধের
গুলি বেঁধে বুকে উদ্ধত তবু মাথা—

হাতে হাতে ফেরে দেনা-পাওনার খাতা
শোনো হুঙ্কার কোটি অবরুদ্ধের
দুর্ভিক্ষকে তাড়াও, ওদেরও তাড়াও
সন্ধিপত্র মাড়াও, দুপায়ে মাড়াও।'

আপোষকামী গান্ধীবাদী স্বদেশী নেতৃত্বের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের 'ক্রীপস মিশন' ও 'আটলান্টিক চার্টার' প্রভৃতি প্রতারণা মূলক গাঁট ছড়ার মুখোশ খুলেই কবি নিশ্চিন্ত হননি, এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার ডাক দিয়েছেন। অতঃপর সংস্কারবাদী 'অহিংস' রাজনীতির বদ্ধ হ্রদে যে নির্যাতীত দেশবাসীর, শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির তৃষ্ণা মিটবে না, এই সত্যে অটল থেকে সব রকম কুৎসাকে অগ্রাহ্য করে লিখলেন—

'হ্রদে তৃষ্ণার জল পাবে কতকাল ?
সম্মুখে টানে সমুদ্র উত্তাল ,
তুমি কোন দলে ? জিজ্ঞাসা উদ্দাম
'গুণ্ডার' দলে আজো লেখাওান নাম ?'

উগ্র-জাতীয়তাবাদী ফ্যাসিস্ট, 'ধর্মঘট ভাঙার দালাল ও বিদেশী চর'দের কাছে কমিউনিস্টরাই হল 'গুণ্ডার' দল। সুকান্ত এই 'গুণ্ডার' দলকেই মহিমান্বিত করলেন।

স্মরণ রাখা দরকার, ৪৬-এর নির্বাচনের ঠিক আগেও তথাকথিত জাতীয়তাবাদীদের একাংশ কমিউনিস্টদের হিটলার ও জাপান বিরোধী ভূমিকাকে 'ইংরাজ তোষণ' বলে অপব্যাখ্যা করেছে। অথচ যুদ্ধপর্বে ও যুদ্ধ শেষেও এই কমিউনিস্টরাই কলিকাতার রাজপথে মে-দিবস-এ, ভিয়েতনাম মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে, নৌ-বিদ্রোহের সমর্থনে, ডাক ও তার শ্রমিকদের ধর্মঘটে, রেল শ্রমিকদের ধর্মঘটে অগ্রনী ভূমিকায় আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন। ১৯৪৫ সালে বেলেঘাটা অঞ্চলে, সারা বাংলা দেশে প্রথম, মার্কসিস্ট স্টাডি ক্লাব গড়া হয়। এতে 'স্বাধীনতা' পত্রিকার পৃষ্ঠপোষণা ছাড়াও সমাজবদলে শিল্প-সাহিত্যের ভূমিকা নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির উচ্চতম নেতারা প্রায়ই বক্তৃতা ও আলোচনায় অংশ নিতেন। সুকান্ত ছিলেন এর সক্রিয় সদস্য। কাজেই রাজনীতি ও সংস্কৃতি এক হয়ে যে গণজাগরণ ঘটিয়েছিল তাতে 'ইংরাজ তোষণ' শ্লোগানটা প্রকৃত সমালোচনা ছিল না, ছিল উদ্দেশ্যমূলক কুৎসা।

যুদ্ধশেষে পর পর দুবছরে (১৯৪৫-৪৬) ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধে লালফৌজের

বিজয়, মে-দিবস, আজাদ হিন্দ বন্দীদের মুক্তি আন্দোলন, রশিদ আলি দিবস, শহীদ রামেশ্বর দিবস, ডাক-তার ধর্মঘট ও নৌবিদ্রোহ-এর দামালো ঝড়ের কেন্দ্র ভূমি থেকে সুকান্ত লিখলেন: 'কেন মৃত্যুকীর্ণ শবে ভরল পঞ্চাশ সাল, আজ বাহান্ন সালের সূচনায় কি তার উত্তর দেবে?' (২১শে নভেম্বর)। তাই সেই উত্তরেব সন্ধানেই ডাক দিয়েছেন—

'চলো শুকনো হাড়ের বদলে
সন্ধান করি তাজা রক্তের
শিকলের দাগ ঢেকে দিয়ে গজিয়ে উঠুক
সিংহের কেশর প্রত্যেকের ঘাড়ে।'
(রোগশয্যা থেকে লেখা '১লা মে')

আগেই বলেছি, এ বছরের মে-দিবস ও সুকান্তের এই কবিতার একটা ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে। এ বছরেই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জঙ্গী গণ-আন্দোলন তীব্র হয়েছিল। আজাদহিন্দ ফৌজ সহ সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে, নৌ-বিদ্রোহের সমর্থনে শ্রমিক-কৃষক সহ হাজার হাজার যুবছাত্র কলকাতার রাজপথে বন্যার মত নেমে আসেন; এই বছরেই ২৯শে জুলাই ব্রিটিশ শাসকদের শাসনযন্ত্রকে অচল করে দেওয়া ডাক ও তার ধর্মঘট এবং তার সমর্থনে দেশজোড়া সাধারণ ধর্মঘট হয়। এই সময়েই আই. এন. এ সেনাপতি আবদুর রশিদের দণ্ড মকুবের দাবীতে ('রশিদ আলি দিবস') কলকাতা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয় এবং প্রখ্যাত কমিউনিস্ট তাত্ত্বিক নেতা রজনীপাম দত্ত (ইণ্ডিয়া টু ডে-খ্যাত) এই দামালো দিনেই ভারতে এসে (ইংলণ্ড থেকে) বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা করেন। এই পটভূমিকায় সুকান্তের 'পয়লা মে ১৯৪৬' কবিতা রচিত হয়েছে। তখন ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় দেশ বিধ্বস্ত। সুকান্ত যখন 'রেড এড কিওর'-এ পার্টি চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে ছিলেন, তখন শারদীয় 'স্বাধীনতা'র জন্য লিখেছেন 'সেপ্টেম্বর ১৯৪৬' যাতে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে দেশভাগ ও দাঙ্গার-বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রতিফলন রয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি, যে-সুকান্ত 'অনুভব ১৯৪১' কবিতাংশে ক্ষুধিত ও ক্ষুব্ধ জন্মভূমিতে পদাঘাতের স্মৃতিতে বিদীর্ণ হয়েছেন, সেই কবিই কয়েক বছরের দুর্বার গণ-সংগ্রামের জোয়ারে নিজের উত্তরণ ঘটিয়ে 'অনুভব ১৯৪৬'-এ লিখলেন: 'বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে / আমি যাই তারি দিনপঞ্জিকা লিখে।'

কবি সুকান্ত আজও দেশের মেহনতি জনগনকে বিবেকের কাঠগড়ায় দাঁড়

করিয়ে প্রশ্ন রাখছেন—শোষক আর শাসকের নিষ্ঠুর একতার বিরুদ্ধে তোমাদের সংহতিকে কতটা ব্যাপক ও জোরদার করতে পেয়েছে ? সারা দেশে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি-কারী মালিক ও জমিদার মহাজনদের চিতা সাজানোর কাজ কতটা এগিয়ে নিতে পেরেছ ? ক্ষুধার আগুনে পুড়ে যাওয়া পুরোন কাস্তের বদলে চৈতন্য প্রখর দৃপ্ত কাস্তে কত লক্ষ কোটি কৃষকের হাতে তুলে দিতে পেরেছ ? তোমরা কি আজও এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করতে, রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ফুটন্ত সকাল ছিঁড়ে আনতে পেরেছ ?

এইসব জীবন্ত প্রশ্ন ও সংকল্পকে সামনে রেখেই বর্তমান সমাজে শ্রমিক-কৃষক ও মধ্যবিত্তের সংগ্রাম ও লেখক-শিল্পীদের অগ্রণী ভূমিকা এবং সংস্কৃতি আন্দোলনের গতিমুখ প্রতিক্রিয়ার রকমারি বাধা ভেঙে এগিয়ে চলেছে।